# কুম্ভমেলায়

শঙ্কু মহারাজ

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬৪

প্রকাশক :

এন. চক্রবর্তী

অমর সাহিত্য প্রকাশন

৭ টেমার লেন

কলিকাতা ৯

আলোকচিত্র :

সুজয়া গুহ ও অসিত বসু

মানচিত্রের ব্লক :

দে'জ পাবলিশিং-এর সৌজন্যে

মুদ্রাকর :

শ্রীএককড়ি ভড

নিউ শক্তি প্রেস

১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন

কলিকাতা ৬

নাম-প্রেমী ঠাকুর

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর

শ্রীচরণে—

এই লেখকের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

সংহতি—পথে পথে
অমরতীর্থ-অমরনাথ
মধু-বৃন্দাবনে ( ব্রজপর্ব, বনপর্ব ও মহাবন পর্ব )
ব্রহ্মলোকে
চতুরঙ্গীর অঙ্গনে
দ্বারকা ও প্রভাসে
পুণ্যতীর্থ-প্রভাস
লীলাভূমি-লাহুল
রাজভূমি-রাজস্থান
গঙ্গা-যমুনার দেশে
ভাঙা দেউলের দেবতা
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা
পঞ্চ-প্রয়াগ
তমসার তীরে তীরে
লাদাখের পথে
গঙ্গাসাগর
কেঁদুলির মেলায়
রূপতীর্থ-খাজুরাহো
বৈষ্ণোদেবীর দরবারে
হিমালয় ( অমনিবাস, ১ম ও ২য় খণ্ড )
সুন্দরের অভিসারে
জয়ন্তী জুরিখ
এবং
এক ফরাসী নগরে

কুম্ভদ্বার
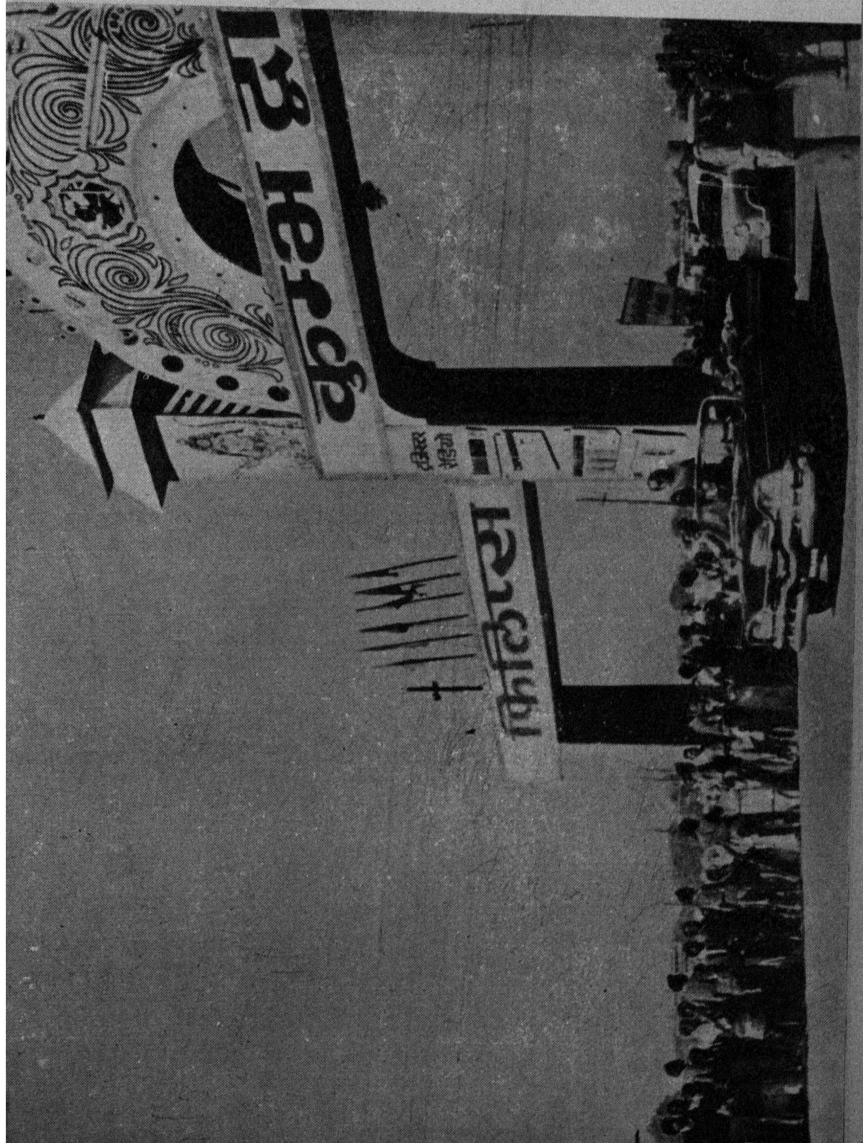
তাঁবুর মেলা
কুম্ভনগরের একাংশ

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম—
পুণ্যতীর্থ-প্রয়াগ

মৌনী অমাবস্যায় সঙ্গমে
সংখ্যাতীত মানুষের
অমৃতলাভ
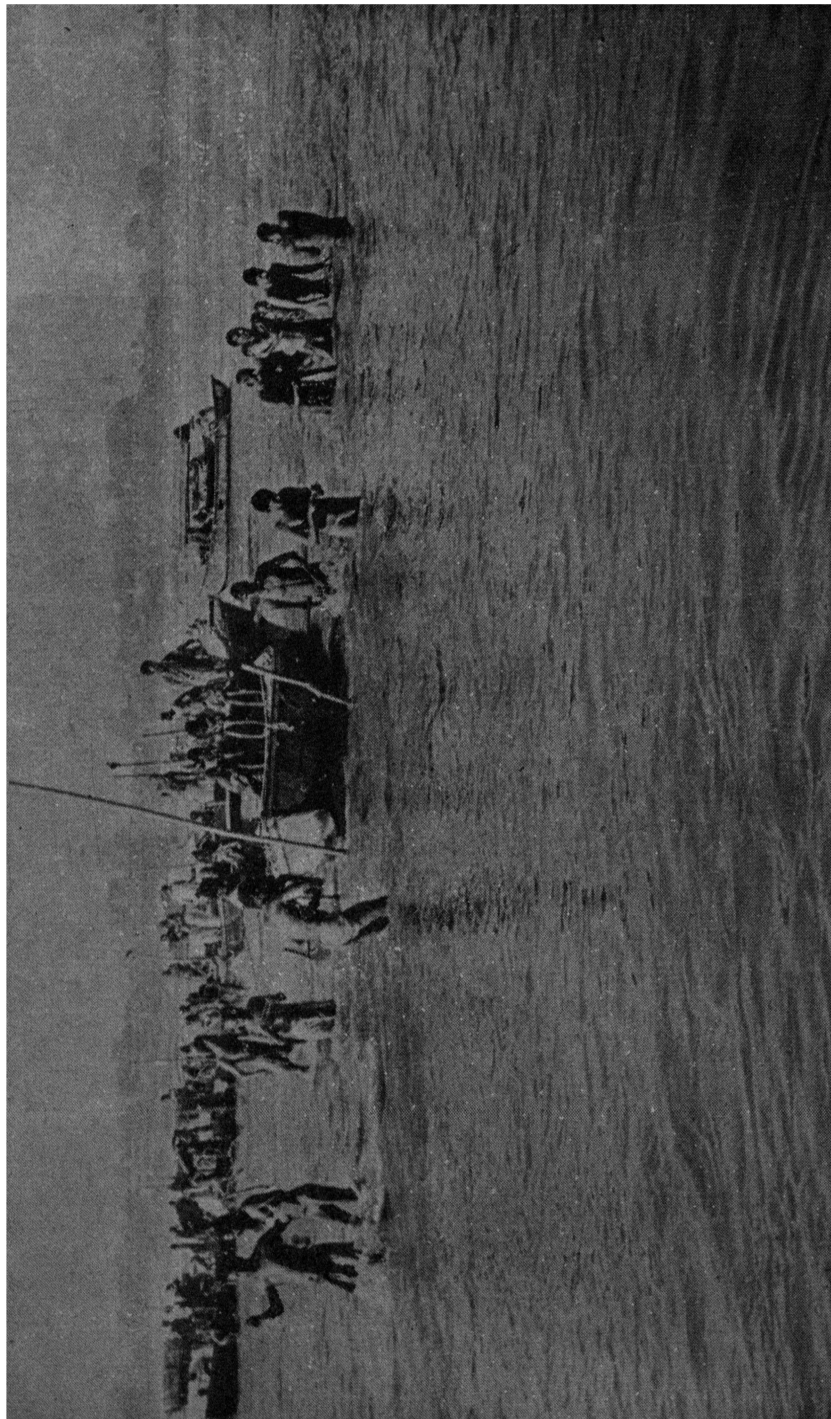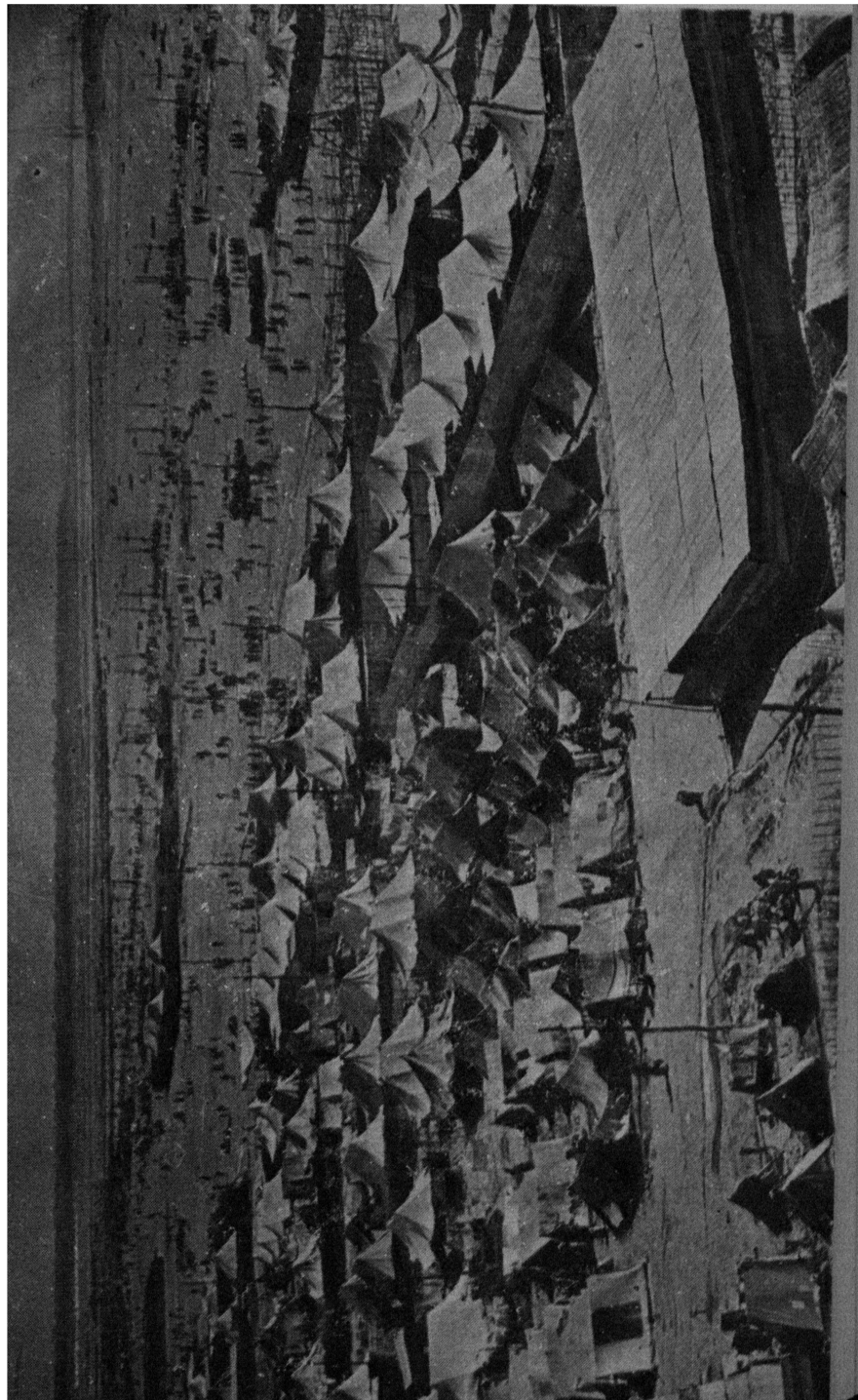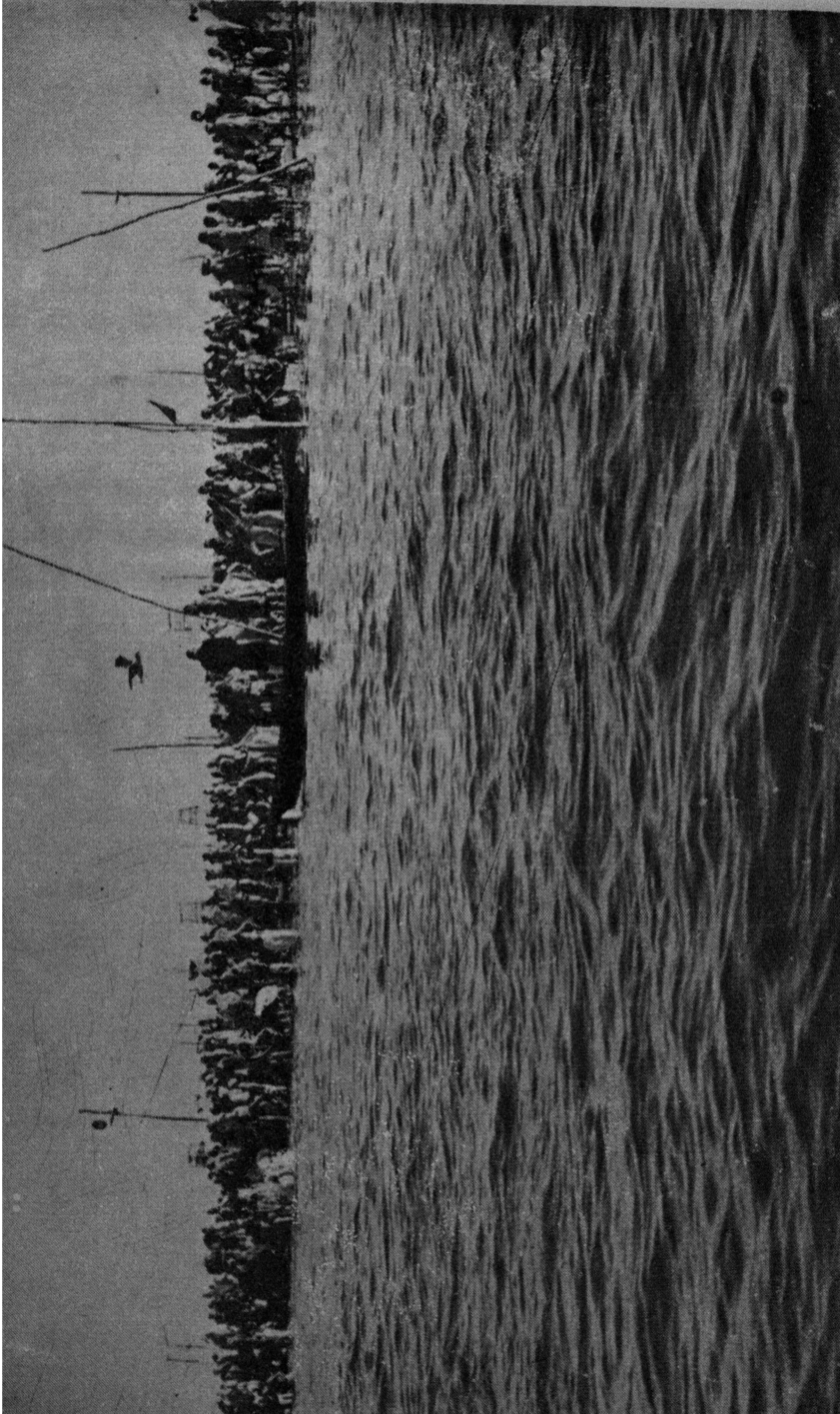
দেবাসুরের সংগ্রাম আজও চলেছে।

সেকালের মতো একালেও তুষ্ট-দেবতারা মেহনতি-অসুরদের অমৃত দিচ্ছেন না। মোহিনী-মায়ায় ভুলিয়ে তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন। তাই সংগ্রাম চলেছে। এ সংগ্রাম বঞ্চক ও বঞ্চিতের, শোষক ও শোষিতের। এ সংগ্রাম চিরকাল চলবে।

কিন্তু চিরকালের কথা থাক। আমি ভাবছি সেকালের কথা। ভাবছি সমুদ্রমন্থনের কথা, অমৃতকুম্ভের কথা।

দেবরাজ ইন্দ্রের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে সিন্ধুকন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। তারপরে তিনি পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন—দেবতাদের বলুন, তারা অসুরদের সঙ্গে সমুদ্রমন্থন করুক। মন্থন শেষে সমুদ্র থেকে লক্ষ্মী ও ধন্বন্তরি উঠবেন। দেববৈদ্য ধন্বন্তরি অমৃতকুম্ভ নিয়ে আসবেন।

ব্রহ্মার কাছে বিষ্ণুর নির্দেশ শুনে দেবতারা সবাই গোলকে এসে হাজির হলেন। নারায়ণ তাঁদের বললেন—তোমরা অসুরদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রমন্থন শুরু ক'রো। মন্থনকালে অনেক ওষধি ও রত্ন পাবে। কিন্তু তাতে লুব্ধ হয়ে যেন আবার মন্থন বন্ধ করে দিও না! ধৈর্য সহকারে মন্থন চালিয়ে যেও। তাহলেই তোমরা অমৃত এবং লক্ষ্মী লাভ করতে পারবে।

দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের সমুদ্রমন্থনের আমন্ত্রণ জানালেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন, মন্থনের সম্পদ সমানভাবে ভাগ করে নেবেন। অসুরগণ দেবতাদের সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

সমুদ্রমন্থনের আয়োজন সম্পূর্ণ হলো। মন্দার পর্বত হলো মন্থনদণ্ড। বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার কূর্মরাজ মন্দারকে ধারণ করতে সম্মত হলেন। নাগরাজ বাসুকি হলেন মন্থনরজ্জু। দেবতারা তাড়াতাড়ি গিয়ে বাসুকির পেছন দিক ধরলেন। অসুরদের থাকতে হলো সামনে। শুরু হলো সমুদ্রমন্থন।

মন্দারের ঘর্ষণে বাসুকি বার বার নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকলেন। ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। জন্ম নিল দলে দলে মেঘ। দেবতারা মেঘ থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি করে শ্রম লাঘব করলেন।

বাসুকির গর্জনে ত্রিভুবন কম্পিত হলো। তাঁর মুখ থেকে বিষ বের হতে থাকল। বহু অসুর মারা গেলেন। তবু লক্ষ্মীলাভের আশায় তাঁরা মন্থন বন্ধ করলেন না।

বাসুকির দেহের ঘর্ষণে মন্দারপর্বতের বনে আগুন লেগে গেল। বনবাসীরা যাতে সেই আগুনে পুড়ে না যায়, তাই দেবতারা আবার বৃষ্টি সৃষ্টি করলেন। আগুন নিভে গেল। মন্থন চলতে থাকল।

সহসা পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি নিয়ে সুধার ষোড়শকলা চন্দ্র উঠে এলেন সমুদ্র থেকে। ঠাঁই নিলেন আকাশে। তারপর সাগর থেকে একে একে উঠে এলো ঐরাবত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা সুরভী-গাভী অপ্সরা আর নন্দনকাননের পারিজাত। উঠে এলেন মণিরাজ। দেবতারাই তাদের সবাইকে অধিকার করলেন। কিন্তু তাতে অসুররা কোন আপত্তি করলেন না কারণ তাঁরা লক্ষ্মী-লাভের জন্য সমুদ্রমন্থনে এসেছেন। লক্ষ্মী ছাড়া আর কিছু চাই না তাঁদের।

এবারে অমৃতকুম্ভ নিয়ে উঠে এলেন দেববৈদ্য ধন্বন্তরি। অসুরগণ অবিচলিত। তাঁরা ধন্বন্তরিকে চেনেন না, অমৃত জানেন না। তাঁরা লক্ষ্মীলাভের জন্যে সমুদ্রমন্থনে এসেছেন, তাঁরা অমৃতকুম্ভের প্রতি প্রলুব্ধ হলেন না।

কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র জানতেন ঐ অমৃতকুম্ভ অমূল্য। তাই তিনি কানে কানে পুত্র জয়ন্তকে বললেন—দেববৈদ্যের কাছ থেকে কুম্ভটি চেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যা এখান থেকে! সাবধান, ওটি যেন অসুরদের হাতে না পড়ে।

জয়ন্ত পিতৃআজ্ঞা পালন করলেন। তিনি অমৃতকুম্ভ নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন।

অসুরগণ লক্ষ্য না করলেও ব্যাপারটা তাঁদের গুরুদেব শুক্রাচার্যের দৃষ্টি এড়ালো না। তিনি চিৎকার করে অসুরদের বললেন—ওরে মূর্খের দল, এত কষ্ট করে সমুদ্রমন্থন করছিস্ আর ঐ ত্যাখ্ জয়ন্ত অমৃতকুম্ভ নিয়ে পালাচ্ছে! ঐ অমৃতমন্থনের সারবস্তু। শিগ্গির ছুটে যা, জয়ন্তর কাছ থেকে অমৃতকুম্ভ কেড়ে নিয়ে আয়!

কয়েকজন অসুর মন্থন ছেড়ে তাড়াতাড়ি জয়ন্তকে ধরতে ছুটলেন। জয়ন্ত ছুটছেন আগে আগে আর অসুররা তাঁর পেছনে।

তিনদিন অবিরাম ছোটার পরে জয়ন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি অমৃতকুম্ভ

মাটিতে নামিয়ে রেখে বিশ্রাম নিতে থাকলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম তাঁর কপালে লেখা ছিল না। কিছুক্ষণ বাদেই দেখতে পেলেন, অসুররা এসে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি অমৃতময় পূর্ণকুম্ভ মাথায় নিয়ে তাঁকে ছুটতে হলো। তিনদিন পরে আবার তিনি এক জায়গায় অমৃতকুম্ভ রেখে বিশ্রাম নিলেন কিছুক্ষণ। তারপরে অসুররা এসে পড়তেই তাঁকে পূর্ণকুম্ভ নিয়ে ছুটতে হলো।

এইভাবে তিনদিন পরে পরে জয়ন্ত চার জায়গায় অমৃতকুম্ভ নামিয়ে রেখে বারোদিন বাদে ফিরে এলেন সমুদ্রমন্থন-স্থানে। ইতিমধ্যে সেখানে সিন্ধু থেকে লক্ষ্মীদেবীও উঠে এসেছেন। অসুরগণ তাঁদের ন্যায্য অংশ দাবী করলেন, দেবতারা সম্মত হলেন না। দেবাসুরের সংগ্রাম শুরু হলো। ন্যায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম, বঞ্চকের বিরুদ্ধে বঞ্চিতের সংগ্রাম। এ সংগ্রাম আজও চলেছে, চিরকাল চলবে।

সেই ন্যায়যুদ্ধে দেবতাদের জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না বলেই বোধ করি ন্যায়ের পরম আশ্রয় নারায়ণকে অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হলো। তিনি দেবাসুরের সামনে মোহিনীরূপে আবির্ভূত হলেন। তারপরে মোহিনী-মায়ায় আচ্ছন্ন করে সরল অসুরদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করলেন। অমৃত পান করে দেবতারা অ-মৃত হলেন।

পালাবার সময় জয়ন্ত যে চার জায়গায় অমৃতকুম্ভ নামিয়ে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই জায়গা চারটি হলো—হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী। কথিত আছে, অমৃতময় পূর্ণকুম্ভ নামিয়ে রাখবার সময় হরিদ্বার ও প্রয়াগে কয়েক ফোঁটা করে অমৃত পড়ে যায়। জয়ন্ত তিনদিন ছোটার পরে এক-একটি জায়গায় পৌঁচেছিলেন এবং বারোদিন বাদে ফিরে এসেছিলেন। দেবতাদের একদিনে মানুষের এক বছর। তাই বারো বছর বাদে এই চার-জায়গার কোনখানে কুম্ভমেলা হয় পূর্ণকুম্ভ। হরিদ্বার ও প্রয়াগে কয়েক ফোঁটা অমৃত পড়ে গিয়েছিল বলে কেবল এই দু'জায়গাতেই প্রতি তিন বছর বাদে বাদে অর্ধকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়। এবার প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভের মেলা বসেছে।

সেই পূর্ণকুম্ভের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগের পথে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। এ-যাত্রা রেলযাত্রা নয়, আবার পদযাত্রাও নয়। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ রেলপথে ৮১৪ কিলোমিটার। অতএব হেঁটে মেলায় যাবার কথা ওঠে না।

কলকাতা থেকে কয়েকখানি ট্রেন প্রতিদিন প্রয়াগের পথে যাত্রা করে। আমিও এর আগে রেলে চড়েই এলাহাবাদ গিয়েছি। সবাই তাই যান।

কিন্তু আজ আমরা রেলের সওয়ার হই নি। বাসযোগে যাত্রা করছি। যাত্রার আয়োজন করেছেন কুণ্ডু ট্রাভেল্‌স্‌। সংস্থার স্বত্বাধিকারী ফকির কুণ্ডুকে আমি সেদিন বাস-এ যাবার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে ফকিরবাবু বলেছেন—এবারে মৌনী অমাবস্যার স্নানে এত ভিড় হবে যে ফেরার সময় রিজার্ভড্‌ কোচ-এও ভিড় ঠেকানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাছাড়া রেল কর্তৃপক্ষ হয়তো সময়সূচী রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। তাই আমরা নিজেরাই বাস নিয়ে যাচ্ছি।

একখানি নয়, পাঁচখানি বাস। তার তিনখানি ছাড়ছে এই গড়িয়াহাট থেকে। আর দু'খানি ওঁদের অপর অফিস ফ্যারাডে হাউস থেকে।

কথা ছিল ভোর ছ'টায় বাস ছাড়বে। তাই আমরা দিনের আলো ফুটে ওঠার আগে পৌঁছে গিয়েছি এখানে। আমরা মানে দশজন- ঠাকুরমা, কাকীমা, মাসিমা, পিসিমা, কাকু, কাকী, পদ্মা, অতনু, শ্যামল ও আমি। আমরা এসেছি টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ ও ঢাকুরিয়া থেকে। কাজেই আমাদের কোনো অসুবিধে হয় নি।

একটু অসুবিধে হয়েছে সুধাংশু ও সেজদিদের। সুধাংশু, মনোরঞ্জন, কানাই, নিরঞ্জনবাবু ও দাদু এসেছেন শেয়ালদা থেকে আর সেজদি শঙ্করী বাগবাজার থেকে। তবে সবাই ছ'টার আগে এসে গিয়েছে। কেবল যে 'বাস' আমাদের মেলায় নিয়ে যাবে, সে সময়মত এসে পৌঁছতে পারে নি। সুতরাং বাস ছাড়তে দেরি হচ্ছে।

কাকীমা, শ্যামল ও অতনু ছাড়া আমরা সবাই তিন নম্বর বাসের যাত্রী। কাকীমারা জায়গা পেয়েছেন দু'নম্বর বাস-এ। ওদের বাস এইমাত্র ছেড়ে দিল। আমরা আশ্বস্ত হলাম—এবারে আমাদের পালা।

কিন্তু সে পালা আসার আগেই আমার সহযাত্রীদের মাঝে একটা গুঞ্জন শুরু

হলো। আগের বাস দুটি 'সুপার ডিলাক্স', আর আমাদেরটি শুধুই 'ডিলাক্স'। সমান ভাড়া দিয়ে আমরা কেন খারাপ বাস-এ যাবো?

অকাট্য যুক্তি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বাস্তব অবস্থা অনেক সময় যুক্তি-তর্কের তোয়াক্কা করে না। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে এখনও সব বাস ফিরে আসে নি। তার ওপরে কুম্ভমেলার ভিড়। বাস-এর বড়ই অভাব পড়েছে কলকাতায়। কর্তৃপক্ষ দু-খানির বেশি সুপার-লাক্সারী বাস যোগাড় করতে পারেন নি। একই ভাড়ায় তাঁরা এ-বাস নিতে বাধ্য হয়েছেন।

তবে আপাততঃ গুঞ্জন প্রশমিত হলো। কারণ সহসা বাস-এর ইঞ্জিন গর্জে উঠল। কর্কশ গর্জনটাকেও কিন্তু বড় মধুর মনে হচ্ছে এখন। তাই বোধকরি সহযাত্রীরা সমালোচনার যতি টানলেন।

কুয়াশা কেটে গিয়েছে কিন্তু তার ছোঁয়া লেগে আছে পথে। সেই শিশির-সিক্ত পথের বুক বেয়ে বাস চলল এগিয়ে। আমাদের যাত্রা হলো শুরু। আমরা পূর্ণকুম্ভের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগের পথে যাত্রা করলাম।

বাস-এ সিটের সংখ্যা একান্ন কিন্তু যাত্রীসংখ্যা ছেচল্লিশ। পাঁচজন কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্‌-এর স্টাফ্‌। যুবক ম্যানেজার হৃষীকেশ দে বিশ্বাস ও তার সহকারী —বিবাহিতা তরুণী দীপ্তি সরকার। তাদের দু'জন সাহায্যকারী ও বাস কণ্ডাক্টর।

ছেচল্লিশজন যাত্রীর মধ্যে আমরাই তেরোজন। তাই কাকু আমাদের নাম দিয়েছে—আন্‌লাকি থার্টিন।

সুধাংশু সহাস্যে জিজ্ঞেস করেছে, "আন্‌লাকি কেন?"

কাকু উত্তর দিয়েছে, "নইলে আমাদের ভাগে খারাপ বাসটা পড়বে কেন।"

কাকু আমার বাবার খুড়তুতো ভাই ডাক্তার সত্যনারায়ণ ঘোষ দস্তিদার। খুবই ধার্মিক মানুষ। কাকু সস্ত্রীক তার মা ও বোন পদ্মাকে নিয়ে কুম্ভমেলায় চলেছে। কাকুর মা মানে আমার ঠাকুরমার এখন পঁচাত্তর চলেছে। তবে তীর্থদর্শনে তাঁর উৎসাহ সীমাহীন। পিসী হলেও পদ্মা আমার চেয়ে বয়সে ছোট। কাকী সঙ্গে চলেছে কারণ সে 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' কথাটা বিশ্বাস করে না।

আমার এক পিসিমাও সঙ্গী হয়েছেন। তাঁর নাম চিন্ময়ী। আমরা ডাকি চিনুপিসি। তিনি সন্ন্যাসিনী, সন্তোষপুরে তাঁর আশ্রম। পিসিমা ভারত ও নেপালের বহু তীর্থ দর্শন করেছেন, হরিদ্বারের কুম্ভমেলাও দেখেছেন।

মাসিমা হলেন আমার বন্ধু শুরুপদ সেনগুপ্তের মা। তিনিও বেড়াতে ভালো-

বাসেন। বিলেত ও আমেরিকায় মেয়ে ও ছেলের বাড়ি বেড়িয়ে এসেছেন।

সুধাংশু মানে আমার তরুণ প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে। সে তার দুজন বন্ধু এবং সহকর্মী কানাইলাল জানা ও মনোরঞ্জন সাহকে নিয়ে আমার সঙ্গী হয়েছে। আর তার সঙ্গী হয়েছেন দু-জন প্রবীণ পর্যটক—নিরঞ্জন দত্ত ও রমণীকান্ত দাস। রমণীবাবু বই পাড়ায় দাদু নামে পরিচিত।

সেজদি ও শঙ্করী এবারেও আমার সঙ্গী। সেজদি মানে শঙ্করীর সেজদি মিসেস সাহা। আর শ্রীমতী শঙ্করী মল্লিক জনৈকা যুবতী শিক্ষয়িত্রী। সে অবিবাহিতা এবং বেড়াতে বড়ই ভালোবাসে।*

এই হলো 'আন্‌লাকি থার্টিনের' সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তবে কাকু নামকরণ করলেও আমরা মোটেই 'আন্‌লাকি' নই। বরং মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের অন্যতম। কারণ বিশ্ব ইতিহাসের বৃহত্তম মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে। আমরা সেই মেলায় চলেছি। আমরা মৌনী অমাবস্যায় কুম্ভস্নান করব। অনুমান করা হচ্ছে সেদিন প্রায় দেড় কোটি মানুষ পুণ্যস্নান করে অমৃত লাভ করবেন। আমরা তাঁদের সামিল হব। তার ওপরে আমরা বাস-এ বসে মেলায় পৌছব এবং কুম্ভনগরে রাত্রিবাস করতে পারব। এবারে আর কোন পর্যটন সংস্থা মেলায় জায়গা পেয়েছেন বলে জানা নেই আমার। সুতরাং আমরা পরম সৌভাগ্যবান।

"কি মশায়! আবার থামালেন কেন?" কয়েকজন সহযাত্রী প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

তাকিয়ে দেখি কালী টেম্পল রোডে এক পাঞ্জাবী রেস্তোরাঁর সামনে বাস থেমেছে।

সহযাত্রীরা ম্যানেজারকে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু উত্তর দেয় তার সহকারী দীপ্তি। সে কোমল কণ্ঠে বলে, "দয়া করে এক কাপ করে চা খেয়ে নেবেন।"

অভিযোগকারীরা অপ্রস্তুত হয়ে কি বলবেন বোধহয় বুঝে উঠতে পারছেন না। আর তাই দাদুকে নীরবতা ভঙ্গ করতে হয়। মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তিনি বলে বসেন, "উত্তম প্রস্তাব। আমাদের চা খেতে কোনো আপত্তি নেই।"

"যাদের আছে?" কানাই জিজ্ঞেস করে।

দাদু উত্তর দেন' "তাঁরা ততক্ষণ একটি কেত্তন করুন, আমরা সেই অবসরে মর্ত্যের অমৃত পান করে নিই। তারপরে একসঙ্গে পাতালের অমৃতের সন্ধানে যাত্রা করা যাবে।"

---

* লেখকের 'রাজভূমি-রাজস্থান' 'দ্বারকা ও প্রভাসে' এবং 'পঞ্চবটী' দ্রষ্টব্য।

চা-য়ের পরে বাস ছাড়ল। অর্থাৎ প্রকৃত যাত্রা শুরু হলো। আজকাল বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও সখের সংস্থা বাসভ্রমণের ব্যবস্থা করে থাকেন। কেউ নেপাল যান, কেউ কাশ্মীর, কেউ দ্বারকা, কেউবা কন্যাকুমারিকা। আমি তেমন দূরপাল্লার বাসযাত্রায় যাই নি কখনও। একবার এক অফিস ক্লাবের সঙ্গে রাজদেওরা ন্যাশনাল ফরেস্ট দেখতে গিয়েছিলাম।

সেটিই আমার দীর্ঘতম বাসযাত্রা। কিন্তু সে-যাত্রায় মাত্র শ' নয়েক কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছি। আর এবারে ষোলো শ' কিলোমিটারের ওপর বাস চড়তে হবে। কলকাতা থেকে এলাহাবাদ মোটরপথে ৮১১ কিলোমিটার।

দূরত্বটা রেলপথের পক্ষে তেমন কিছু নয় কিন্তু বাসযাত্রায় মোটেই উপেক্ষা করবার মতো নয়। বাসযাত্রায় সবচেয়ে বড় অসুবিধে একভাবে বসে থাকতে হয়! গা-হাত-পা ব্যথা হয়ে যায়। আর আজ আমাকে তো রীতিমত জড়সড় হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। আমি জায়গা পেয়েছি একটা তিনজনের সিটে। তিনজনের সিট মানেই জায়গা কম। তার ওপরে আমার সিটের দুজন অংশীদারই মহিলা এবং স্বাস্থ্যবতী। তাঁরা আড়াইজনের জায়গা দখল করে গা এলিয়ে দিয়েছেন। ফলে আমার শরীরের অর্ধাংশ বাইরে ঝুলছে।

আমার বাঁদিকে ডবল সিটে শঙ্করী ও সেজদি। সুধাংশুরা পেছনের সারিতে এবং সামনে কাকুরা।

"আপনার বোধহয় অসুবিধে হচ্ছে ঘোষদা?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

সেজদি বলেন, "আপনি এখানে আসুন, আমি আপনার জায়গায় বসছি।"

প্রস্তাবটা আমার পক্ষে লোভনীয়। অপরিচিতা মহিলাদের পাশে বসে বড়ই অস্বস্তি বোধ করছি। তবু সেজদির প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। কারণ তিনি ভারী মানুষ। এখানে তাঁর আরও বেশি অসুবিধে হবে।

অসুবিধা শব্দটা অবশ্য আপেক্ষিক। মানসিক অবস্থার ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল। অসুবিধা মনে করলেই অসুবিধা, নইলে নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত মানুষ কত কষ্ট করে কুম্ভমেলার পথে এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের তুলনায় আমরা তো রাজার হালে চলেছি। কেবল একটু কষ্ট করে বসে থাকা, তাও দিন চারেক বইতো নয়। এতে এত বিচলিত হবার কি আছে?

কলকাতা ছাড়িয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। পেরিয়ে এসেছি দক্ষিণেশ্বর, বিবেকানন্দ পুল। স্বল্প পরিচিত দিল্লী রোড ধরে বাস এগিয়ে চলেছে। প্রয়াগের পথে পাড়ি জমিয়েছি আমরা।

বেলা ঠিক দশটার সময় মগরা বাজারে একটা চা-য়ের দোকানের সামনে

বাস থামল। কলকাতা থেকে মগরা ৫৫.৫ কিলোমিটার। এই পথটুকু আসতে আমাদের আড়াই ঘণ্টা সময় খরচ হয়ে গিয়েছে।

ম্যানেজার সবিনয়ে বলে, "আপনাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গিয়েছে। ব্রেক-ফাস্ট্ করে নিন।"

কলকাতা থেকে বাস ছাড়ার আগেই আমাদের প্রত্যেককে দুটি করে প্যাকেট দিয়ে দিয়েছেন—একটি ব্রেক-ফাস্ট্ অপরটি লাঞ্চ্।

"কিন্তু আমাদের যে ব্রেক-ফাস্ট্ হয়ে গিয়েছে!" পেছন থেকে মনোরঞ্জন বলে ওঠে।

তারপরেই হাসির রোল। সুধাংশুরা সবাই হেসে উঠেছে। আমি ওদের দিকে তাকাই। হাসি থামিয়ে দাদু বললেন, "আমরা তো ভেবেছি বাস-এ বসেই ব্রেক-ফাস্ট্ সেরে নিতে হবে। আমরা তাই কিছুক্ষণ আগে প্যাকেট শেষ করেছি। এখন কি খাবো?"

"কেন চা খাবো।" কানাই বলে।

"শুধু চা!" দাদু বলেন, "সবাই খাবার খাবে, আর আমরা চেয়ে চেয়ে দেখব।"

"আপনারা এক কাজ করুন।" শঙ্করী পরামর্শ দেয়, "আপনারা লাঞ্চ প্যাকেট দিয়ে আবার ব্রেক-ফাস্ট্ করে নিন।

"তাহলে লাঞ্চের সময় কি খাবো?" কানাই জিজ্ঞেস করে।

কাকু উত্তর দেয়, "তখন কিছু কিনে খাবেন।"

প্রস্তাবটা পছন্দ হয় ওদের। সবার সঙ্গে নেমে আসি বাস থেকে। শুধু ঠাকুরমা ও পিসিমা বাস-এ বসে থাকেন। ওঁদের ফল ও মিষ্টি দেওয়া হয়েছে।

ভারী আরাম লাগছে। ট্রাম-বাস ও ট্রেনে আমরা জায়গার জন্য মারামারি করি। অথচ অনেক সময়েই দাঁড়ানোর চেয়ে বসে থাকা বেশি কষ্টকর হয়ে ওঠে এবং দূরপাল্লার বাসযাত্রীদের পক্ষে এ অবস্থাটি সর্বদা সত্য। আর আমি তো আজ বসেও আধবসা। তাই এখন দাঁড়িয়ে এত আরাম লাগছে।

কাকীমাদের বাসটাও দেখেছি এখানে, আমাদের আগে এসেছে। ওঁদের ব্রেক-ফাস্ট্ প্রায় শেষ। দেখা হয় কাকীমা, শ্যামল ও অতনুর সঙ্গে। কাকীমা আমার নিজের একমাত্র কাকার স্ত্রী। কাকা বাবার আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর দু' ছেলে। এখন বিবাহিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই কাকীমা মাঝে-মাঝে তীর্থ দর্শনে বেরিয়ে পড়েন। গত শীতে গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন।

শ্যামল মানে শ্যামল ঘোষ। বয়সে যুবক ; পেশায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। তার নেশা ভ্রমণ ও ছবিতোলা। সে একজন সুদক্ষ ক্যামেরাম্যান। শ্যামল আমার খুড়তুতো ভাই বিজয়ের ভায়রা।

অতনু আমাদের অন্যতম দীক্ষাগুরু সুসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের মেজ ছেলে। সে একজন অধ্যাপক এবং ভ্রমণপ্রিয়, সুগায়ক।

আগেই বলেছি কাকীমাদের বাসটা সুপার-ডিলাক্স। আরামদায়ক সিট। পেছনে হেলিয়ে আধশোয়া হয়ে থাকা যায়।

আমার কয়েকজন সহযাত্রী সেই বাসের সামনে ভিড় করেছেন। তাঁরা বাসটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছেন। ফলে তাঁদের শোকটা আবার উথলে উঠল। এবং উগ্রপন্থীরা ম্যানেজারকে আক্রমণ করলেন।

অসহায় ম্যানেজার বলে, "ঠিক আছে, গয়ায় ন'দার সঙ্গে দেখা হবে আপনাদের। যা বলবার, তাঁকেই বলবেন।"

আগুনে ঘি পড়ে। কয়েকজন চেঁচিয়ে ওঠেন, "আমরা কেন ফকিরবাবুকে তেল মাখাতে যাবো। য' বলার, আপনিই বলবেন।"

"বেশ বলব।" ম্যানেজার আত্মসমর্পণ করে।

"কি বলবেন?" অপর পক্ষ সর্ত শুনতে চায়।

"আজ্ঞে!" ম্যানেজার মুশকিলে পড়ে। সে ঢোক গিলে কোনমতে জবাব দেয়, "আজ্ঞে বলব যে আমাদের বাসটা ভাল নয়।"

"আর কী বলবেন?"

"আর, আর কী বলতে হবে?" নিরুপায় ম্যানেজার তাঁদের মনের কথা জানতে চায়।

"বলবেন", ওরা দাবী করেন, "বলবেন, ফেরার সময় বাস এক্সচেঞ্জ করতে হবে।"

"এক্সচেঞ্জ!"

"হ্যাঁ এক্সচেঞ্জ। এক্সচেঞ্জ মানে, আমাদের বাসটা ওঁদের দিয়ে, ওঁদের বাসটা আমাদের দিতে বলবেন।"

ম্যানেজার মাথা নেড়ে ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ প্রস্তাব ফকিরবাবুর পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। কারণ যাঁরা সুপার-ডিলাক্স বাসে চড়ে অমৃতলাভ করতে চলেছেন, তাঁরা অমৃত লাভের পরে কিছুতেই খারাপ বাস-এর সওয়ার হতে সম্মত হবেন না।

কিন্তু ওঁদের কথা থাক, নিজেদের কথা ভাবা যাক। আমি আমাদের কথা

ভেবে চলি। আমরা প্রয়াগের পথে এগিয়ে চলেছি। সারা দেশের সব পথ এখন প্রয়াগমুখী। শত শত ট্রেন, হাজার হাজার বাস ট্রাক্ টেম্পো ও মোটর, লক্ষ লক্ষ গোরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি রিক্সা সাইকেল ও নৌকো প্রয়াগের পথে এগিয়ে চলেছে। অধিকাংশ যাত্রীর থাকা-খাওয়ার ঠিকানা নেই। দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। আর আমরা?

আমরা চলেছি বরযাত্রীর মতো। রাতে গয়ার হোটেলে গরম খাবার পাবো, আরামে ঘুমাতে পারব। সবচেয়ে বড় কথা কুম্ভনগরে আমাদের জন্য তাঁবু ও খাটিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবু আমরা সুপার-ডিলাক্স বাস-এর জন্য শোক প্রকাশ করছি। চাওয়ার শেষ নেই।

আকাশটা সকাল থেকেই থমথমে। জানুয়ারী মাস। রোদ ওঠে নি। হু হু করে বাস চলেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বেশ শীত শীত করছে।

আমাদের আশঙ্কা সত্য হলো। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি নামল। জানলা বন্ধ করতে লেগে গেলেন সবাই। একটি জানলার একখানি কাচ ভাঙা। কিন্তু তা নিয়ে আমার সহযাত্রীর মাথা ব্যথা নেই। কারণ ওখানে বসেছে দীপ্তি—মহিলা ম্যানেজার। মেয়েটি ভিজছে।

শঙ্করী তাড়াতাড়ি তার কিটব্যাগ থেকে একখানি মোটা তোয়ালে বের করে মনোরঞ্জনকে দিয়ে বলে, "ভদ্রমহিলাকে এটা দিয়ে ভাঙা জায়গাটা ঢেকে নিতে বলুন।"

তাই করে দীপ্তি। এখন সে খানিকটা গা বাঁচাতে পারছে।

"ম্যানেজার, আরে ও ম্যানেজার!" জনৈক বৃদ্ধযাত্রী সহসা স্মরণ করছেন।

ম্যানেজার সবিনয়ে উত্তর দেয়, "আজ্ঞে!"

"বৃষ্টি নেমেছে। ছাদে আমাদের বিছানাপত্র বোধহয় সব ভিজে গেল।" কথাটা হঠাৎ খেয়াল হয়েছে তাঁর।

আর যায় কোথায়। কয়েকজন সহযাত্রী সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, "বাস থামাও! শিগ্গির বাস থামাও।"

ড্রাইভার বোধকরি ভয় পেয়েই বাস থামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন উঠে দাঁড়ান।

বেচারী ম্যানেজারও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতজোড় করে সে সবাইকে বলে, "আপনারা বসুন, দয়া করে বসুন। বৃষ্টি নামলেও আপনাদের বিছানাপত্র ভিজছে না। ত্রিপল দিয়ে সব ঢেকে দেওয়া হয়েছে।"

"ভাল করে ঢাকা হয়েছে কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তখন তো জানতেন না যে বৃষ্টি নামবে?"

"তাহলেও ঢেকেছি।"

"কথা না বলে একবার ছাদে উঠে দেখে আসুন না, মালপত্র ভিজছে কিনা?"

অতএব সুবোধ বালকের মতো ম্যানেজারকে নেমে যেতে হয় বাস থেকে। বৃষ্টি মাথায় করে তাকে উঠতে হয় বাসের ছাদে।

ম্যানেজার ফিরে আসে। বলে, "সব ঢাকা আছে, কিছুই ভিজছে না।"

"মাঝখান থেকে আপনি ভিজে গেলেন।" দাদু বোধহয় কথাটা না বলে পারেন না।

কাকু তার কাঁধের ঝোলা থেকে একখানি শুকনো গামছা বের করে ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলে, "মাথাটা মুছে ফেলুন।"

কাকী যোগ করে, "জামা-প্যাণ্ট্ পালটে নিন।"

মাথা মুছতে মুছতে ম্যানেজার বলে, "আমার স্যুটকেশ বাসের ছাদে। আপনি চিন্তা করবেন না কাকীমা, আমাদের এসব অভ্যেস আছে।"

না থাকলেই বা কি করার আছে? অতএব চুপ করে থাকি। গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

"ও ম্যানেজার!" আবার সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ম্যানেজারকে মনে করেছেন।

ম্যানেজার তাঁর দিকে তাকায়। ভদ্রলোক বলেন, "বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, এবারে জানালাগুলো খুলে দাও।"

ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হবার স্বভাবটি আমাদের সহজাত।

বাস এগিয়ে চলেছে। পথের পাশে নজর পড়তেই শিউরে উঠি। পর পর দুটি দুর্ঘটনা। প্রথমটি কুন্তগামী একখানি বাস-এর সঙ্গে একটা ট্রাকের। দ্বিতীয়টি দু-খানি ট্রাকের। প্রথম দুর্ঘটনাটি তেমন মারাত্মক নয়, হলে বহুলোকের বিপদ হতো। তবে বাসখানি অচল হয়ে গিয়েছে। সারাবার চেষ্টা চলেছে। নইলে যে যাত্রীদের অমৃত লাভ হবে না।

দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটি খুবই সাংঘাতিক। দুটো গাড়িই কাত হয়ে পড়ে আছে। একজন মারা গেছেন। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আবার রোদ উঠেছে। মেমারী ছাড়িয়ে এলাম। এখন বেলা সওয়া এগারোটা। যাত্রীদের গুঞ্জন কমে গেছে। সমালোচকরা অনেকেই ঘুমে ঢুলছেন। মৃদু হেসে শঙ্করী বলে, "ওঁরা টায়ারড্ হয়ে পড়েছেন।"

কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি শ্রান্ত হয়ে পড়লে যে

আমার যাত্রা বিফল হবে।

টায়ারড্ হয়েছেন আমার সিটের পার্টনার দুজন। তাঁরা রীতিমত ঘুমোতে শুরু করেছেন। ফলে আমার একেবারেই ত্রিশঙ্কু অবস্থা। অথচ উঠে দাঁড়াতেও পারছি না। দাঁড়ালেই সেজদি আবার এখানে চলে আসতে চাইবেন। অতএব মরীয়া হয়ে ঝুলে থাকি।

বেলা বারোটায় বর্ধমান পার হলাম। ১১৯ কিলোমিটার পথ আসতে সাড়ে চারঘণ্টা সময় লাগল। ম্যানেজার বলে, "পানাগড়ে লাঞ্চ্ ব্রেক্।"

বাস এগিয়ে চলে।

বেলা একটায় পানাগড় পৌঁছলাম। তার মানে গত একঘণ্টায় আমরা ৪৭ কিলোমিটার এসেছি। পানাগড় মোটরপথে কলকাতা থেকে ১৬৬ কিলোমিটার।

একটা হোটেলের সামনে বাস থেমেছে। ম্যানেজার উঠে দাঁড়ায়। বলে, "আপনারা গাড়িতে বসে খেয়ে নিন। তারপরে এই দোকানে চা খেতে আসুন।" ম্যানেজার নেমে যায়।

সুধাংশুকে বলি, "তোমরা কি করবে?"

"আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে। আমরা ভাত খেয়ে নেব।"

"আমি যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে, তবে আমি আর ভাত খাবো না। আমার তো খাবার রয়েছে।"

"সে দেখা যাবে'খন। আপনি আসুন।"

উঠে দাঁড়াই। বড্ড আরাম লাগছে। বাস থেকে নিচে নেমে আরও আরাম। আমরা পাশের হোটেলে এসে ঢুকি।

আমার হাত থেকে মনোরঞ্জন লাঞ্চ্ প্যাকেটটি নিয়ে খুলে ফেলে ওরা পাঁচজন ভাগ করে আমার খাবার খেয়ে নেয়। বাধ্য হয়ে আমাকেও ভাত নিতে হয়।

আমরা আর চা খাই না। সহযাত্রীদের চা খাওয়া হলে সবাই উঠে আসি গাড়িতে। বাস চলতে শুরু করে।

"কি মশায়!" সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার ম্যানেজারের ওপর চড়াও হন, "আগের বাসদুটোর সঙ্গে তো এখানে দেখা হলো না!"

ম্যানেজার উত্তর দেয়, "ওঁরা লাঞ্চ্ সেরে এগিয়ে গিয়েছেন।"

"যাবেই। ও-দুটো তো আমাদের মতো ছ্যাকরা গাড়ি নয়। ওরা সন্ধ্যের আগেই গয়া পৌঁছে যাবে, আর আমরা যাবো, শেষরাতে।"

ম্যানেজার চুপ করে থাকে। কিন্তু দীপ্তি মৃদু প্রতিবাদ করে, "ওরা বড়জোর

আমাদের ঘণ্টাখানেক আগে পৌছবে।"

"ওরা কেন আগে পৌছবে? আমরা কি ওদের থেকে টাকা কম দিয়েছি?"

বিপদ বুঝে দীপ্তি চুপ করে থাকে।

বাস এগিয়ে চলেছে। আমরা কুম্ভমেলায় চলেছি।

কবে থেকে এই মেলা? সঠিক উত্তর জানা নেই কারও। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের কথা বাদ দিলেও বলা যায়—কুম্ভ বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মমেলা। কারণ বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙের ভ্রমণ-বিবরণকে নিশ্চয়ই আমরা ইতিহাস বলে স্বীকার করব। তিনি তাঁর বিবরণে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রয়াগের মেলার একটি চমৎকার বর্ণনা রেখে গিয়েছেন। এটি ভারতীয় মেলার প্রাচীনতম ইতিহাস।

য়ুয়ান চোয়াঙ লিখে গিয়েছেন—সেবারের মেলায় নাকি পাঁচলক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। এই সংখ্যাটি সম্পর্কে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ সেকালের জনসংখ্যায় পাঁচলক্ষ পুণ্যার্থী খুবই বেশি। তার ওপর সেই পরিবহণহীন যুগে অত মানুষের প্রয়াগে আসাও সম্ভব নয়। তাহলেও এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, কুম্ভমেলায় তখনও অগণিত মানুষের আগমন ঘটত।

সপ্তম শতাব্দীর সেই মেলায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের মধ্যে দেশের দরিদ্রতম মানুষ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্বয়ং মহারাজা হর্ষবর্ধন। ছিলেন সাধারণ মানুষ থেকে রাজসভার সদস্যগণ। ছিলেন যাজক দার্শনিক পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীবৃন্দ। মহারাজা হর্ষবর্ধন প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে দাঁড়িয়ে রাজকোষের সমস্ত অর্থ দরিদ্র ও সাধুদের দান করে দিতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ছোটবোন রাজশ্রীর কাছ থেকে একখানি কাপড় চেয়ে নিয়ে তাঁর রাজপোশাকটি পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেন। তবে হর্ষ কেবল কুম্ভমেলা উপলক্ষেই এই দানযজ্ঞ করতেন, তা নয়। প্রায় প্রতি পাঁচবছর অন্তরই নাকি প্রয়াগে তিনি এমন দান করতেন। ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মেলায় তিনি যে দানযজ্ঞ করেছিলেন সেটি তাঁর রাজত্বকালের ষষ্ঠ অনুষ্ঠান।

য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণ থেকে আমরা কুম্ভমেলার সঠিক বয়সের হিসেব না পেলেও বুঝতে পারি যে মহারাজা হর্ষবর্ধনের আগের থেকেই এই সর্বভারতীয় মেলার প্রচলন হয়েছে। আর তাই কুম্ভমেলা বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মীয় ও সামাজিক সম্মেলন।

বর্তমানে কুম্ভমেলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, এটি মূলত সাধুদের মেলা। বিংশ শতাব্দীর এই পারমাণবিক যুগেও ভারতে কত সাধু রয়েছেন, তা জানতে হলে আসতে হবে কুম্ভমেলায়। কর্তৃপক্ষ অনুমান করেছেন এবারে মৌনী অমাবস্যার দিনে দশ লক্ষের মতো সাধু কুম্ভনগরে উপস্থিত হবেন। এঁদের অনেকেই কোথায় থাকেন, কী ভাবে আসেন, তা জানা নেই। কিন্তু এঁরা আসেন। আর তাই কুম্ভমেলা সাধুদের মেলা।

কুম্ভমেলার বর্তমান রূপের রূপকার আদিগুরু শঙ্করাচার্য। সনাতনধর্ম রক্ষা ও প্রসারের প্রয়োজনে তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মঠের প্রধানদের এখন শঙ্করাচার্য বলা হয়। এবং তাঁরা আজও সনাতন ধর্মের রক্ষক।

আদি শঙ্করাচার্য সন্ন্যাসীদের দশটি সম্প্রদায়ে ভাগ করে গিয়েছেন—সরস্বতী, পুরী, বন, তীর্থ, গিরি, পর্বত, ভারতী, অরণ্য, আশ্রম ও সাগর। সংক্ষেপে এঁদের দশনামী সম্প্রদায় বলা হয়। এঁরা সাতটি আখড়ায় বাস করেন। আখড়াগুলির নাম—নির্বাণী, নিরঞ্জনী, জুনা, আবাহন, অটল, আনন্দ ও অগ্নি।

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও আখড়ার সন্ন্যাসীরা যাতে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন এবং তাঁদের মধ্যে যাতে একটা ঐক্যের ধারা প্রবাহিত থাকে, তাই আচার্য শঙ্কর কুম্ভমেলাকে দশনামী সম্প্রদায়ের মিলন মেলা বলে নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন। ভারতের সমস্ত সন্ন্যাসী আজও সে নির্দেশ পালন করে চলেছেন। তাই কুম্ভমেলা সাধুদের মেলা। আমরা ভাগ্যবান, সেই মেলায় চলেছি।

বাস এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছি দুর্গাপুর, আসানসোল ও কুলটি। কলকাতা থেকে মোটরপথে দূরত্ব যথাক্রমে ১৮২, ২২২ ও ২৩৫ কিলোমিটার। এইমাত্র আমাদের বাস থামল বরাকর চেক্-পোস্টের সামনে। এটি বাংলা-বিহার সীমান্ত-চৌকি। দূরত্ব কলকাতা থেকে ২৩৮ কিলোমিটার। এখন বিকেল পাঁচটা।

এবারে আমরা বিহারে প্রবেশ করব। কাজেই পারমিট দেখাতে হবে। ম্যানেজার বলে, "এখানে যখন কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই হবে, তখন এখানেই বিকেলের চা খেয়ে নেওয়া যাক। আপনারা বাস থেকে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিন, আমি চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করছি। আরেকটা কথা…"

ম্যানেজারের দিকে তাকাই। একটু থেমে সে আবার বলে, "সুপার ডি-লাক্স বাস দু'খানি কিন্তু আমাদের খুব আগে গয়া পৌঁছতে পারবে না।"

"কেমন করে বুঝলেন?" কয়েকজন সমালোচক কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

ম্যানেজার সবিনয়ে উত্তর দেয়, "সে বাস দু'খানাও এখানেই রয়েছে। যাত্রীরা চা খাচ্ছেন।"

সমালোচকরা শব্দহীন। নিঃশব্দে ম্যানেজার নেমে যায় বাস থেকে। আমিও নেমে আসি নিচে। সুপার-ডিলাক্স বাস দেখতে নয়, কোমরের ব্যথা কমাতে। অথবা আমার সমযাত্রিণীদের কৃপায় দোদুল্যমান অবস্থা থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পেতে।

নেমে আসে সকলেই। কাকী আমাকে বলে, "ভাসুরপো, আপনি আমার জায়গায় বসুন, আমি আপনার জায়গায় বসছি।"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই সেজদি বলে ওঠেন, "না কাকী, আপনি ওঁদের জব্দ করতে পারবেন না। তার চেয়ে ঘোষদা আমার জায়গায় বসুন।"

"কিন্তু ওখানে জায়গা বড়ই কম, আপনার খুব অসুবিধে হবে।"

শঙ্করী সহাস্যে বলে, "আপনি অযথা চিন্তা করবেন না ঘোষদা, আপনি আমার সিটে চলে আসুন, সেজদি ওখানে ঠিক নিজের জায়গা করে নেবে।"

দেখা হলো কাকীমা, শ্যামল ও অতনুর সঙ্গে। বিগত যুগের বাংলা সাহিত্যের জনৈক বিশিষ্ট কবির পৌত্রের সঙ্গে অতনু আলাপ করিয়ে দেয়। তিনি ওদের বাস্-এ মেলায় চলেছেন। ভদ্রলোক বয়সে প্রবীণ কিন্তু পোশাকে নবীন, চাল-চলনে সাহেব। তাঁর মুখে পাইপ। তিনি সেকালের বিলেত-ফেরতদের মতো চিবিয়ে কথা বলছেন।

প্রতিনমস্কারের পরে ভদ্রলোক বললেন, "আপনার নাম শুনেছি কিন্তু বলতে লজ্জা পাচ্ছি, আপনার কোনো বই পড়ি নি আমি।"

তাঁর কথা শুনে অতনুও লজ্জা পায়। কিন্তু আমি ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিই, "এতে লজ্জা পাবার কি আছে? আমি তো স্কুল-কলেজের 'সিওর-সাক্সেস্' লিখি না যে সবাইকে আমার বই পড়তেই হবে। তবে আপনার ঠাকুরদাদার কয়েকটি কবিতা পাঠের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে তাই ভাল লাগল।"

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমারও ভাল লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ করে।" ভদ্রলোক আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই তাড়াতাড়ি নিজেদের গাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন।

মৃদু হেসে অতনু তাঁকে অনুসরণ করে।

চা খেয়ে উঠে আসি গাড়িতে। সেজদি আমার জায়গায় গিয়ে বসে

পড়েছেন। আমি এসে শঙ্করীর পাশে বসি। বেশ আরাম লাগছে এখন। একে তো আমার ও শঙ্করীর পক্ষে এখানে যথেষ্ট জায়গা, তার ওপরে আমাকে আর জড়সড় হয়ে থাকতে হচ্ছে না এবং সবচেয়ে সুখের কথা এখন আমার সারা শরীরটাই সিটের ওপর রয়েছে।

কুমারধুবি পেরিয়ে এলাম।

"এখান থেকে মাইথন বাঁধ খুব কাছে, না ঘোষদা?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ। ছয় কিলোমিটার। আর কল্যাণেশ্বরী মন্দির মাত্র আট কিলোমিটার।"

শীতের সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। আঁধারের বুক চিরে বাস এগিয়ে চলেছে। তোপচাঁচি-বাজার ছাড়িয়ে এলাম, পৌঁছলাম তোপচাঁচি মোড়ে। এখান থেকে তোপচাঁচি হ্রদ মাত্র আধ কিলোমিটার। গোমো ৫ কিলোমিটার, বাগমারা ১৭ আর চন্দ্রপুরা ৩৫ কিলোমিটার। আমরা কলকাতা থেকে ৩০৪ কিলোমিটার এসেছি। আরও ১৮১ কিলোমিটার পথ আজ পাড়ি দিতে হবে। কলকাতা থেকে গয়া মোটরপথে ৪৮৫ কিলোমিটার। সাতটা বাজে, রাত এগারোটার আগে পৌঁছতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

গাড়ির সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবু ঠাণ্ডা লাগছে। চাদর-কম্বল যে যা পেরেছে, গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে। শঙ্করীও একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে তার একাংশ আমাকে দিয়েছে। আমি হাত-পা ঢেকে বাবু হয়ে বসে আছি।

বসে বসে ভাবছি এই পথের কথা। এ যে চিরকালের তীর্থপথ। আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা ৺গঙ্গাধর ঘোষ দস্তিদার সস্ত্রীক দু-বার গয়া হয়ে কাশী গিয়েছিলেন। গয়াতে পাণ্ডাদের খাতায় আমি তাঁর স্বাক্ষর দেখেছি। প্রায় দেড়শ' বছর আগে কিভাবে তাঁরা বরিশাল থেকে কাশী এসেছিলেন জানা নেই আমার। কিন্তু আমি জানি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম ভ্রমণকাহিনী 'তীর্থভ্রমণ'-এর লেখক যদুনাথ সর্বাধিকারী ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পথে বদ্রীনাথ গিয়েছিলেন। তিনি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এখানে এসেছিলেন এবং এখানে রাত্রিবাস করেছেন। তাঁর মতে 'এই চটি অবধি মগধ রাজ্য ( মৎস্য দেশ ), বরাকরাবধি বিরাট রাজ্য, তাহার পর জরাসন্ধাধিকার মগধ।'

ইসরি ছাড়িয়ে এলাম। জনপদের নাম ইসরি, কিন্তু রেলস্টেশনের নাম পরেশনাথ। পাশেই পরেশনাথ পাহাড়—জৈন তীর্থঙ্করদের একমাত্র মহানির্বাণ ক্ষেত্র। জৈনদের ভাষায় সমেদ-শিখর।

এখান থেকে গাড়ি চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে পরেশনাথ শিখরে ওঠা যায়। সেখানে সুন্দর-সুন্দর মন্দির ও ডাকবাংলো রয়েছে। দিনের আলো থাকলে গাড়িতে বসেই মূল-মন্দিরটি দেখতে পাওয়া যেতো। আমরা কলকাতা থেকে ৩২১ কিলোমিটার এসেছি।

বাস এগিয়ে চলেছে, আমরা কুম্ভমেলায় যাচ্ছি। জনসমাবেশের দিক থেকে এবার নাকি প্রয়াগে নূতন বিশ্বরেকর্ড স্থাপিত হবে। প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয় দেড়মাস ধরে। এর মধ্যে পাঁচটি পুণ্যস্নান—পৌষ পূর্ণিমা, মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা, বসন্ত পঞ্চমী ও মাঘী পূর্ণিমা। এ বছর প্রথম ও দ্বিতীয় স্নান হয়েছে ৪ঠা ও ১৪ই জানুয়ারী। অপর তিনটি স্নান হবে ১৯শে ও ২৪শে জানুয়ারী এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। আমরা চলেছি ১৯শে জানুয়ারী অর্থাৎ মৌনী অমাবস্যায় স্নান করতে। এই অবগাহনেই শুনেছি সর্বাধিক পুণ্য।

বলা বাহুল্য, পুণ্যসঞ্চয় আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চলেছি মেলা দেখতে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে ভারতের শাশ্বত আত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে। আমি জানতে চাই শত শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিসের আকর্ষণে এই মহামেলায় মিলিত হয়ে আসছেন? কেন তাঁরা হাসিমুখে এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন? অমৃতের পুত্র বলেই কি তাঁরা অমৃত লাভের জন্য এত আকুল?

যাক্-গে, আবার কুম্ভস্নানের ভাবনায় ফিরে আসা যাক। যে কোনদিন যে কোন সময়ে প্রয়াগে স্নান করলেই অক্ষয়পুণ্য লাভ হয়—এ বিশ্বাস হিন্দুদের সহজাত। এবং এই হিন্দু মানে হিন্দুধর্ম নয়, হিন্দুজাতি। তবে মাঘ মাসে যখন সূর্য ও চন্দ্র মেষ রাশিতে প্রবেশ করে, তখন প্রয়াগস্নান পুণ্যতর। আর যেবারে পৌষ সংক্রান্তিতে বৃহস্পতির সঙ্গে মেষ রাশির এবং রবির সঙ্গে মকর রাশির মিলন হয়, সেবারে পূর্ণকুম্ভের পুণ্যস্নান হয় পুণ্যপ্রয়াগে।

এবছর মৌনী অমাবস্যায় স্নানের আরেকটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই পুণ্যতিথিতে কয়েকটি গ্রহ ও নক্ষত্রের এমন শুভ সমাবেশ ঘটবে, যা বিগত ১৪৪ বছরে আর ঘটে নি। বারো বছর পরে পূর্ণকুম্ভ হয়, আর বারোটি কুম্ভের পরে এমন শুভযোগ হল। তাই অনুমান করা হচ্ছে, এবারে মৌনী অমাবস্যায় প্রায় এক কোটি বত্রিশ লক্ষ পুণ্যার্থী ও দশ লক্ষের মতো সন্ন্যাসী প্রয়াগে পুণ্যস্নান করবেন। গঙ্গা ও যমুনা কৃপা করলে আমরাও তাদের সামিল হব।

বাড়হি জংশন ছাড়িয়ে এসেছি ইতিমধ্যে। জংশন মানে তিনটি জাতীয় সড়কের সঙ্গম—দু' নম্বর, একত্রিশ নম্বর ও তেত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক। বাড়হি থেকে তিলাইয়া বাঁধ ও হাজারিবাগ শহর যথাক্রমে ১৮ ও ৩৭ কিলোমিটার।

ওখান থেকে যাওয়া যায় রামগড়, রাঁচি ও রাজদেওয়া ন্যাশনাল ফরেস্ট। সেবারে আমি বাসে চড়ে সেই অভয়ারণ্য দেখতে এসেছিলাম। তার মানে বাসপথে আমার দৌড় বাড়হি জংশন পর্যন্ত। কিছুক্ষণ আগে আমি আমার বাসযাত্রার সেই সীমারেখা অতিক্রম করেছি।

সহসা শঙ্করী প্রশ্ন করে, "কী বলেছিলাম তখন?"

ওর কথা বুঝতে পারি না। জিজ্ঞেস করি, "কি?"

"বলেছিলাম না, সেজদি ওখানে ঠিক জায়গা করে নেবে।"

এবারে সেজদির দিকে তাকাই। সত্যই তিনি পা তুলে কম্বল মুড়ি দিয়ে দিব্যি আরামে বসে আছেন। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে সেজদি প্রশ্ন করেন, "রাত যে দশটা বেজে গেল ঘোষদা, আর কতদূর?"

"সত্যি। আমরা কখন গয়া পৌঁছব?" শঙ্করীও একই কথা জিজ্ঞেস করে।

"শেষ রাতে।" দাদু গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন।

"সে তো ইংরেজী মতে আগামীকাল।" কানাই টিপ্পনি কাটে।

সুধাংশু বলে, "ইংরেজী মতে তো হিসেব হবে না কানাইদা, আমরা যে কুম্ভমেলায় চলেছি।"

"ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস করুন না, আর কতক্ষণ লাগবে গয়া পৌঁছতে।" শঙ্করী আবার বলে।

কিন্তু আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না। ম্যানেজার নিজেই তার প্রশ্ন শুনতে পায়। সে উত্তর দেয়, "আর মিনিট চল্লিশের মধ্যেই আমরা গয়া পৌঁছে যাবো। এই তো ডোভি এসে গেল। এখান থেকে গয়া ৩০ কিলোমিটার।"

ম্যানেজার ঠিকই বলেছে। বাস ডাইনে মোড় ফিরল। দু-নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে আমরা সাময়িক বিদায় নিয়ে উত্তরে এগিয়ে চললাম। কাল গয়া থেকে এখানে এসে আবার পশ্চিমের পথ ধরতে হবে। ডোভি কলকাতা থেকে ৪৫৫ কিলোমিটার।

আর মাত্র তিরিশ কিলোমিটার। তারপরেই কিছুক্ষণের জন্য এই ক্লান্তিকর বাসভ্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাবো। গয়ার হোটেলে গরম খাবার পাওয়া যাবে, বাকি রাতটুকু আরামে ঘুমোতে পারব। ভাবতেও ভাল লাগছে। শুধু আমার নয়, সহযাত্রীরা সবাই সুসংবাদ শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। দাদু তো আনন্দে চিৎকারই করে উঠলেন, "বলো, কুম্ভমেলা কি জয়।"

## দুই

শেষপর্যন্ত ম্যানেজারের অনুমান মিথ্যে হয় নি। গতকাল রাত এগারোটা বাজার কয়েক মিনিট আগেই আমাদের বাস গয়া পৌঁচেছে। বাস থেকে নেমে পথে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি—বেশ শীত। তবু কোন অসুবিধে হয় নি। কারণ সারোগী হোটেলের রিসেপ্‌শন-এ স্বয়ং ফকিরবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে লম্বা ফর্দ। নাম বলতেই তিনি সবাইকে ঘরের নম্বর বলে দিয়েছেন।

আমাদের ভাগে পড়েছে দোতলার এই বারো এবং তেরো নম্বর ঘর। কাকু হাসতে হাসতে বলেছে, "আন্‌লাকি থার্টিনের জন্য রুম নাম্বার থার্টিন।"

ঘর দু'খানি কিন্তু বেশ ঝকঝকে এবং বড়। বাথরুম সংলগ্ন। সুতরাং কোন অসুবিধে হয় নি। তাছাড়া ঘরে এসে বসামাত্র গরম চা পেয়েছি। একটু বাদেই কুণ্ডু ট্রাভেল-এর কর্মচারীরা মালপত্র পৌঁছে দিয়েছে। আমরা হাতমুখ ধুয়ে বিছানা করে নিয়েছি। তারপরেই থালায় থালায় গরম খাবার এসেছে—ডাল-ভাত, দু'রকমের তরকারি ও ভাজা।

পেটভরে খেয়ে নিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছি। এক ঘুমে রাত কাবার হয়েছে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভাঙিয়ে বেড্‌-টি দিয়ে গিয়েছে। চা খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার মালপত্র গোছাতে শুরু করেছি।

সকাল সাতটায় ব্রেক্‌-ফাস্ট্‌ এসেছে—পরোটা, তরকারি ও মিষ্টি। তারপরেই পেয়েছি লাঞ্চ্‌-প্যাকেট। খারাপ লাগছে কাকীমা ও ঠাকুরমার কথা ভেবে। পরশু একাদশী ছিল। কাজেই ওঁরা আজ তিনদিন ফল-মিষ্টি খেয়ে আছেন। আরও চারদিন ভাত খেতে পারবেন না। সেজন্য অবশ্য তাঁদের কোন আফশোস নেই। বরং কুম্ভমেলায় যেতে পারার জন্য দুজনেই বেজায় খুশি।

ভেবেছিলাম গতকাল এবং আজকের সুবন্দোবস্তের বিনিময়ে আমার সমালোচক সহযাত্রীরা 'সুপার ডিলাক্স'-এর শোক বিস্মৃত হবেন। কিন্তু ভুল ভেবেছি। বাস-এ উঠে দেখি তাঁরা ফকিরবাবুর সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। তাঁদের দাবী—ফেরার পথে সুপার ডিলাক্স বাস চাই।

ফকিরবাবু হাতজোড় করে সবিনয়ে বলেছেন—তা সম্ভব নয়। যিনি যে বাস-এ যাচ্ছেন, তাঁকে সেই বাস-এ ফিরতে হবে। নইলে প্রচণ্ড গোলমাল বেধে যাবে।

বলা বাহুল্য, আমার উগ্রপন্থী সহযাত্রীদের সমীপে ফকিরবাবুর সকল আবেদন ও নিবেদন ব্যর্থ হলো। আর তাই তাঁকে কঠিন হতে হয়। তিনি বলে বসলেন, "বেশ, যাঁরা এ বাস-এ ফিরে আসতে রাজী নন, তাঁরা আমার সঙ্গে হোটেলে আসুন, আমি তাঁদের পুরো টাকা ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি।"

এবারে কাজ হয়েছে। উগ্রপন্থীরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। কারণ তাঁরা সবাই জানেন, নিজেদের চেষ্টায় তাঁদের এখন এলাহাবাদ যাওয়া অসম্ভব। আর যেতে পারলেও সেখানে প্রকাশ্য রাজপথে রাত কাটাতে হবে।

ফকিরবাবু আবার বলেন, "দয়া করে সময় নষ্ট করবেন না। যাঁরা যাবেন না, তাঁরা আমার সঙ্গে হোটেলে আসুন। এ পর্যন্ত আসা ও গতকালের থাকা-খাওয়া বাবদ আমি এক পয়সাও কাটব না। পুরো টাকাই ফেরৎ দিয়ে দেবো।"

সমালোচকরা শব্দহীন।

দাদু নীরবতার অবসান করেন, "সবাই যাবেন, অতএব বাস ছাড়ুন।"

আমাদের সঙ্গে ফকিরবাবুও হেসে ফেলেন।

হাসির শব্দ কমে আসতেই কানাই বলে ওঠে, "থ্রি চিয়ার্স ফর ফকির কুণ্ডু!"

"হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্..."

আবার হাস্যরোল। এবং তারই মধ্যে ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়।

ফকিরবাবু হাসতে হাসতে বলেন, "মধুরেণ সমাপয়েৎ।"

তিনি গিয়ে ম্যানেজারের পাশে বসেন।

আগেই বলেছি পর্যটন সংস্থাগুলোর মধ্যে একমাত্র কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স মেলায় জায়গা পেয়েছে। এজন্য ফকিরবাবুকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। আর তাই তাঁকে কয়েকদিন আগেই এলাহাবাদ চলে যেতে হয়েছিল। গতকাল তিনি সেখান থেকে গয়া এসেছেন। আজ আমাদের সঙ্গে আবার মেলায় চলেছেন। বিশেষ করে তাঁর আমাদের বাস-এ আসার কারণ বুঝতে পারছি। আমার সহযাত্রীরা যে তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

আজও সকাল সাড়ে সাতটায় বাস ছেড়েছে। গতকাল এ সময় কলকাতায় ছিলাম, আজ গয়ায়, আগামীকাল কুম্ভনগরে। ভাবতেও ভাল লাগছে।

বাস-এ চড়ে আমি আর কখনও গয়াতে আসি নি, কিন্তু এটি আমার পরিচিত পথ। এ যে বুদ্ধগয়ার পথ। গয়ার ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বুদ্ধগয়া আর সেখান থেকে ডোভি জংশন ২২ কিলোমিটার। তার মানে

বুদ্ধগয়া ঘুরে যাবার জন্য আমাদের মাত্র ৪ কিলোমিটার পথ বেশি পাড়ি দিতে হবে।

বুদ্ধগয়ায় আসা গেল। এখানে আসার দুটি কারণ। যাঁরা কোনদিন আসেন নি, তাঁরা চট করে দর্শন করে নেবেন। আর আমাদের পাঁচখানি বাস-এর দু'খানির এখানে রাত কাটাবার কথা। তাদের একটু খোঁজ-খবর করা।

খবর পাওয়া গেল, চার নম্বর বাসখানি রাতে এখানে ছিল। কিছুক্ষণ আগে এলাহাবাদ রওনা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাঁচ নম্বর আসে নি।

ফকিরবাবু চিন্তিত। পাঁচ নম্বরের কি হল? পথে বিকল হয়েছে? অথবা কোন দুর্ঘটনা!

কিন্তু তাঁরা খবর না দিলে তো খবর পাবার কোন উপায় নেই। আবার আমাদের পক্ষেও সে খবরের জন্য এখানে বসে থাকা সম্ভব নয়। দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে।

সহযাত্রীরা দর্শন সেরে ফিরে এলেন। আমি, ঠাকুরমা ও পিসিমা ছাড়া আমাদের দলের সবাই গিয়েছিল দর্শন করতে। আমরা তিনজন এর আগে এখানে এসেছি। এসেছে সেজদি আর শঙ্করীও। তবু ওরা গিয়েছিল কাকুর সঙ্গে। কারণ ফাউ পেয়ে ছেড়ে দেবার মতো বোকা ওরা নয়।

পৌনে ন'টার সময় ডোভি জংশনে ফিরে এলাম। গতকাল রাতে বুঝতে পারি নি, আজ দেখছি এটি চারটি পথের সঙ্গম—কলকাতা হাজারিবাগ গয়া এবং ঔরঙ্গাবাদ। সেই দু-নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এবারে আমাদের বাস ঔরঙ্গাবাদের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভারতে বেশ কয়েকটি ঔরঙ্গাবাদ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বোধ করি মহারাষ্ট্রেরটি। অজন্তা-ইলোরা দর্শনার্থীরা প্রায় সকলেই সেখানে রাত কাটিয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গেও একটি ঔরঙ্গাবাদ রয়েছে। সেটি বিড়ি শিল্পের জন্য সবিশেষ বিখ্যাত।

সকাল দশটায় ঔরঙ্গাবাদ পৌছন গেল। চা খাবার জন্য ড্রাইভার পনেরো মিনিট ছুটি মঞ্জুর করলেন। হৈ হৈ করে নেমে পড়লেন সবাই। শুরু হলো কেনা-কাটা। এখানে বেশ ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। কাকু আর সুধাংশু অনেক ফল কিনে ফেলল। মুখে বলছে—ঠাকুরমা ও পিসিমার জন্যে। কিন্তু পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে—আমাদেরও ভাগ রয়েছে।

চা খেয়ে উঠে আসার পরে বাস ছাড়ল। কলকাতা থেকে ঔরঙ্গাবাদ ৫১৪ কিলোমিটার। এখান থেকে পথ গিয়েছে—ডাল্টনগঞ্জ ও রাঁচি।

বাস এগিয়ে চলেছে। আপেল খেতে খেতে আমি ভেবে চলি মেলার কথা

—কুম্ভমেলা। এবারে মেলায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হবে। তাই কর্তৃপক্ষ বিবিধ বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। স্নানার্থীদের যাতে রাতে স্নান করতে কোন অসুবিধা না হয়, তাই সঙ্গমে বিশ মিটার উঁচু আলোকস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। যমুনায় জল বেশি। পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাই যমুনার তীরে তীরে হাজার হাজার বালির বস্তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছ' হাজার ঝাড়ুদার মেলানগরী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সর্বদা কর্মরত রয়েছেন। এক হাজার কর্মী কীটনাশক ওষুধ ছড়াবার কাজে ব্যস্ত আছেন। শুধু মশা-মাছি মারার জন্যই তেরো লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। ফলে ২৬৫২ একর এলাকা নিয়ে গঠিত কুম্ভনগরী এখন মশা ও মাছিশূন্য।

শুনেছি এই সুবিরাট মেলানগরী পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—প্যারেড গ্রাউণ্ড, সঙ্গম, গঙ্গাদ্বীপ, ঝুসি ও এ্যারাইল। অংশগুলোর আয়তন যথাক্রমে ৪৬০ একর, ৭৪৫ একর, ৩২০ একর, ৫১৬ একর ও ৬১০ একর। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছাড়িয়েই প্যারেড গ্রাউণ্ড, তারপরে বাঁধ রোড। এই পর্যন্ত স্থায়ী ভূখণ্ড। সারা বছরই জলের ওপরে থাকে। তাই এই অংশে ঘাস ও গাছপালা আছে। বাঁধের পুবে বালিময় সঙ্গম এলাকা। তারপরে গঙ্গার দুটি ধারার মাঝখানে গঙ্গাদ্বীপ; গঙ্গাদ্বীপের ওপারে ঝুসি। আর সঙ্গমের বিপরীত দিকে যমুনার দক্ষিণ পারে এ্যারাইল। এটি নৈনী জংশনের সংলগ্ন এলাকা।

গঙ্গাদ্বীপ সঙ্গমের নিকটতম ভূখণ্ড। গঙ্গাদ্বীপের সঙ্গে মূল-ভূখণ্ডের যোগাযোগের জন্য দশটি পণ্টুন ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। এই পুলগুলো বারো ফুট চওড়া ও সাড়ে চার শ' ফুটের মতো লম্বা। এগুলো তৈরি করতে ১২.৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

যমুনা পারাপার ও সঙ্গমে যাবার জন্য আড়াই হাজার দেশী নৌকোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এক লক্ষ দু' হাজার বিভিন্ন আকারের সরকারী তাঁবু, ২০৬৪টি বেসরকারী তাঁবু ও সামিয়ানা নিয়ে গঙ্গা-যমুনার তিন তীর ও গঙ্গাদ্বীপে গড়ে উঠেছে কুম্ভনগরী। এলাহাবাদ ও মেলানগরীর শান্তিরক্ষার জন্য তেরো হাজার পুলিশ-কর্মী দিবারাত্রি কর্মরত রয়েছেন। কয়েক হাজার হোমগার্ড তাঁদের সাহায্য করছেন। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ যাত্রীদের সেবায় সর্বদা আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেবল ভারত সেবাশ্রমেরই প্রায় দু-হাজার স্বেচ্ছাসেবক আছেন। বহুকাল ধরে ভারত সেবাশ্রম সংঘ কুম্ভমেলায় সাধুদের

স্নানপর্বটি পরিচালনা করে আসছেন।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য কুম্ভনগরে অনেকগুলি ডাক ও তারঘর স্থাপন করা হয়েছে। নিরুদ্দেশ সহ অন্যান্য ঘোষণার জন্য প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে মাইক বসানো হয়েছে। স্থাপিত করা হয়েছে রেডিও এবং টেলিভিশন সেট।

গৌরবের কথা এই বিরাট কর্মকাণ্ডের যিনি প্রধান পরিচালক, তিনি একজন বাঙালী—এলাহাবাদ ডিভিশনের কমিশনার শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য। একজন যাত্রী হিসেবে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি।

"এটা কোন্ জায়গা ঘোষদা ?"

শঙ্করীর ডাকে ভাবনা থেমে যায়। বাইরে তাকিয়ে বলি, "মনে হচ্ছে শোননগর। এটি শোন নদীর পুব পার। এখান থেকে শোনবাঁধ ৮ কিলোমিটার।"

"তার মানে ডিহরি-অন্-শোন এসে গেল ?"

"হ্যাঁ, এর পরেই পুল। আমরা কলকাতা থেকে ৫০৬ কিলোমিটার এলাম।"

"এলাহাবাদ আর কতদূর ?"

মনে মনে হিসাব করে বলি, "২৭৫-কিলোমিটার।"

"তার মানে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এসে গিয়েছি!"

মাথা নাড়ি। শঙ্করী খুশি হয়। শুধু সে কেন সবাই, হয়তো বা আমিও।

বাস শোন নদীর পুলের ওপরে ওঠে। বেশ চওড়া পুল—পাশাপাশি দু-খানি বাস স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। ডানদিকে একটু দূরে রেলের পুল। একখানি মালগাড়ি চলেছে সে পুলের ওপর দিয়ে।

৩·১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সুবিরাট পুল। কিন্তু নদীতে জল প্রায় নেই বললেই চলে—শুধুই বালি। কেবল মাঝখানে সংকীর্ণ দুটি ধারা বইছে। বর্ষাকালের কথা বাদ দিলে, এই হচ্ছে ভারতের প্রায় সমস্ত নদীর রূপ। যুগ যুগ ধরে পলি পড়ে নদীর গভীরতা গিয়েছে কমে। বর্ষার জল বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা সে ফেলেছে হারিয়ে। ফলে বর্ষাকালে দু-কূল ছাপিয়ে বিধ্বংসী বন্যা হচ্ছে, আর শীতকালে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। সে চাষের কাজে আসছে না বরং চাষের জমি গ্রাস করে চলেছে। তার পরিবহণের ক্ষমতা হয়েছে লুপ্ত।

আমরা বাঁধ দিয়ে বন্যারোধের চেষ্টা করছি। কিন্তু একটু বেশি বৃষ্টি হলে এই বাঁধের জন্য বর্ষার জল নদীতে যেতে পারে না। ফলে এক নতুন ধরনের বন্যা দেখা দিচ্ছে। যাঁরা গত বছরের বন্যার সময় মেদিনীপুর জেলার ময়না

ব্লকের দুরবস্থার কথা শুনেছেন, তাঁরা এই ধরনের বন্যার ভয়াবহতা বুঝতে পারবেন।

নদী দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নদীর তীরে তীরে বিস্তৃত হয়েছে সভ্যতা। আর্য-সংস্কৃতির ধারা গঙ্গা বেয়ে উত্তরভারত থেকে পূর্বভারতে প্রবাহিত হয়েছে। গত শতাব্দীতেও পুণ্যার্থীরা পূর্ববঙ্গ থেকে নৌকোয় করে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় এসেছেন। আর এখন নবদ্বীপেও সারা বছর নৌকো চলে না। কলকাতায় গঙ্গা বেঁচে আছে বঙ্গোপসাগরের জলে। আমরা প্রয়াগে চলেছি। সঙ্গমে দাঁড়ালেই দেখতে পাবো, যমুনা যদি ওখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত না হতো, তাহলে গঙ্গা আর গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারত না। শীতকালে ফারাক্কায় যে জল আসে, তার অধিকাংশই যমুনার। নদীমাতৃক দেশে নদী আজ প্রায় দেশের শত্রু হয়ে দেখা দিয়েছে।

অথচ নদীসম্পদকে কাজে না লাগাতে পারলে, দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। অবিলম্বে ভারতের প্রত্যেকটি প্রধান নদীতে খননকার্য শুরু করা প্রয়োজন। নদীর মাঝখানে গভীর করে কেটে দু'দিক পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হবে। এতে সারা বছর নদীতে জল থাকবে কিন্তু বর্ষায় বন্যা হবে না। পরিবহণ ব্যবস্থায় নদী সবিশেষ সাহায্য করবে আর লক্ষ লক্ষ একর চাষের জমি উদ্ধার হবে।

কাজটা কঠিন সন্দেহ নেই কিন্তু এর জন্য তো কোন বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন পড়বে না। হিমালয়ে যেমন পাথরের অভাব নেই, তেমনি মানুষের অভাব নেই ভারতে। যে-দেশে পাতাল-রেল হতে পারে, সে-দেশে নদী কাটানো যাবে না কেন ?

শোন নদীর পুল পেরিয়ে আমরা ডিহরি-অন্-শোনে এলাম। এটি বৃটিশদের দেওয়া নাম। এই শহরের আধুনিক নাম—ডালমিয়া নগর।

কিন্তু ডালমিয়া নগরের ভাবনা থাক, তার চেয়ে মেলার কথা ভাবা যাক—কুম্ভমেলা। এলাহাবাদ ভারত সেবাশ্রম সংঘের বৃদ্ধসন্ন্যাসী পূজ্যপাদ মহেশানন্দজী মহারাজ কয়েকদিন আগে আমাকে কুম্ভমেলা থেকে চিঠি লিখেছেন—এই নিয়ে আমি প্রয়াগের তিনটি পূর্ণকুম্ভে সেবাকার্যে এলাম, কিন্তু এমন সুবিরাট সুবন্দোবস্ত এর আগে কখনও দেখি নি।

তিনিই একদিন কথায় কথায় আমাকে ১৯৫৪ সালের সেই দুর্ঘটনার কথা বলেছেন। মহেশানন্দজী নিজে তখন মেলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মতে সেই দুর্ঘটনার মূল-কারণ পুলিশ ও অন্যান্য প্রধান-প্রধান সরকারী অফিসারদের গা-ফিলতি। তাঁরা মেলায় উপস্থিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজেদের

কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে মেলায় দেখা দিয়েছিল চরম অব্যবস্থা।

১৯৫৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তখন প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে কেবলমাত্র ত্রিবেণী রোড দিয়ে বাঁধে উঠতে কিংবা নামতে হতো। সেদিন দুপুরে দায়িত্বশীল সরকারী অফিসারগণ যখন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে নিজ নিজ 'বোতাম' দেখাতে ব্যস্ত, তখন মেলার মানুষ খবর পেলেন—নাগা সন্ন্যাসীরা ত্রিবেণী রোড ধরে সঙ্গমে স্নান করতে আসছেন। ব্যস, হাজার হাজার পুণ্যার্থী তাঁদের দর্শন করে সম্ভব হলে প্রণাম করে অক্ষয় পুণ্যলাভের জন্য আকুল হলেন। চারিদিক থেকে তাঁরা ছুটে চললেন বাঁধের দিকে, ত্রিবেণী রোডের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। সাধারণ পুলিশকর্মীরা দিশাহারা। তাঁরা অভিভাবকশূন্য। অভিভাবকরা তখনও রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর তাঁবুর চারিপাশে ঘুরঘুর করছেন।

নাগা সন্ন্যাসীরা বাঁধের ওপরে উঠে আসছেন দলে দলে। বাঁধের নিচে সমবেত হয়েছেন হাজার হাজার ভক্ত। তাঁরা সবাই সন্ন্যাসীদের পদধূলি নিতে বদ্ধপরিকর। এদিকে তাঁদের পেছনে প্রচণ্ড চাপ শুরু হয়ে গেছে। সবাই সামনে আসতে চাইছেন। বাধ্য হয়ে সামনের ভক্তরা বাঁধের ওপরে উঠতে আরম্ভ করেন। অনেকেরই মাথায় বোঝা কিংবা কোলে শিশু।

পথ ও প্রান্তর লোকে লোকারণ্য। সন্ন্যাসীদের পথ বন্ধ। তাঁরা ভুল বোঝেন। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ত্রিশূল উঁচিয়ে তাঁরা ওপর থেকে নিচে নামতে শুরু করেন। সন্ন্যাসীদের তাড়া খেয়ে পুণ্যার্থীরা পালাতে চান। কিন্তু কোথায় পালাবেন? তাঁদের পেছনে জনসমুদ্র।

পুণ্যার্থীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বেসামাল যাত্রীরা একে অপরের গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়তে থাকেন।

সন্ন্যাসীদের গতি অব্যাহত। তাঁরা কুম্ভস্নানে এসেছেন। স্নানের সময় উৎরে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রা দুর্বার বেগে ওপর থেকে নেমে আসে। নিচে পড়ে যাওয়া নর-নারীদের গায়ের ওপর দিয়েই তাঁরা এগিয়ে চলেন। পদধূলির পরিবর্তে হতভাগ্য পুণ্যার্থীরা সহযাত্রী ও সন্ন্যাসীদের পদতলে পিষ্ট হয়ে মোক্ষ লাভ করেন। হাজার হাজার ভক্ত আহত হন। এবং মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সরকারী মতে ৩২১ জন পুণ্যার্থী সেবারে শহীদ হয়েছেন।

সারা মেলায় হাহাকার পড়ে গেল। কেউ স্বামী হারিয়ে নিজে হাসপাতালে

গিয়েছেন, কেউ বা স্ত্রী হারিয়ে। কেউ সন্তান হারিয়েছেন, কেউ বা মা-বাবা। কেউ বোন কিংবা ভাই। প্রিয়জনের কান্নায় এলাহাবাদের আকাশ-বাতাস আকুল হলো।

বহু মৃতদেহ সনাক্তকরণের মানুষ পাওয়া গেল না। সারি সারি মৃতদেহ সাজিয়ে রাখা হলো পথের পাশে। বয়স্ক প্রায় প্রত্যেকের পকেটে কিংবা কোমরে টাকা-পয়সা। মেয়েদের অনেকের গায়ে গয়না-গাঁটি।

প্রত্যেক পুণ্যমেলায় চিরকাল প্রচুর পাপীর আগমন ঘটে। সেবারেও তাই হয়েছিল। মিথ্যে আত্মীয় সেজে মায়াকান্না কেঁদে তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মৃতদেহ নিয়ে গিয়েছে। তারপরে মৃতব্যক্তির কোমর থেকে টাকার থলি কিংবা গায়ের গয়না খুলে নিয়ে তাঁকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। পূর্ণকুম্ভের পুণ্যপ্রয়াগ পুণ্যতম তিথিতে মানুষের চরমতম পাপের সাক্ষী হয়েছে।

"বাঁদিকে তাকিয়ে দেখুন, শেরশাহের সমাধি দেখা যাচ্ছে।"

ফকিরবাবুর কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। বাঁদিকে তাকাই। শের-শাহের সমাধি দেখি।

"এটা তাহলে সাসারাম?" শঙ্করী বলে।

মাথা নাড়ি।

"আমরা এখনও বিহারে!" শঙ্করী বিস্মিতা।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ। কলকাতা থেকে ৫৬০ কিলোমিটার এলাম। এখান থেকে বিহার-উত্তর প্রদেশ সীমান্ত কর্মনাশা নদী আরও ৭২ কিলোমিটার।"

"আর এলাহাবাদ?" সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

"হিসেব করো।" আমি বলি, "৮১১ থেকে ৫৬০ বাদ দাও।"

"২৫১ কিলোমিটার।" একটু বাদে মনোরঞ্জন বলে ওঠে।

"বাঃ বাঃ তুমি তো অঙ্কে বেশ স্ট্রং!" দাদু মন্তব্য করেন।

আমরা হেসে উঠি। মনোরঞ্জন লজ্জা পায়।

এবারে নিরঞ্জনবাবু কথা বলেন, "আচ্ছা শঙ্কুদা! কল্পবাস জিনিসটা কি? এবার কুম্ভমেলায় শুনেছি, প্রায় পাঁচ লক্ষ পুণ্যার্থী কল্পবাস করছেন?"

"ঠিকই শুনেছেন।" আমি বলি। একটু থেমে আবার শুরু করি, "যে-সব পুণ্যার্থী মনে করেন, তাঁদের সাংসারিক কর্তব্য শেষ, সর্বপ্রকার ভোগ পূর্ণ হয়েছে, তাঁরাই কুম্ভমেলায় কল্পবাস করতে আসেন। ছোট একটি ঘর বেঁধে কিংবা তাঁবু ফেলে তাঁরা একমাস মেলায় থাকেন। পর্যাপ্ত পোশাক কিংবা বিছানাপত্র আনেন না অনেকেই। এই প্রচণ্ড শীতে বালির চরে খড়কুটোর শুয়ে একখানি কম্বল

গায়ে দিয়ে রাত কাটান। সারাদিন ভগবৎ চিন্তা ও সাধন-ভজন করেন। দিনেরবেলায় উপবাসী থেকে ও জপ-তপ করে দেহ ও মনকে সর্বপ্রকার কলুষমুক্ত করে তোলার সাধনাই কল্পবাসের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁরা প্রত্যহ সঙ্গমে স্নান করেন। অনেকে দিনে তিনবার পর্যন্ত অবগাহন করে থাকেন। স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া তাঁদের আর কোন কামনা থাকে না। দিনান্তে গঙ্গাজল দিয়ে চারটি চাল ফুটিয়ে সিদ্ধ ভাত খান। কল্পবাসীরা গঙ্গাজল ছাড়া অন্য কোন পানীয় গ্রহণ করেন না। কৃচ্ছ্রসাধনের পথে তাঁরা আত্মশুদ্ধির তপস্যা করে থাকেন।

"কল্পবাসী হতে পারা ভক্ত হিন্দুদের কাছে পরম সৌভাগ্যের। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ৺লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মা পর্যন্ত প্রয়াগের কুম্ভমেলায় কল্পবাস করেছেন।"

জনৈক সহযাত্রীর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাস থামল। আর সেই সঙ্গে ফকিরবাবু চা 'স্যাংশন' করে ফেললেন। হৈ হৈ করে নেমে পড়লাম সবাই।

এ জায়গাটার নাম রোতাস। এখান থেকে উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত ২৪ কিলোমিটার। এখন বেলা একটা। মোগলসরাইতে লাঞ্চ-ব্রেক। কিন্তু সুধাংশুরা এখানেই লাঞ্চ-প্যাকেট দিয়ে চা খেয়ে নিল। তার মানে আজও আমাকে এদের সঙ্গে ভাত খেতে হবে। আর তাই আমার প্যাকেটটাও দিয়ে দিয়েছি ওদের।

চায়ের পরে বাস ছাড়ল। একটু বাদে সেজদি জিজ্ঞেস করেন, "কুম্ভমেলা চার জায়গায় হয়, তাই না ঘোষদা?"

"হ্যাঁ!" আমি উত্তর দেবার আগেই শঙ্করী বলে, "প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে।"

"শঙ্কুদা তো চারটে জায়গাই দেখেছেন।" সুধাংশু বলে।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"কিন্তু বই লিখেছেন কেবল নাসিককে নিয়ে—পঞ্চবটী।"

সুধাংশুর বক্তব্য অনুমান করতে পারি। সহাস্যে বলি, "হরিদ্বারের কথা আমি লিখেছি বিভিন্ন বইতে আর প্রয়াগ নিয়ে লিখে দেব তোমাকে।"

"তাহলেও উজ্জয়িনী বাকি থাকবে এবং কালিদাসের দেশ নিয়ে আপনার অবশ্যই একখানি বই লেখা উচিত।"

"শঙ্কুদা!" দাদু বলেন, "সুধাংশু ব্যবসায়ী এবং ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

তুমুল হাস্যরোল।

হাসি থামলে সেজদি বলেন, "প্রয়াগের কথা শুনেছি, অন্য তিন জায়গায়

কখন কখন কুম্ভমেলা হয় ?

অতএব আমাকে শুরু করতে হয়,“চৈত্রসংক্রান্তি অর্থাৎ মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বৃহস্পতির সঙ্গে কুম্ভরাশির এবং রবির সঙ্গে মেষরাশির মিলন হলে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ হয়। অনেকের মতে কুম্ভরাশির সঙ্গে বৃহস্পতির মিলনেই কেবল অমৃত-যোগ সুতরাং হরিদ্বারের কুম্ভই প্রকৃত পূর্ণকুম্ভ।”

“সেকি!” নিরঞ্জনবাবু যেন আঁতকে ওঠেন, ‘আমরা কি প্রকৃত পূর্ণকুম্ভে যাচ্ছি না।”

“যাচ্ছ বই কি!” দাদু তাঁকে সান্ত্বনা দেন, “শঙ্কুদা বলেছেন—অনেকে বলেন, এবং যাঁরা বলেন আমরা তাঁদের দলে নই।”

“আচ্ছা, হরিদ্বারের কুম্ভে তো সবাই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করেন ?” শঙ্করী বলে।

উত্তর দিই, “হ্যাঁ, শিবরাত্রিতে প্রথম-স্নান, চৈত্র অমাবস্যায় দ্বিতীয়-স্নান ও মহাবিষুব সংক্রান্তিতে তৃতীয় তথা প্রধান-স্নান হয়।” একটু থেমে আবার বলি “হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রায় প্রথম থাকেন নিরঞ্জনী ও জুনা আখড়ার সাধুরা। তাঁরা পাশাপাশি এগিয়ে চলেন। তাঁদের পেছনে থাকেন নির্বাণী, বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা আখড়ার সন্ন্যাসীগণ।”

“এবারে নাসিক কুম্ভমেলার কথা বলুন।” সেজদি আমাকে অনুরোধ করেন।

শুরু করি, “নাসিকের কুম্ভমেলা শুরু হয় শ্রাবণ মাসে। বৃহস্পতির সঙ্গে মঙ্গল ও শুক্রের সঙ্গে সিংহরাশির মিলনের সন্ধিক্ষণে প্রথম-স্নান। ভাদ্র অমাবস্যায় দ্বিতীয় ও কার্তিক শুক্লা একাদশীতে তৃতীয়-স্নান হয়।”

“তার মানে প্রায় তিনমাস ধরে নাসিকে কুম্ভমেলা চলে ?” শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

মাথা নেড়ে বলতে থাকি, “নাসিক থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গোদাবরীর উৎস ত্র্যম্বকেশ্বরে সন্ন্যাসীদের শিবির হয়। তাঁরা কুশাবর্ত ঘাটে স্নান করে। জুনা ও নিরঞ্জনী আখড়ার সন্ন্যাসীগণ পাশাপাশি শোভাযাত্রার প্রথমে থাকেন। তাঁদের পরে একে একে আসেন বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা আখড়ার সন্ন্যাসীবৃন্দ।”

আমি থামতেই সেজদি বলেন, ‘উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলা হয় বৈশাখ মাসে, তাই না ঘোষদা ?”

“হ্যাঁ।” আমি বলি, “বৈশাখী পূর্ণিমায় রবির সঙ্গে মেষ ও বৃহস্পতির সঙ্গে সিংহরাশির মিলনমুহূর্তে উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীতে কুম্ভস্নান হয়। সেখানে একদিনই স্নান হয়। শোভাযাত্রার মাঝখানে জুনা, তাঁদের ডাইনে নিরঞ্জনী ও

বাঁয়ে নির্বাণী আখড়ার সন্ন্যাসীরা থাকেন। তাঁদের স্নান শেষ হলে শিপ্রার অপর তীরে বৈরাগী উদাসী ও নির্মলা আখড়ার সাধুরা পর পর স্নান করে থাকেন।"

"মেলায় বসে তাঁদের দেখতে পাওয়া যায়?" কানাই জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, 'হ্যাঁ। কারণ শিপ্রা সুন্দর নদী হলেও মোটেই সুপ্রশস্ত নয়, পূর্ববঙ্গের একটি বড় খালের মতো চওড়া, এপার-ওপার খুব ভাল দেখা যায়।"

"আচ্ছা ঘোষদা!" শঙ্করী বলে, "এই চারটি মেলাক্ষেত্রের মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে সুন্দর?"

"চারটিই সুন্দর, তবে চার জায়গার চার রকম সৌন্দর্য। তাহলেও বলব সবদিক বিবেচনা করলে হরিদ্বার সবচেয়ে সুন্দর। তারপরে যথাক্রমে নাসিক, উজ্জয়িনী ও প্রয়াগের স্থান।"

"তার মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচারে প্রয়াগের স্থান সবার শেষে?"

"কিন্তু প্রয়াগ প্রশস্ততম। তাই এখানেই হয় সবচেয়ে বড় মেলা। আমরা সেই মেলায় চলেছি।"

"প্রতি তিন বছর বাদে অর্ধকুম্ভ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু নাসিক আর উজ্জয়িনীতে তো অর্ধকুম্ভ হয় না?" এতক্ষণ পরে কাকু কথা বলে।

উত্তর দিই, "না। কেবল হরিদ্বার ও প্রয়াগে অর্ধকুম্ভের মেলা বসে।"

মৃদু ধাক্কা দিয়ে শঙ্করী সহসা বলে, "চলুন।"

"কোথায়?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি।

শঙ্করী উত্তর দেয়, "নিচে। বাস থেমেছে।" সে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ম্যানেজার বাধা দেয়। বলে, "চেক্-পোস্ট বলে গাড়ি থেমেছে। সামনেই কর্মনাশা নদীর পুল। ঐ পুল পার হলেই আমরা বিহার ছেড়ে উত্তরপ্রদেশ প্রবেশ করব। তাই পারমিট দেখাবার জন্য গাড়ি থেমেছে। এখুনি ছেড়ে দেবে।"

"কিন্তু একভাবে বসে থেকে থেকে যে গা-হাত-পা অবশ হয়ে গেল ম্যানেজারবাবু!" শঙ্করী সহজে ম্যানেজারের নির্দেশ মানতে চায় না।

ম্যানেজার সবিনয়ে বলে, "আর আধঘণ্টা বসুন, মোগলসরাই মাত্র ৩১ কিলোমিটার। সেখানে লাঞ্চ্-ব্রেক। অনেকক্ষণ বেড়াতে পারবেন।"

অগত্যা শঙ্করী বসে পড়ে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছাড়ে। আমরা উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করি। ভাবতে ভাল লাগছে, আমি এই প্রদেশের ওপর এ পর্যন্ত এগারোখানি বই লিখেছি।

বাস এগিয়ে চলেছে। সহযাত্রীরা অনেকেই কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু। তবে তাঁরা

বোধকরি ক্ষুধার্ত বলে ছটফট করছেন আর শঙ্করী ছটফট করছে পায়চারি করার জন্য। সে বয়সে তরুণী। তার পক্ষে ছটফট করা স্বাভাবিক। তবে প্রয়োজনে সে নিজেকে খুবই গুটিয়ে নিতে পারে। সেবারে রাজস্থান-দ্বারকা ভ্রমণের সময় আমি তার আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বোনঝি শ্রী অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মাকে আমাদের সঙ্গে দ্বারকায় পাঠিয়ে সে নিজে তার ন'দি পূর্ণিমার সঙ্গে আবু রোডে থেকে গিয়েছিল। অথচ সে বেড়াতে বড়ই ভালবাসে।*

বাস এগিয়ে চলেছে। কলকাতা থেকে উত্তরপ্রদেশ আসতে আমাদের ত্রিশ ঘণ্টা সময় লাগল। এর মধ্যে অবশ্য প্রায় ন' ঘণ্টা আমরা গয়ায় বিশ্রাম করেছি। তার মানে ৬৩২ কিলোমিটার পথ আসতে একুশ ঘণ্টা বাস-এ বসে থাকতে হয়েছে।

আজ সকাল থেকে পথের দিকে বড় একটা তাকাই নি। মানে তাকাবার তেমন ফুরসত পাই নি। হয় মনে মনে মেলার কথা ভেবেছি, নয়তো আলোচনা করেছি। এবারে পথের দিকে তাকাই। বুঝতে পারছি পথের ভিড় বেড়েছে। ভিড় বলতে গাড়ির ভিড় আর গাড়ি বলতে আধুনিকতম মোটর থেকে মহারাজ মান্ধাতার রথ তথা একা পর্যন্ত সবই রয়েছে। তবে প্রায় সব গাড়ি একই দিকে চলেছে। তাই চলবে। আগেই বলেছি এখন সারা দেশের সব পথ—প্রয়াগের পথ। প্রয়াগ যত নিকটতর হবে, পথের ভিড়ও তত বাড়বে।

কিন্তু বেশিক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে থাকা দায়। মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনার দৃশ্য চোখে পড়ছে। অধিকাংশই মোটর দুর্ঘটনা। কোথাও কোন গাড়ি দুমড়ে গিয়েছে কিংবা গিয়েছে গুঁড়িয়ে। কোথাও কোনটি পাশ ফিরে পড়ে আছে, কোনটি বা একেবারে উল্টে গেছে। এক কথায় ভয়াবহ দৃশ্য। দেখছি আর বার বার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমাদের অদৃষ্টে কী আছে, কে জানে?

কাকুর ডাক শুনে কূল খুঁজে পাই। তাড়াতাড়ি তার দিকে তাকাই। পথ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার সুযোগ পেয়ে বর্তে যাই।

কাকু জিজ্ঞেস করে, "প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সাধুদের স্নান-শোভাযাত্রার কথা তো বললি না তখন!"

আগেই বলেছি, আমার কাকু ডাক্তার হয়েও ভক্ত মানুষ। সাধুদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সে বোধহয় তখন থেকেই কথাটা ভাবছিল বসে বসে। এবারে জিজ্ঞেস করে ফেলেছে।

* লেখকের 'রাজভূমি রাজস্থান' দ্রষ্টব্য।

বলি, "প্রয়াগের শোভাযাত্রায় সবার আগে থাকেন নির্বাণী আখড়ার সাধুরা। তাঁদের পরে থাকেন নিরঞ্জনী, জুনা, বৈরাগী, উদাসী ও নির্মলা আখড়ার সন্ন্যাসীগণ।"

ম্যানেজার তার কথা রেখেছে। বেলা ঠিক দুটোর সময় আমাদের বাস মোগলসরাই বাজারে এসে থামল। কলকাতা থেকে মোটরপথে মোগলসরাই ৬৬১ কিলোমিটার। আর মাত্র দেড় শ' কিলোমিটার।

সামনেই একটা জলের কল রয়েছে এবং সেটা থেকে জল পড়ছে। সহযাত্রীরা বাস থেকে নেমে হাত-মুখ ধোয়ায় লেগে গেলেন। ঠাকুরমা ও পিসিমা আবার গিয়ে গাড়িতে বসলেন। আজ ম্যানেজার গয়াতেই তাঁদের ফল-মিষ্টি দিয়ে দিয়েছে।

সহযাত্রীরা লাঞ্চ-প্যাকেট নিয়ে চায়ের দোকানে চলে গেলেন। আমাদের প্যাকেট ফুরিয়ে গিয়েছে। সুধাংশু সবাইকে নিয়ে একটা হোটেলে ঢুকল। আমি ও দাদু সুযোগ পেয়ে মাথা ধুয়ে নিলাম। তারপরে সুধাংশুদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

এসে দেখি ওরা ভাত-ডাল-তরকারী ও দই-মিষ্টি নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছে। সুধাংশু হাসতে হাসতে বলে, "বাঙালীর কি ভাত পেটে না পড়লে দিন কাটতে চায় শঙ্কুদা!"

"আর তাই তো এদেশের মানুষ আমাদের ভেতো-বাঙালী বলে।" উত্তর দিই।

"তা বলুক গে!" দাদু বলেন, "তাহলেও আমরা ভাত খেয়ে যাবো।"

ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে, ম্যানেজার মুহুর্মুহু বাঁশি বাজাচ্ছে। অতএব গোগ্রাসে গিলে খাওয়া শেষ করতে হয়।

সুধাংশু বলে, "আপনারা গিয়ে গাড়িতে বসুন। আমার পান না হলে চলবে না। আমি আসছি।"

সুধাংশু গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার স্টার্ট দেয়। বাস এগিয়ে চলে। বেলা আড়াইটে।

কয়েক মিনিট বাদেই জয়ধ্বনি উঠে—গঙ্গা মাঈ কী জয়!

দু-হাত জড়ো করে আমরা মা-গঙ্গাকে প্রণাম করি। দেবী সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে! তোমাকে প্রণাম। তোমার উৎস থেকে আমার সাহিত্য-পথ যাত্রা শুরু হয়েছে। আমি তোমার উৎসের উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহে পদচারণা করেছি, তোমার সাগর-সঙ্গমে রাত্রিবাস করেছি। দর্শন করেছি তোমার সখী যমুনার

উৎস। আজ চলেছি তোমাদের দুটি সখীর মিলনভূমি পুণ্য-প্রয়াগে। তুমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো। মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ ক'রো—আমি যেন তোমার তীরে-তীরে ঘট ভরে আমার জীবন-দেবতার পুজো শেষ করতে পারি। আমি যেন তোমারই বালুকাবেলায় পঞ্চভূতে মিশে যাই।

গঙ্গা পেরিয়ে আসি। এই পুলের নাম মালব্য পুল। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নামে উৎসর্গীকৃত।

পুল পেরিয়েই দু-নম্বর ও সাত-নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গম। সাত-নম্বর সড়ক মীর্জাপুর চলে গিয়েছে। আমরা দু-নম্বর ধরে কাশীর দিকে এগিয়ে চললাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোক্ষতীর্থ বারাণসী ধামের পুণ্যভূমিতে উপনীত হলাম। ৬৭৬ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া হলো।

কিন্তু বাস থামল না। জনবহুল পথ এড়িয়ে শহরের বাইরে দিয়ে ছুটে চলল।

"আমরা নামব না কাশীতে!"

"বাবা-বিশ্বনাথকে দর্শন করব না একবার?" সহযাত্রীরা অনেকেই প্রশ্ন করে ওঠেন।

"করব।" ম্যানেজার উত্তর দেয়, "তবে এখন নয়, ফেরার পথে।"

"এখন একটু থামলে কি ক্ষতি হত?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জনৈকা বৃদ্ধা বলে ওঠেন।

"ক্ষতি একটু হবে দিদি!" বিনীত কণ্ঠে দীপ্তি বলে, "আপনারা কাশীর বিশেষ করে বিশ্বনাথ মন্দিরের অবস্থাটা জানেন না। কুম্ভমেলায় যাওয়া-আসার পথে প্রতিদিন হাজার-হাজার যাত্রী সেখানে হাজির হচ্ছেন। তাছাড়া বাস রাখতে হবে বহু দূরে। পাঁচ-ছ' ঘণ্টার আগে দর্শন সারতে পারবেন না। বেলা তিনটে বাজে, এখনও ৮৫ মাইল পথ যেতে হবে। অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

দীপ্তির নিবেদন ব্যর্থ হয় না। বৃদ্ধা শান্ত হন এবং অন্যান্যরা চুপ করে থাকেন। বাস এগিয়ে চলে।

কিছুক্ষণ কেটে যায় নীরবে। তারপরে মাসিমা জিজ্ঞেস করেন আমাকে, "আরও পঁচাশি মাইল!"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই, "কাশী থেকে এলাহাবাদ ১৩৫ কিলোমিটার।"

মাসিমা বলেন, "কিন্তু আর যে পারা যাচ্ছে না। গা-হাত-পা সব শক্ত হয়ে গেছে; কোমর টন-টন করছে।"

মাসিমা হলেন আমার বন্ধু গুরুপদ সেনগুপ্তের মা। বহু তীর্থ দর্শন করেছেন। একবার বিলেত-আমেরিকাও বেড়িয়ে এসেছেন। সেখানে গুরুপদর ছোট ভাই ও বোন থাকে। মাসিমারও একভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট হবারই

কথা, সবারই হচ্ছে।

তবু তীর্থদর্শনে বেরিয়ে শরীরের ভাবনায় বিচলিত হওয়া সমীচীন নয়। তাই তাড়াতাড়ি বলি, "আর মাত্র ঘণ্টা তিনেক। তারপরেই এই ক্লান্তিকর বাসযাত্রা শেষ হবে।"

"কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো শরীরের ভাবনা ভুলতে পারব না, তার চেয়ে বরং তুমি মেলার কথা বলো—কুম্ভমেলা।" মাসিমা বলেন।

আমি শুরু করি, "আপনি তো জানেন মাসিমা ১৪৪ বছর পরে গ্রহ-নক্ষত্রের এমন শুভযোগ ঘটছে, তাই এবার মৌনী অমাবস্যায় কুম্ভমেলায় অভূতপূর্ব ভিড় হবে।"

মাসিমা মাথা নাড়েন।

আমি বলতে থাকি, "উত্তরপ্রদেশ সরকার শুনেছি যাত্রীদের জন্য এবারে নানা রকমের সুবন্দোবস্ত করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রায় সাত কোটি টাকা খরচ পড়বে। মেলাতেই স্টেট ব্যাঙ্কের একটি শাখা খোলা হয়েছে।"

এসব কথা মাসিমার ভাল লাগছে কিনা বুঝতে পারছি না, তবু বলে চলি, "প্রতাপগড়, সীতাপুর, ফৈজাবাদ, রায়বেরিলী ও লখনউ প্রভৃতি জেলা থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পণ্টুন-ব্রীজ নির্মিত হয়েছে। সেনাবাহিনী যমুনার ওপরে ৯০ মিটার লম্বা একটি বেলি-ব্রীজ তৈরি করেছেন।"

না, মাসিমা শুনছেন। সুতরাং বলতে থাকি, "মেলায় পঁচাত্তরটি ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হয়েছে—চাল আটা চিনি তেল কয়লা ও কেরোসিন প্রভৃতির দোকান। প্রতিদিন মেলার সরকারী দরে ৩৩০০ মেট্রিক টন গম, ১৫০০ টন চাল, ১২৬৬ টন চিনি, ৬০০ টন ময়দা ১২০ টন সুজি, ২৪০০ টন আটা, ৫০০ টন বনস্পতি, ৩০০ টন নুন সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন মেলায় পাঁচ লক্ষ লিটার কেরোসিন তেল ও পঁচিশ হাজার লিটার দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন। মেলাতে সারারাত উজ্জ্বল আলো জ্বলবে, দিন-রাতের পার্থক্য বোঝা যাবে না। এজন্য ৫২৫ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন টানা হয়েছে, বসানো হয়েছে ৪৭০০টি লাইট পোস্ট। মেলার রাস্তায় রাস্তায় ৩৫০টি ফ্লাড লাইট, ১০৪টি মারকারী ভেপার ল্যাম্প এবং ১১৫৮টি অন্যান্য আলো দেওয়া হয়েছে। কলেরার ইঞ্জেকশন দেওয়া ও প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বত্রিশটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং দেড়শ' শয্যার একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে। ১০৫ জন ডাক্তার, ২৩ জন ট্রেন্ড নার্স এবং শতাধিক অন্যান্য কর্মী কর্মরত রয়েছেন।

আমি থামতেই পদ্মা প্রশ্ন করে, "আচ্ছা ভাইপো' পুজা-স্পেশালের মতো কুম্ভ-স্পেশাল ট্রেন দিচ্ছে না ?"

"দিচ্ছে, বৈকি!" উত্তর দিই, "এলাহাবাদ রেল-স্টেশনে ক'দিন ধরেই প্রতি পনেরো মিনিটে একখানি করে ট্রেন আসছে ও যাচ্ছে। ভারতের যে কোন দিকের যাত্রী স্টেশনে পৌছে ঘণ্টখানেকের মধ্যে গাড়ি পেয়ে যাবেন। আর মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে আরও বেশি ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ রাত বারোটা থেকে আগামীকাল রাত বারোটার মধ্যে তিনশ' স্পেশাল ট্রেন এলাহাবাদে আসবে।"

"তিন ··শ'··· !" শঙ্করী চমকে ওঠে।

"আমাদের মতো কত বাস আসবে ?" পিসিমা জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, "অন্তত হাজার পাঁচেক।"

"আর প্রাইভেট গাড়ি কত আসবে ভাসুরপো ?" কাকী বলে।

"হাজার দশেক তো আসবেই। তাছাড়া অন্তত পাঁচ হাজর ট্রাক ও টেম্পো আসবে।*

"এত সব গাড়ি রাখবে কোথায় ?" কাকুর গাড়ি আছে, সুতরাং গাড়ি রাখার সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

"শুনেছি এলাহাবাদ শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মাঠে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া এলাহাবাদে গাড়ি রাখায় সমস্যাটা কলকাতার মতো প্রকট নয়। ওখানে রাস্তাগুলো বেশ চওড়া এবং প্রায় প্রত্যেক বড় বাড়ির সামনে কিছু জমি আছে।"

"আমাদের কলকাতায় যেমন টি. ভি. আর রেডিওতে ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ 'রিলে' করা হয়, কুম্ভস্নানের সময় তেমন করা হবে না ?" শুধাংশু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

"হবে নয়' মকর সক্রান্তি স্নানের ধারাভাষ্য প্রচারিত হয়েছে. মৌনী অমাবস্যারও হবে।" উত্তর দিই।

মনোরঞ্জন বলে, "স্নানের সময় টি. ভি.-তে আমাদের ছবি নেওয়া হবে ?"

---

* ১৯৮৯ সালের প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে মৌনী অমাবস্যায় নাকি আনুমানিক দেড়কোটি পুণ্যার্থী পুণ্যস্নান করেছেন। কিন্তু এবারে কর্তৃপক্ষ মাত্র একশ' কুড়িটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অতএব আমার ধারনা সংখ্যাটি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

"ছবি নেওয়া হবে, তবে সে ছবি দেখে তোমার বউ তোমাকে চিনতে পারবে না, এই যা দুঃখের!" দাদু দুম করে বলে ফেলেন।

তাঁর কথা শুনে আমরা হেসে উঠি আর মনোরঞ্জন লজ্জা পায়। একে সে লাজুক প্রকৃতির, তার ওপর সবে বিয়ে করেছে। বেচারা বউকে বাড়ি রেখে আমাদের সঙ্গে মেলায় চলেছে। সুতরাং প্রসঙ্গটা তার উত্থাপন না করাই বোধ করি ভাল ছিল। কিন্তু দাদুকে কে রুখবে?

মনোরঞ্জনের দিক থেকে সবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্য বলতে শুরু করি, "বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও টি. ভি. প্রতিষ্ঠান কুম্ভমেলায় ছবি তুলতে এসেছেন। বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় চিত্রপরিচালক মিকেলানজেলো আনতোনিওনি তাঁর দলবল নিয়ে নিজেই এসেছেন। তিনি কুম্ভমেলার ওপরে একখানি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলবেন। সেই ছবি দেখে সারা পৃথিবীর মানুষ বিশ্বের এই বৃহত্তম মেলা ও ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করতে পারবেন।

কাকুদের সামনের সিটে দুটি যুবক বসে আছে। তাদের একজনের কাঁধে দুটো ক্যামেরা—একটা স্টিল্ ও একটা মুভি। তার সঙ্গী পিছন ফিরে তাকায়। আমাকে বলে, "কিন্তু আমরা শুনেছি, কাউকে স্নানের দৃশ্য তুলতে দেওয়া হচ্ছে না। কলকাতার একটি প্রধান দৈনিকের জনৈক ক্যামেরাম্যান মকরসংক্রান্তিতে স্নানের দৃশ্য তুলতে গিয়ে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। ফটো তুলবার এই বিধিনিষেধের জন্য দেশী-বিদেশী ক্যামেরাম্যানরা অনেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। কানাডা ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের একজন ফটোগ্রাফার তো যমুনার ওপর থেকে 'টেলিফটো লেন্স' দিয়ে স্নানের দৃশ্য তোলার চেষ্টা করছেন।"

"স্নানের জন্যই যে মেলা, সে মেলায় স্নানের দৃশ্য তুলতে দিতে এত আপত্তি কেন?" ক্যামেরাম্যান থামতেই তার বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করে। ওর প্রশ্ন শুনে মনে হবে আমি যেন মেলাকর্তৃপক্ষের একজন।

আমি কর্তৃপক্ষের কেউ নই। তবু তাঁদের হয়ে আমাকেই সওয়াল করতে হয়। বলি, "স্নানের সময় মেয়েদের জামা-কাপড় ঠিক থাকে না। আর সেই অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেকে বিবসনা যুবতীদের ছবি তোলে। তাই বোধ করি এই বিধি-নিষেধ।"

ক্যামেরাম্যান ও তার বন্ধু হয়তো বিরক্ত হয় আমার বক্তব্যে। তারা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে।

একটু বাদে শঙ্করী বলে, "কিন্তু বিধি-নিষেধ তো শুনেছি কেবল ছবি তোলার জন্য নয়, আরও নাকি নানারকম কড়াকড়ি করা হয়েছে এবারের কুম্ভমেলায়।"

"এত বড় মেলা, কিছু নিয়ম তো করতেই হবে। বিশেষ করে অনেক কম লোক আসা সত্ত্বেও সেবারে অনিয়মের জন্য যখন অমন দুর্ঘটনা ঘটে গেল।"

"কিন্তু তাই বলে যে রাস্তা দিয়ে সঙ্গমে যাবো, সে রাস্তা দিয়ে তাঁবুতে ফিরতে পারব না!" শঙ্করীর স্বরে বিদ্রোহ।

একটু হেসে বলি, "এ নিয়ম যে তোমাদের বাগবাজার পূজা-প্যাণ্ডেলেও করা হয়ে থাকে।"

"তা হয়।" শঙ্করী স্বীকার করে।

আমি যোগ করি, "এতবড় একটা জনসমাবেশ, কঠোর হাতে ব্যবস্থা না করলে যে দুর্ঘটনা ঘটবেই।

"কিন্তু দুর্ঘটনা নাকি এবারেও ঘটেছে শঙ্কুদা?" সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ। দুটি স্নান হয়ে গেছে। আনুমানিক ৬৪ লক্ষ মানুষ স্নান করেছে এই দু'দিনে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা মাত্র ঘটেছে একটি।"

"কি রকম?" মাসিমা জিজ্ঞেস করেন।

সুধাংশু নিজেই উত্তর দেয়, "সন্তোষকুমার শ্রীবাস্তব নামে একটি যুবক তার এক জ্ঞাতি ভায়ের সঙ্গে গত ৮ই জানুয়ারী প্রয়াগে স্নান করতে আসে। তার বাবা শ্রীরামানন্দ শ্রীবাস্তব ভাটনি জংশনের রেলওয়ে স্টেশন-মাস্টার, দাদা এলাহাবাদের একজন মুন্সেফ।"

"তা কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটল?" সেজদি প্রশ্ন করেন।

সুধাংশু বলে, "ওরা স্নান করে দু'জনেই উঠে আসে তীরে। তারপর হঠাৎ আবার কি যেন মনে হয় সন্তোষের। গা মুছতে-মুছতে সে সহসা তার ভাইকে বলে—তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আরেকটা ডুব দিয়ে আসি। ভাইকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে তর-তর করে জলে নেমে যায়। গলা-জলে গিয়ে দাঁড়ায়, ডুব দেয়। ভাই তাকে আর উঠতে দেখে নি, সন্তোষ আর ফিরে আসে নি তীরে!"

"কিন্তু তখন তো সেখানে আরও অনেকে স্নান করছিলেন!" নিরঞ্জনবাবু বলে ওঠেন।

"হ্যাঁ।" দাদু উত্তর দেন, "তাঁরাও কেউ আর সন্তোষকে দেখতে পায় নি।"

"আশ্চর্য!" কানাই মন্তব্য করে।

শঙ্করী সবিস্ময়ে বলে, "কিন্তু ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া গেল না কেন? জল-পুলিশের দু'শ জন জওয়ান শুনেছি 'লাইফ সেভার' নিয়ে সর্বদা সঙ্গমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

"ঠিকই শুনেছো।" উত্তর দিই, কিন্তু সিনিয়র পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ পরদিন ঘোষণা করেছেন—আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাই নি।"

"যার যেমন নিয়তি", আমার সাধ্বী পিসিমা মন্তব্য করে, "ছেলেটির নিয়তি ছিল পূর্ণকুম্ভে প্রয়াগে স্নান করে মোক্ষলাভ করবে, তাই করেছে। ছেলেটা ভাগ্যবান।"

বুঝতে পারছি এমন মোক্ষলাভ করতে পিসিমারও আপত্তি নেই। তবু চুপ করে থাকি।

বাস এগিয়ে চলেছে। তবে তার গতিবেগ কমেছে।' কারণ পথের ভিড় বেড়েছে। তা ক্রমেই বাড়ছে। ভিড় দেখে মনে হচ্ছে এলাহাবাদ আর দূরে নয়।

জীবনে বহুবার আমি এলাহাবাদ হয়ে যাওয়া-আসা করেছি। বার কয়েক নেমেছিও সেখানে। কিন্তু কখনও এই পথকে এত দীর্ঘ মনে হয় নি। কারণ প্রতিবারেই মেল বা একস্প্রেস ট্রেনের সওয়ার হয়ে এসেছি। দেখতে-দেখতে পথ ফুরিয়ে গিয়েছে। রেলে সেই তেরো ঘণ্টার পথ আসতে আমাদের ইতিমধ্যে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। এখন সন্ধ্যে সাতটা।

আমাদের অস্থিরতা বুঝতে পেরেই বোধকরি ফকিরবাবু ভরসা দেন, "আশা করছি আর আধঘণ্টার মধ্যে আমরা এলাহাবাদ শহরে ঢুকতে পারব, ফাফামউ আসছে।" একটু থেমে তিনি আবার বলেন, "ফাফামউ এলাহাবাদের উত্তর-পূর্বদিকে গঙ্গার এপারে একটি ছোট শহর। কাশী থেকে আসা আমাদের এই পথটি সেখানে লখনউ থেকে আসা পথের সঙ্গে মিলিত হবে। তারপরে মিলিত পথটি গঙ্গা পেরিয়ে এলাহাবাদে প্রবেশ করবে।"

আমার ধারণা ছিল আমরা ঝুসি হয়ে বোট-ব্রীজের ওপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে সঙ্গমের পাশে পৌঁছব অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে এলাহাবাদ শহরে ঢুকব। সেদিক থেকে ঢুকলে প্রায় সোজাসুজি মেলায় চলে যেতে পারতাম, কারণ ঝুসির অপর তীরেই সঙ্গম। কিন্তু ফকিরবাবুর কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমরা উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে শহরে ঢুকছি। তার মানে পুরো শহরটা টহল মেরে মেলায় পৌঁছতে হবে। ঝুসির দিকেও মেলা বসেছে বলেই বোধকরি আমাদের বাস ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা ফাফামউ হয়ে এলাহাবাদ যাচ্ছি।

তা যাই গে! ফাফামউ আর প্রয়াগ থেকে কতই বা দূর? স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম মেলায় কি এত সহজে পৌঁছন যায়? পুণ্যপ্রয়াগের পথ কি এত সুগম? অমৃতময় পূর্ণকুম্ভ কি এতই সহজলভ্য?

## তিন

গাড়ির গতিবেগ কমে আসে। আস্তে-আস্তে বাস থেমে যায়। ঘড়ি দেখি—সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। তাহলে কি এলাহাবাদ এসে গেল ?

শঙ্করী তাড়াতাড়ি জানালা খোলে। বাইরে তাকাই। কোথায় এলাহাবাদ! চারদিকে ঘন-অন্ধকার। পথের দু'পাশেই মনে হচ্ছে গাছপালা—জঙ্গল। কাছাকাছি জনবসতির কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। এ কোথায় বাস থামল ? কেন থামল ?

থেমেছে কারণ পথ বন্ধ। সামনে সুদীর্ঘ গাড়ির সারি—বাস ট্রাক টেম্পো প্রাইভেট গাড়ি ও ট্যাক্সি…। কি ব্যাপার ?

ম্যানেজার টর্চ হাতে বাস থেকে নিচে নামছে। জনৈক সহযাত্রী জিজ্ঞেস করে, "বাস থামল কেন ?"

"চুঙ্গি দিতে হবে।" বলতে-বলতে ম্যানেজার বাস থেকে নেমে যায়।

শঙ্করী বলে, "চুঙ্গি কি ঘোষদা ?"

"টোল্-ট্যাক্স। এখানে 'পিল্গ্রিম্স্ ট্যাক্স' ও বলতে পারো।"

"তার মানে জিজিয়া কর ?"

"মুসলমান রাজত্বকাল হলে বলতে পারতে।"

"তা বটে, আমরা তো আবার গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছি। কিন্তু এটা তো মনে হচ্ছে শহরে ঢোকার দক্ষিণা। মেলায় ঢোকার সময় আবার কিছু প্রণামী দিতে হবে না ?"

"তা হবে বৈকি!"

শঙ্করী আর কিছু বলে না। আমিও চুপ করে থাকি। সময় বয়ে চলে। ভাগ্যিস শীতটা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। নইলে মশার কামড়ে অস্থির হতে হত।

ম্যানেজার ফিরে আসে। গাড়িতে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। এই স্তিমিত আলোতেও তার মুখ দেখে বুঝতে পারছি—সংবাদ শুভ নয়।

ফকিরবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কতক্ষণ লাগবে ?"

"বলা মুশকিল ন'দা! তবে আমাদের আগে একত্রিশখানি গাড়ি রয়েছে।" ম্যানেজারের কণ্ঠস্বরে হতাশা।

"একত্রিশ!" ফকিরবাবু আপন মনে বলে ওঠেন। "গাড়ি পিছু পাঁচ মিনিট করে লাগলেও যে এখানে অন্তত আড়াই ঘণ্টা দাঁড়াতে হবে।"

"আড়াই ঘণ্টা!"

"এই শীতে এইভাবে বাস-এ বসে থাকতে হবে!"

"ঠাণ্ডায় জমে যাবো যে!"

সহযাত্রীরা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন। ফকিরবাবু বলেন, "ট্যাক্স না দিয়ে তো এলাহাবাদে ঢোকা যাবে না। কষ্ট হলেও বসে থাকতে হবে। তবে ঠাণ্ডায় যাতে জমে না যান, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেখি গরম চা পাওয়া যায় কিনা।" তিনি নিজেই উঠে দাঁড়ান। ম্যানেজার এবং একজন সহকারী দুটি কেট্‌লি নিয়ে ফকিরবাবুর অনুগামী হয়।

কিছুক্ষণ বাদে চা এলো—গরম চা। কিন্তু ফকিরবাবু ফিরে এলেন না। চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করি, "ফকিরবাবু কোথায় গেলেন?"

"আমাদের আরও তিনখানি বাস লাইনে রয়েছে। ন'দা তাদের একটু খোঁজখবর নিচ্ছেন।"

"খোঁজখবর করছেন, না সুপার ডি-লাক্সে ঢুকে শরীর গরম করছেন?" জনৈক উগ্রপন্থী বলে ওঠেন। তাঁর সঙ্গীরা অট্টহাসি দিয়ে তাঁকে সমর্থন করেন। ফকিরবাবু গাড়ি থেকে নেমে যেতেই ওঁরা আবার সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

ম্যানেজার কোন প্রতিবাদ করে না, নীরবে চা পরিবেশন শেষ করে নিজের জায়গায় বসে। একটু বাদে দীপ্তি উঠে দাঁড়ায়। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে আমার কাছে। পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় কানে কানে বলে, "ন'দা টোল-অফিসে রয়েছেন। আমাদের বাসগুলো যাতে আগে ছেড়ে দেয়, তার চেষ্টা করছেন।"

বলা বাহুল্য ফকিরবাবুর চেষ্টা আংশিক সফল হয়। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ট্যাক্সের ঝামেলা মিটে যায়। অনেক গাড়িকে পেছনে ফেলে আমরা এগিয়ে আসি ফাফামউ পুলের ওপরে। তাহলেও রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। এই দেড়ঘণ্টা বাস-এ বসে থাকতে খুবই কষ্ট হয়েছে।

পুলটি প্রশস্ত নয় তেমন, তবে দোতলা—নিচে মোটর ওপরে রেল চলাচলের পথ। বাস ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে। আমরা এলাহাবাদ শহরে প্রবেশ করেছি। ২৫°২৬′ উত্তর অক্ষরেখা ও ৮১°৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমার অবস্থিত এই মহানগরী। উচ্চতা সমুদ্র-সমতা থেকে ১০৩৬৩ মিটার।

সুপ্রাচীন জনপদ এলাহাবাদ। প্রাচীন নাম প্রয়াগ ও ত্রিবেণী। আর্যদের

প্রাচীনতম পুণ্যগ্রন্থ ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে রামায়ণ ও মহাভারত সহ বিভিন্ন পুরাণে এই পুণ্যভূমির উল্লেখ রয়েছে। পিতামহ ব্রহ্মার যজ্ঞস্থান এই পবিত্রক্ষেত্র। তাই পুষ্করের মতো প্রয়াগেরও তীর্থরাজ নামে খ্যাতি আছে। অনেকে বলেন—ভারতের তাবৎ তীর্থকে দাঁড়িপাল্লার একদিকে রেখে অন্যদিকে প্রয়াগকে রাখলে নাকি প্রয়াগের দিকটাই বেশি ভারী হয়ে যাবে। আর তাই প্রয়াগ তীর্থরাজ।

গৌতমবুদ্ধের আমলে প্রয়াগ ছিল বৎসদেশে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে স্বয়ং বুদ্ধদেব এখানে ধর্মপ্রচার করেছেন। এখানেই তিনি তর্কযুদ্ধে জৈনদের পরাস্ত করেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১-২৯৭) প্রয়াগ একটি প্রধান নগরী ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক এই নগরীর অনেক উন্নতি-বিধান করেন। তিনি এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে বৌদ্ধস্তূপ ও স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ত্রিবেণীর কেল্লায় সেই অশোকস্তম্ভ আজও অক্ষত রয়েছে। অশোক প্রয়াগে এক ধর্মসম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

প্রয়াগ ছিল কুষাণ সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তিক নগরী। প্রথম সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালেও প্রয়াগ একটি প্রধান নগরী। মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (৩৭৬-৪১৪ খ্রীঃ) প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন প্রয়াগে আসেন। তিনি এই নগরীকে তৎকালীন ভারতবর্ষের এক উন্নত ও জনবহুল জনপদ রূপে অবহিত করেছেন।

সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) প্রয়াগ আরও উন্নত হয়। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ান চোয়াঙ ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে আসেন। তিনি তাঁর বিবরণে বলেছেন প্রয়াগ তখন বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বীর চেয়ে বৃহত্তর জনপদ ছিল। এখানে পঞ্চাশটির মতো হিন্দু মন্দির ও দুটি বৌদ্ধ বিহার ছিল।

যুয়ান চোয়াঙ তাঁর বিবরণে বলেছেন—দুটি নদীর মাঝখানে ছিল সেই মহানগরী। নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে চম্পকবনের মধ্যে ছিল সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ। তখন অবশ্য প্রধান স্তূপটি মাটিতে বসে গিয়েছিল। তবু তার দেওয়ালগুলো প্রায় একশ' ফুট উঁচু। প্রধান স্তূপটির পাশে ছিল আরেকটি স্তূপ। তখনও সেখানে ভগবান বুদ্ধের চুল ও নখ সংরক্ষিত ছিল।

এলাহাবাদের আরেক নাম ত্রিবেণী। ত্রিবেণী মানে তিনটি জলপ্রবাহ তথা নদীর মিলনস্থল। সুদূর অতীত থেকে বলা হয়ে আসছে ত্রিবেণী গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম। গঙ্গা ও যমুনা দৃশ্যমানা কিন্তু সরস্বতী লুপ্তা। কবে লুপ্ত হয়েছে, তা কিন্তু কেউ জানেন না। এমন কি ঋগ্বেদে পর্যন্ত সরস্বতীর অস্তিত্ব

সম্পর্কে কোনো কথা নেই। রঘুবংশে মহাকবি কালিদাসও কেবল গঙ্গা ও যমুনার কথা বলেছেন। তবু আমরা বলছি সরস্বতী ছিল এবং এখনও লুপ্ত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে আর তাই এলাহাবাদ কেবল প্রয়াগ নয়, ত্রিবেণীও বটে।

এলাহাবাদ বৈদিক যুগের নগরী, কিন্তু এলাহাবাদ নামটি নূতন—ইংরেজ আমলের। কথিত আছে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর এখানে আসেন। প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝতে পারেন, প্রতিরক্ষার দিক থেকে এলাহাবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এখানে দুর্গ তৈরি করেন এবং ত্রিবেণীর পরিবর্তে এই নগরীর নাম রাখেন ইলাহাবাস ( Ilahabas )। তিনি আরবী ও সংস্কৃত মিশিয়ে এই নামকরণ করেছেন। যার অর্থ করলে দাঁড়ায়—আল্লার আলয় ( Abode of God )। পরবর্তীকালে ইলাহাবাস ইলাহাবাদ হয়েছে আর ইংরেজরা ইলাহাবাদকে এলাহাবাদ করেছেন।

এবারে বর্তমানের কথা ভাবা যাক। জনসংখ্যা ও আয়তনের বিচারে এলাহাবাদ এখন উত্তর প্রদেশের পঞ্চম নগরী—লখনউ, বারাণসী, কানপুর ও আগ্রার পরেই এলাহাবাদের স্থান। এলাহাবাদ শহরটি দুটি অংশে বিভক্ত—পৌর এলাকা ও ক্যান্টনমেন্ট। আয়তন যথাক্রমে ৬২·৯৪ ও ১৮·৩১ বর্গ-কিলোমিটার, জনসংখ্যা ৪,৬০,৬২২ ও ২০,৫৯১ জন। বলা বাহুল্য এটি ১৯৭১ সালের হিসেব এবং এখন বেশ কিছু বেড়ে গিয়েছে। আর আজ? আজ এই মুহূর্তে এলাহাবাদের জনসংখ্যা অন্তত এক কোটি।

হ্যাঁ, এবারে আজকের কথাতেই আসা যাক। এলাহাবাদ আজও পুণ্য-প্রয়াগ, সে পূর্ণকুম্ভের পুণ্যক্ষেত্র। সেই প্রয়াগের পথ দিয়ে এখন আমাদের বাস চলেছে।

তার মানে ক্লান্তিকর বাসযাত্রার যতি আসন্ন। আটত্রিশ ঘণ্টায় ৮০৬ কিলোমিটার পথ এসেছি। আর মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। আমরা পুলকিত!

কিন্তু ফাফামউ পুল পার হবার পরেও গাড়ির গতিবেগ তেমন বাড়ল না। অথচ এটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। পথটি বেশ প্রশস্ত। তাহলেও ড্রাইভার কি করবে? গাড়ির সংখ্যা যে সীমাহীন! সবাই মেলায় চলেছেন—কুম্ভমেলা।

এলাহাবাদে দুটি সেনানিবাস। একটি এখানে, শহরের এই উত্তরাংশ মামফোর্ডগঞ্জে, আরেকটি দক্ষিণে—সঙ্গমে। সেটিই আকবর নির্মিত সেকালের দুর্গ, এটি একালের।

প্রশস্ত পথ দিয়ে আমাদের বাস ধীরে-ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলেছে। ফাফামউ পুলের ওপর দিয়ে আসা রেল লাইনটি বাঁদিকে প্রয়াগ স্টেশনের দিকে

চলে গেল। ওটি বারাণসী থেকে এসেছে। কিন্তু আমরা কলকাতা থেকে রেলে এলে এপথে আসতাম না। কলকাতার রেলপথ এসেছে নৈনী জংশন হয়ে যমুনা পেরিয়ে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে।

কিন্তু রেলপথের কথা থাক। বাসপথের প্রসঙ্গে আসা যাক। এলাহাবাদের পথ। এখন রাত দশটা, শীতের রাত। অথচ পথের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে সবে সন্ধ্যে হল। দোকান-পাট সব খোলা, বাড়িতে-বাড়িতে আলো জলছে।

পথে শুধু গাড়ি নয়, অসংখ্য পথচারী। জোয়ারের জলের মতো চতুর্দিক থেকে প্রতিমুহূর্তে পুণ্যার্থীদের প্রবাহ এসে এই ঐতিহাসিক মহানগরীর ওপর আছাড় খেয়ে পড়ছে। তাঁরা আসছেন রেলে, নৌকোয় ও বিমানে। আসছেন বাস টেম্পো ও ট্রাকে, গোরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি ও রিক্সায়, মোটরে সাইকেলে এবং পায়ে হেঁটে।

এলাহাবাদ এখন খুদে-ভারতবর্ষ। ইংরেজী করলে দাঁড়ায়—'Epitome of India', ভারতের সংক্ষিপ্তসার। সব রাজ্যের সর্বশ্রেণীর মানুষ এসেছেন। তাঁদের ভাষা ভিন্ন, পোশাক ভিন্ন, আচরণ ভিন্ন কিন্তু উদ্দেশ্য অভিন্ন। সবাই এসেছেন মৌনী অমাবস্যার পুণ্যপ্রভাতে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে স্নান করে অমৃতলাভ করতে। ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল—সবার জন্যই এই স্নান, এই মেলা। ইতিহাসের ধর্মমেলা আর সে ধর্ম মহামানবের, মহামিলনের। এ মেলায় জাত-পাত পয়সা ও পাণ্ডিত্যের বিচার নেই। সবার সমান অধিকার এই মেলায়: এই পুণ্যস্নানের, এই অমৃতলাভের। আমরাও এসেছি। আমরাও চলেছি—আমরা ভাগ্যবান।

রাস্তার মোড়ে-মোড়ে বাঁশি হাতে পদাতিক পুলিশ আর ওয়াকি টকি কিংবা পোর্টেবল অ্যামপ্লিফায়ার নিয়ে অশ্বারোহী পুলিশ। তাদের নির্দেশে আমাদের থামতে-থামতে চলতে হচ্ছে। বড়-বড় মোড়ের মাথায় মঞ্চ তৈরি করে মাইক লাগানো হয়েছে। অফিসাররা মাইকে নির্দেশ দিচ্ছেন। মাইক নীরব হলেই বাঁশি বেজে উঠছে। একবার দু'বার নয়, অসংখ্যবার। কোনটি থামবার নির্দেশ, কোনটি বা চলবার। কোনটি বাঁয়ে, কোনটি ডাইনে আবার কোনটি বা সামনে যাবার আদেশ।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে শ্রীরাধা যমুনায় যেতেন। পুলিশের বাঁশি শুনতে-শুনতে আমরা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে চলেছি। রাধারাণীর পায়ের নূপুর বাজত আর আমাদের গাড়ির হর্ন বাজছে।

এর আগে বার কয়েক এলাহাবাদ এলেও এই শহরের পথ-ঘাট সম্পর্কে

আমার ধারণা খুবই অস্পষ্ট। আমি পর্যটকদের মতো এলাহাবাদে এসেছি, রিক্সা কিংবা টাঙ্গায় করে দর্শনীয় স্থানগুলো দেখেছি। দেখেছি—শিবকুঠি, ভরদ্বাজ আশ্রম, আনন্দ ভবন, নাগবাসু মন্দির, মিউজিয়াম, কেল্লা ও সঙ্গম এবং খসরু-বাগ। কেবল মনে আছে শিবকুঠি শহরের উত্তর-পূর্বে আর খসরুবাগ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে। আনন্দভবন ও ভরদ্বাজ আশ্রম মাঝামাঝি জায়গায়—শহরের সমৃদ্ধ অঞ্চলে।

এটি মতিলাল নেহেরু রোড। আমরা আনন্দভবনের সামনে দিয়ে পথ চলেছি। ভারতের দু'জন প্রধানমন্ত্রী এই বাড়িতে বড় হয়েছেন।

আমাদের ডাইনে, পথ থেকে খানিকটা দূরে ভরদ্বাজ আশ্রম। ওদিকটা বেশ উঁচু, নাম কাটরা। পথের বাঁদিকটা নিচু। বাঁদিকের সেই নিচু জমিতেই গড়ে উঠেছে টেগোর টাউন—আধুনিক জনপদ।

কয়েকবছর আগে ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহেশানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আমি একদিন এই ভরদ্বাজ আশ্রম দেখতে এসেছিলাম। কথায়-কথায় সেদিন মহেশানন্দজী আমাকে বলেছিলেন…।

কিন্তু মহেশানন্দজীর কথা ভাবার আগে আমাকে রামায়ণের কথা স্মরণ করতে হবে।

রামায়ণে আমরা প্রয়াগের বিস্তৃত বর্ণনা পাই। অযোধ্যাকাণ্ডে এই বর্ণনা রয়েছে। বনবাসের সময় শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে প্রয়াগে অবস্থিত ভরদ্বাজ আশ্রমে এসেছিলেন। ভরদ্বাজ আশ্রম কেবল মুনি-নিবাস ছিল না। মহামুনি ভরদ্বাজ ছিলেন সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। তাঁর আশ্রম ছিল অবৈতনিক বিদ্যালয়। দশ হাজার ছাত্র সেখানে থেকে নানা বিষয়ে অধ্যয়ন করতেন। কাজেই ভরদ্বাজ আশ্রম সেকালের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়।

অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে রাম-লক্ষ্মণ রমণীয় তমসাতীরের বিজন অরণ্যে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করেন। দ্বিতীয় রাত্রিবাস করেন গঙ্গার তীরে শৃঙ্গবেরপুরে—প্রিয়সখা নিষাদরাজ গুহকের দেশে। পরদিন সকালে গুহক নৌকোয় করে তাঁদের গঙ্গা পার করে দিলেন। আর সারথি সুমন্ত্র সেখান থেকেই রথ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। শুরু হলো পদযাত্রা। লক্ষ্মণ আগে-আগে পথ চলেন, তাঁর পেছনে সীতা। আর শেষে রামচন্দ্র।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা শস্যসমৃদ্ধ বৎসদেশে পৌছলেন। নিকটবর্তী বনে তাঁদের বনবাসের তৃতীয় রাত্রি অতিবাহিত হলো। তারপরে রামায়ণের ভাষায়*—

* 'বাল্মীকি রামায়ণ : সারানুবাদ।'—রাজশেখর বসু।

'পরদিন সূর্যোদয় হ'লে তাঁরা গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে দিবাবসান হ'ল। রাম বললেন, সৌমিত্রী, দেখ, প্রয়াগের কাছে ধূম উত্থিত হচ্ছে, বোধহয় ওখানে কোনও মুনি বাস করেন। আমরা নিশ্চয় গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থলে পৌঁছেছি, কারণ জলের ঘর্ষণের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'কিছুদূর যাবার পর তাঁরা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। শিষ্য পরিবৃত ভরদ্বাজকে প্রণাম ক'রে রাম নিজের পরিচয় দিলেন। ভরদ্বাজ তাঁদের স্বাগত জানিয়ে অর্ঘ্য বৃষ, জল ও বন্য ফলমূল প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য দিয়ে বললেন, কাকুৎস্থ, বহুদিন পরে তোমাকে এখানে দেখছি। তোমার নির্বাসনের কারণ আমি শুনেছি। দুই মহানদীর এই সঙ্গমস্থান অতি নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এখানে সুখে বাস কর। রাম উত্তর দিলেন, ভগবান, পৌর ও জানপদগণ এই আশ্রমের নিকটেই বাস করে, তারা বৈদেহী আর আমাকে দেখতে আসবে, সে কারণে এখানে থাকতে ইচ্ছা করি না। কোনও নির্জন স্থান ব'লে দিন যেখানে সীতা সুখে বাস করতে পারেন।

মহামুনি ভরদ্বাজ বললেন, বৎস, এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে গন্ধমাদনসদৃশ এক পর্বত আছে। সেখানে অনেক গোলাঙ্গুল (কৃষ্ণমুখ বানর বিশেষ), বানর ও ভল্লুক বাস করে। সেই পর্বতের শৃঙ্গ দেখলে কল্যাণ ও মোহমুক্তি হয়। সেখানে বহু ঋষি শতবর্ষ তপস্যা ক'রে স্বর্গে গেছেন। আমার মনে হয় চিত্রকূটে তুমি সুখে বাস করতে পারবে। অথবা তুমি আমার সঙ্গেই এখানে বাস কর।

'ভরদ্বাজের আশ্রমে রাত্রিযাপন ক'রে রাম চিত্রকূট যাবার ইচ্ছা জানালেন। পুত্রের যাত্রাকালে পিতা যেমন করেন সেইরূপ স্বস্ত্যয়ন ক'রে ভরদ্বাজ রামকে বললেন, তুমি সঙ্গমস্থান থেকে যমুনার পশ্চিমে স্রোতের বিপরীত দিকে যাত্রা ক'রে এক তীর্থে উপস্থিত হবে, সেখানে ভেলার দ্বারা নদী পার হবে। ·· চিত্রকূটের এই সুগম পথে আমি বহুবার গেছি।

'ভরদ্বাজকে অভিবাদন ক'রে তাঁর নির্দিষ্ট পথে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ যাত্রা করলেন···'

—এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, আমাকে মহেশানন্দজী সেদিন বলেছেন,— "ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। তার মানে রামায়ণের যুগে এখানেই ছিল সঙ্গম। সম্ভবত সামনের ঐ নিচু জমির ওপর দিয়েই নদী বয়ে যেতো। আর আজ এখান থেকে সঙ্গম প্রায় চার মাইল। অর্থাৎ ইতিমধ্যে গঙ্গা-যমুনা গতিপথ পরিবর্তন করেছে এবং সঙ্গম চার মাইল

দক্ষিণ-পূর্বে সরে গিয়েছে।”

ভরদ্বাজ আশ্রম ছাড়িয়ে আমাদের বাস মতিলাল নেহরু মার্গ ধরেই এগিয়ে এসেছে। আমরা মহাত্মা গান্ধী মার্গের সঙ্গমে উপস্থিত হলাম। এখানেই বিপরীত দিক থেকে কুলভাস্কর রোড এসে মিলিত হয়েছে। বাস বাঁয়ে বাঁক নিল। মহাত্মা গান্ধী মার্গ ধরে এগিয়ে চলল। বেশ উঁচু ও চওড়া পথ।

পুনরায় বংশীধ্বনি। পুলিশ পথ আটকে দাঁড়িয়ে উচ্চগ্রামে বাঁশি বাজাচ্ছে। অতএব বাস থামাতে হলো।

এ-পথে দেখছি পুলিশী ব্যবস্থা আরও জোরদার। অকারণে নয়। সঙ্গম আর খুব দূরে নয় এবং এই পথটা সোজা সঙ্গমে গিয়েছে।

এ-বাঁশি কিন্তু সে-বাঁশি নয়। সে-বাঁশির সুরে চলার গতি যেত বাড়ে আর এ-বাঁশির শব্দ শুনে আমাদের গাড়ি থামাতে হয়েছে। তারপরেই পাশের পুলিশমঞ্চ থেকে যে সংবাদ ভেসে এলো, তাকে দুঃসংবাদ বলাই উচিত হবে। মাইকে আমাদের বলছে—বাস আর আগে যেতে পারবে না, এখানেও দাঁড়াতে পারবে না। ডানদিকে কে পি. কলেজের মাঠ। বাস ঐ মাঠে নিয়ে যান। ওখানেই বাস থাকবে। ফেরার সময় এখান থেকে বাস নিয়ে যাবেন।

মেলা এখান থেকে অন্তত মাইল তিনেক। রাত সাড়ে দশটা। এত রাতে এই শীতে তিন মাইল পথ হেঁটে যাওয়া! আমার অধিকাংশ সহযাত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

ফকিরবাবু উঠে দাঁড়ান। তিনি শান্তস্বরে বলেন, “আপনারা কেউ বাস থেকে নামবেন না। স্পেশাল পারমিট নিয়ে এখানে আমাদের লোক থাকবার কথা। আমরা মেলাতেই বাস নিয়ে যাবো।” তিনি নেমে যান বাস থেকে। ম্যানেজার তাঁর সঙ্গী হয়।

শুধু আমাদের জন্য নয়, ছাদ বোঝাই মালপত্র। এখানে কুলি কিংবা অন্য কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই।

ফকিরবাবু মঞ্চে সমাসীন পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলছেন। আমরা চুপচাপ বসে আছি আর আশা করছি—তিনি নিশ্চয়ই ‘ম্যানেজ’ করতে পারবেন।

সে আশা বিফল হলো। মঞ্চ থেকে আবার মাইক গর্জে উঠল। আমাদের গাড়ির নম্বর উল্লেখ করে তিরস্কারের স্বরে ড্রাইভারকে বলা হচ্ছে—তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? ডানদিকের ঐ মাঠে গাড়ি নিয়ে যাও। জলদি করো!

জন-দুয়েক পুলিশ বাঁশি বাজাতে-বাজাতে ছুটে আসছে আমাদের গাড়ির

কাছে। ফকিরবাবু অসহায় দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেন।

ডানদিকে পথের পাশে খানিকটা নিচে দেওয়াল-ঘেরা মস্ত বড় খেলার মাঠ। দেওয়াল ভেঙে মাটি ফেলে মাঠে নামার পথ তৈরি করা হয়েছে। মাঠে হাজার-হাজার বাস ট্রাক ও টেম্পো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের বাসও নামিয়ে আনা হলো। ড্রাইভার সুবিধামত জায়গা দেখে গাড়ি পার্ক করলেন।

ফকিরবাবু গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটে এসেছেন এতক্ষণ। এবারে গাড়ি থামতেই তিনি উঠে এলেন। বললেন, "আপনারা দয়া করে নামবেন না, গাড়িতে বসে থাকুন।"

"কতক্ষণ? সারারাত?" কয়েকজন সহযাত্রী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

ফকিরবাবু সবিনয়ে বলেন, "আজ্ঞে না, সামান্য কিছুক্ষণ। আমাদের স্পেশাল পারমিট আছে। মিসেস মণ্ডল ও গোরাদার এখানে থাকার কথা, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বলেই আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে।"

"আপনার গোরাদা এখন মেলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।"

"না, না, তিনি সে রকম লোক নন। একটু আগেও ছিলেন। আগের তিনখানি বাস মেলায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"আর আমাদের বেলাতেই ভদ্রলোক হাওয়া, যা বাব্বা!"

"আজ্ঞে না, তিনি এখানেই কোথাও আছেন। আপনারা একটু বসুন, আমরা তাঁকে খুঁজে বের করছি। বাস থেকে নামবেন না। এখানে যা অবস্থা তাতে গাড়ি হারিয়ে ফেলবেন।"

অতএব অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকি। বাস-এর দরজা-জানালা সবই বন্ধ, তবু শীত লাগছে।

"ওখানে ট্যাক্স দেবার জন্য দেড়ঘণ্টা বসে থাকতে হয়েছে, এখানে কতক্ষণ?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

সেজদি উত্তর দেন, "যতক্ষণ না মিসেস মণ্ডল অর্থাৎ হেনাদি কিংবা গোরাদাকে পাওয়া যায়।"

সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ফাফামউ অর্থাৎ এলাহাবাদের উপকণ্ঠে এসেছি। এই ছ-সাত কিলোমিটার আসতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগেছে। এখান থেকে মেলা আরও পাঁচ-ছয় কিলোমিটার। বুঝতে পারছি না, কখন পৌছুতে পারব!

"গোরাদাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।" নিচের থেকে ম্যানেজারের গলা ভেসে আসে। ম্যানেজার নয়, দেবদূত।

"কোথায়?" সমস্বরে বলে উঠি।

"ঐ তো ন'দার সঙ্গে আসছেন।"

তাকিয়ে দেখি সত্যি তাই। মাথায় টুপি, গায়ে ওভার কোট। তিনি গটগট্ করে ফকিরবাবুর সঙ্গে এদিকে আসছেন। কিন্তু ওদের সঙ্গে আবার বাঁশি হাতে পুলিশ কেন? ঐ বাঁশি শুনলেই যে বুক কেঁপে ওঠে।

না, এ-বাঁশি সে-বাঁশি নয়। পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি স্টার্ট করতে বলে, বাঁশি বাজিয়ে পথ পরিষ্কার করে, বাঁশি বাজাতে-বাজাতে আমাদের বাস তুলে নিয়ে আসে পথে—সেই মহাত্মা গান্ধী মার্গে। এই পথ সোজা সঙ্গমে গিয়েছে।

পুলিশটির সঙ্গে করমর্দন করেন গোরাদা ও ফকিরবাবু। তারপর তাঁরা উঠে আসেন গাড়িতে। কে. পি. কলেজ পড়ে থাকে পেছনে, বাস এগিয়ে চলে ত্রিবেণী তীর্থের দিকে।

দাদু চিৎকার করে ওঠেন, "গঙ্গা-যমুনা মাঈ কি · "

"জয়!" আমরা সমস্বরে সাড়া দিই।

কানাই বলে ওঠে, "বল, গোরাদা কি···"

"জয়!"

গোরাদা আমার পূর্ব-পরিচিত। পুরো নাম গোরা মিত্র। ভবানীপুরের এক বনেদী পরিবারের ছেলে। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছেন। অবিবাহিত এবং ধার্মিক মানুষ। মাঝে মাঝেই তীর্থদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। এর আগে দুটি পূর্ণকুম্ভে যোগদান করেছেন। গোরাদা প্রায় প্রতিবার আসা-যাওয়ার পথে কাশীতে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে কিছুদিন কাটিয়ে আসেন। মা তাঁকে খুবই স্নেহ করেন।

গোরাদা ফকিরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই তাঁকে সাহায্য করতে তিনি কয়েক-দিন আগে এলাহাবাদে এসেছেন।

জয়ধ্বনি শান্ত হবার পরে গোরাদা বলেন, "আপনাদের একটু কষ্ট হলো, আমি দুঃখিত।"

হাসতে হাসতে বলি, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন গোরাদা?"

"আর বলেন কেন?" তিনি উত্তর দেন, "আমি আর হেনা তো পারমিট নিয়ে সেই দুপুর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। প্রতি মুহূর্তে আপনাদের আশা করছি। প্রচণ্ড শীত, তবু এক কাপ চা খেতে যেতে ভরসা পাই নি। যাই হোক্, একে একে তিনখানি বাস এলো। হেনার সঙ্গে তাদের মেলায় পাঠিয়ে দিলাম। শুনলাম আপনাদের দেরি হবে। ভাবলাম এই ফাঁকে এক কাপ চা

খেয়ে আসি। আর তখুনি আপনারা এসে হাজির। আমার জন্য আপনাদের কষ্ট করতে হলো।"

তবু আমরা বলব, "গোরাদা কি..."

"জয়!"

আবার হাস্যরোল।

হাসি থামলে বলি, "কিন্তু আপনি যে 'ডিউটি' শেষ করে আমাদের সঙ্গে মেলায় চললেন, এখনও তো আরেকখানি বাস বাকি আছে!"

"আমি থাকতে চেয়েছিলাম," গোরাদা বলেন, "কিন্তু ফকির বলল, এই ঠাণ্ডায় আর সে আমাকে এখানে দাঁড়াতে দেবে না। সে ক্যাম্প্ থেকে অন্য লোক পাঠাবে। তাছাড়া সে বাস তো আজ সকালেও বুদ্ধগয়ায় পৌঁছয় নি, তার অনেক দেরি হবে।"

বাস এগিয়ে চলেছে। পথে বাস ট্রাক ও টেম্পো না থাকায়, আমরা একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারছি। তাই বলে পথ ফাঁকা নয়। প্রাইভেট মোটর ও প্রচুর সরকারী গাড়ি যাওয়া-আসা করছে। আর যাচ্ছে মানুষ। পথের দুপাশেই নিদ্রাহীন মানুষের বিরামবিহীন শোভাযাত্রা। সবাই চলেছেন মেলায় —কুম্ভমেলায়। হর্ন দিতে দিতে সেই অগুনতি মানুষের ভিড় ঠেলে আমরা এগিয়ে চলেছি।

"শঙ্কুবাবু! বাঁদিকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এটাই তুলারাম বাগ।"

গোরাদার ডাক শুনে তাড়াতাড়ি বাঁদিকে তাকাই। তিনি ঠিকই বলেছেন। ভারত সেবাশ্রমের সামনে দিয়েই বাস চলেছে। কিন্তু সেবাশ্রমের একি অবস্থা! এখানেও দেখছি মেলা বসেছে। সমস্ত বাগান জুড়ে তাঁবু। লোকে লোকারণ্য।

গোরাদা আবার বলেন, "মেলার শুরু থেকেই এখানে ভিড় চলেছে। আশ্রমে দৈনিক হাজার ছ'য়েক লোকের রান্না হচ্ছে, আর মেলায় হাজার চারেক। তার মধ্যে অবশ্য দু'হাজার স্বেচ্ছাসেবক।"

"মহেশানন্দজী এখানে আছেন?" জিজ্ঞেস করি।

গোরাদা উত্তর দেন, "আছেন বৈকি! এসময় এখানকার সন্ন্যাসীরা কি কোথাও যেতে পারেন? তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংঘের স্বামীজীরা এখানে এসেছেন। মহেশানন্দজীর সঙ্গে আপনার কালই দেখা হবে, তিনি মেলাতে রয়েছেন। ত্রিলোচানন্দজী আশ্রমে আছেন।"

ছাড়িয়ে এসেছি ভারত সেবাশ্রম সংঘ। এইমাত্র জি টি রোড অতিক্রম করে এলাম। এসে পৌঁছলাম মহাত্মা গান্ধী মার্গ ও জওহরলাল নেহেরু মার্গের

সঙ্গমে—কুম্ভদ্বারের সামনে। সুবিশাল তোরণ।

কিন্তু তোরণ নয়, আমরা দেখছি মেলা—কুম্ভমেলা। আলোর মেলা। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু আলো আর আলো—দিগন্তজোড়া দেওয়ালি।

চল্লিশ ঘণ্টা বাস ভ্রমণের সকল ক্লান্তি এক মুহূর্তে মুছে গেল। এমন অপরূপ দৃশ্য দেখার জন্য আরও চল্লিশ ঘণ্টা বাস-এ চড়তে রাজী আছি।

গেটের সামনে বাস থেমেছে। বোধহয় পারমিট দেখাতে হবে। মেলায় প্রবেশ করার জন্য দক্ষিণা দিতে হবে। তাড়াতাড়ি নেমে এলাম বাস থেকে। এই অবসরে মহামেলার মাটি স্পর্শ করা যাক। কোটি কোটি ভক্তের পদরেণু-রঞ্জিত পবিত্র-ধূলিকণাকে প্রণাম করা যাক। সেই সঙ্গে মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে এই বর্ণনাতীত বিপুল ও সুন্দরকে অবলোকন করা যাক। সর্বসত্তা দিয়ে আমি সর্বকালের বৃহত্তম মহামেলায় আমার প্রথম উপস্থিতিকে উপলব্ধি করলাম।

এখানে কিন্তু অনেক গাড়ি। বাস কিংবা ট্রাক নয়, প্রাইভেট মোটর ট্যাক্সি, টাঙ্গা ইত্যাদি। জি টি রোড, জওহরলাল মার্গ ও মহাত্মা গান্ধী মার্গ এখানে একটি বিরাট ত্রিভুজ সৃষ্টি করেছে, ঠিক কুম্ভদ্বারের সামনে, সেখানেই গাড়ি থামিয়ে সবাই যাত্রী নামিয়ে দিচ্ছে। বাইরের গাড়ির জন্য এটি মোটর-স্ট্যাণ্ড ও বটে। কোন গাড়িকেই তোরণের ওপাশে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু সাইকেল আরোহীরাও ভেতরে ঢুকতে পারছে না। কিন্তু তাঁরাও সাইকেল নিয়ে মেলায় যেতে পারবেন না। তোরণের ওপাশেই সাইকেল-স্ট্যাণ্ড। এটা উত্তরপ্রদেশ। এ-রাজ্যে একটা ছোট শহরেও যে-কোন সিনেমা শো-এর আগে কয়েক শ' সাইকেল জমা হয়। তাহলে কুম্ভমেলার সাইকেল-স্ট্যাণ্ডে কত সাইকেল জমা পড়বে? না, অনুমান করতে পারছি না। তবে স্নানের শেষে সাইকেল খুঁজে পেতে আরোহীদের কী পরিমাণ হাঙ্গামা পোহাতে হবে, তা বেশ বুঝতে পারছি।

আমাদের স্পেশাল পারমিট রয়েছে। আমরা ভি. আই. পি। সাইকেল নিয়ে মেলায় যাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আমরা বাস নিয়ে যেতে পারছি। জানি না, আমার সহযাত্রীরা এজন্য কুণ্ডু ট্র্যাভেলস-এর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছেন কিনা। তবে তাঁরা সবাই বুঝতে পারছেন, পারমিট না থাকলে মাল মাথায় নিয়ে এই প্রচণ্ড শীতে তাঁদের কয়েক মাইল পথ হাঁটতে হত।

বাস কালী সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে। একটু এগিয়েই ফোর্ট রোডের সঙ্গম। ফোর্ট রোড উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। আমরা পুবে চলেছি। পুবদিকেই

বাঁধ। পুবদিকেই সঙ্গম।

পথের দুপাশে সারি সারি তাঁবু। কোনটিতে কন্ট্রাক্টারদের অফিস, কোনটিতে ডাক ও তারঘর কিংবা স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিস অথবা থানা। বেতার আর দূরদর্শন কেন্দ্রও এই পথের পাশে। মেলার এই অংশটা হচ্ছে প্যারেড-গ্রাউণ্ড। এটি দু' অংশে বিভক্ত—প্যারেড ইস্ট ও প্যারেড ওয়েস্ট্। আয়তন যথাক্রমে ৩০৬ ও ১৫৪ একর।

কালী সড়ক কিন্তু বাঁধে উঠবার অর্থাৎ মেলায় যাবার একমাত্র পথ নয়। আমরা ফোর্ট রোড ধরে আরেকটু পুবে এগিয়ে গেলেই এই রাস্তার সমান্তরাল আরেকটি রাস্তা পেতাম নাম লাল সড়ক। আরও খানিকটা এগোলে ত্রিবেণী রোড। এটি স্থায়ী রাস্তা, জি. টি. রোড থেকে বেরিয়ে মিণ্টো পার্ক হয়ে, কেল্লার পাশ দিয়ে বাঁধ পর্যন্ত এসেছে। এই রাস্তার মুখে বাঁধের নিচেই সেবারে সেই দুর্ঘটনা হয়েছিল। তখন বাঁধে উঠবার এবং বাঁধ থেকে সঙ্গমে যাবার ঐ একটাই প্রধান পথ ছিল। এখন তিনটি—কালী ও লাল সড়ক এবং ত্রিবেণী রোড।

শহর থেকে মেলায় আসবার এবং সঙ্গমে যাবার এই তিনটি প্রধান পথ হলেও, ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে আরও কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। তার কোনটি উত্তর-দক্ষিণে, কোনটি বা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত।

শুধু রাস্তা নয়, ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য এইসব রাস্তার ওপরে কয়েকটি 'ফ্লাই-ওভার' তৈরি করা হয়েছে। ফ্লাই-ওভার মানে কয়েকটি কংক্রিটের 'ওভার-ব্রিজ'। ভিড়ের সময় এগুলোর ওপর ও তলা দিয়ে যাত্রী পাঠিয়ে চাপ কমানো হবে।

কুম্ভদ্বার থেকে বাঁধ এক কিলোমিটার। বাঁধ মানে গঙ্গার বন্যা থেকে এলাহাবাদ শহরকে বাঁচাবার রক্ষা-প্রাচীর। এটি একটি উঁচু ও চওড়া পথের মতো, তাই অনেকে বাঁধ রোড বলেন। পথটি দারাগঞ্জ থেকে কেল্লা পর্যন্ত প্রসারিত। পথের পাশে পাশে কয়েকটি স্থায়ী মন্দির ও আশ্রম আছে। তার মধ্যে দক্ষিণে কেল্লার ভেতরে অক্ষয়বট ও উত্তরে শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলী আর মাঝখানে মহাবীর মন্দির সবচেয়ে জনপ্রিয়।

বাঁধ বেশ উঁচু। কিন্তু পথের ঢাল মোটেই খাড়া নয়। বাস আমাদের সবাইকে নিয়ে অনায়াসে উঠে এলো বাঁধের ওপরে। আর কুম্ভমেলার প্রকৃত রূপটি প্রত্যক্ষ হলো আমার দু'চোখে। তখন কুম্ভদ্বার থেকে মেলার যে রূপ দেখেছি, এই সীমাহীন সৌন্দর্যের তুলনায় সে কিছুই নয়। তখন একদিকে, এখন দু'দিকে। তখন মনে হয়েছে আলোর মেলা আর এখন মনে হচ্ছে আলোর

র্গ। শত কোটি নক্ষত্রের দীপ্তি তার সারা অঙ্গে। আলোর এমন অপার্থিব ব্যাপক রূপ, এর আগে আমি আর কখনও দেখি নি। আমার স্বপ্ন সার্থক হলো। আমি ধন্য হলাম।

বাঁধ থেকে বাস নেমে এলো নিচে। তার মানে আমরা সঙ্গমে এলাম। বাঁধের পর থেকে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত বালিময় প্রান্তরকে বলে সঙ্গম। বাঁধ থেকে গঙ্গা দু-কিলোমিটার। এটি কুম্ভনগরীর বৃহত্তম অংশ এবং মূল-মেলা। অংশটি তিন ভাগে বিভক্ত—সঙ্গম-উত্তর, সঙ্গম মধ্য ও সঙ্গম-দক্ষিণ। আয়তন যথাক্রমে ৩৯২, ১৪৫ ও ২০৮ একর।

কালী সড়ক ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে বাস। পথের দু'পাশে সারি সারি তাঁবু—কোনটি আশ্রম, কোনটি আখড়া, কোনটি বা যাত্রী নিবাস। বালির চর বলে পথের ওপর ঠিক মাঝখানে লোহার চওড়া পাত অর্থাৎ 'checkered plates' দিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনেছি পাঁচ কিলোমিটার এমনি লোহা-বাঁধানো পথ রয়েছে এবারের মেলায়। সব মিলিয়ে মেলায় পথের দৈর্ঘ্য ১৭৬ কিলোমিটার। লোহার পাতের ওপর দিয়ে বাস চলেছে। আর দু'পাশে মানুষের শোভাযাত্রা। কে বলবে এখন রাত সোয়া এগারোটা আর এখানে এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কয়েকজন দেখলাম স্নান করে খালি গায়ে গান গাইতে গাইতে চলেছেন।

আমরা পুবে চলেছি। বাঁধ থেকে নেমেই একটা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত পথ পেয়েছি। সেটিকে অতিক্রম করে পুবে এগিয়ে এসেছি। এবারে তেমনি আরেকটি পথের মোড়ে এলাম। এটি কুম্ভনগরের প্রশস্ততম পথ, নাম—সঙ্গম মার্গ। মেলার উত্তরতম প্রান্ত থেকে দক্ষিণে যমুনার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

গোরাদা ড্রাইভারকে বললেন, "বাঁয়ে চলুন।" অর্থাৎ এখন আমরা সঙ্গম মার্গ দিয়ে উত্তরে অগ্রসর হব। এখন গোরাদাই আমাদের 'পায়লট'।

এ রাস্তাটি কালী সড়কের চেয়ে চওড়া। এবারে আমরা উত্তরে চলেছি।

সামনে শাস্ত্রী পুল। জি. টি. রোড থেকে তৈরি শুরু হয়েছে এই পুল। মেলার ওপর দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে চলে গিয়েছে। এই পুল তৈরি হবার পরে এটাই জি. টি. রোড হয়ে যাবে—এলাহাবাদের সঙ্গে ঝুসির মিলনসেতু। এখন পুল না থাকার জন্য জি. টি. রোড অনেকটা উত্তরে এগিয়ে গঙ্গার 'বোট-ব্রিজ'-এর ওপর দিয়ে গিয়েছে। বন্যা হলে সে পথটি বন্ধ হয়ে যায়, তাছাড়া পথটিও অনেকটা ঘুরে। শাস্ত্রী পুল তৈরি হয়ে যাবার পরে যেমন পথ-সংক্ষেপ হবে, তেমনি বারোমাস জি. টি রোড চালু থাকবে।

"সামনে 'শান্তি আশ্রম' দেখা যাচ্ছে। ওখানে বাস্ থামাবেন।" গোরাদা ড্রাইভারকে বলেন।

আমরা পৌঁছে গিয়েছি। এসেছি কুম্ভমেলায়। সহযাত্রীরা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠেন—গঙ্গা-যমুনা মাঈ কি…জয়!

নেমে আসি বাস থেকে। ঘড়ি দেখি রাত সাড়ে এগারোটা। অর্থাৎ কলকাতা থেকে রওনা হবার ঠিক চল্লিশ ঘণ্টা পরে আমরা মেলায় পৌঁছলাম—পুণ্যপ্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে। পূর্ণ হলো বহুকালের বাসনা। আমি ধন্য। ধন্য আমার জীবন।

## চার

"বাবু! চা।"

ঘুম ভেঙে যায়। কাপ-প্লেটের সেই পরিচিত শব্দ। বেঙ্ক-টি এসেছে। ঘড়ি দেখি। এ যে সকাল সাতটা! তাড়াতাড়ি উঠে বসি। চায়ের কাপ হাতে নিই। প্রচণ্ড শীত। চুমুক দিতে সারা শরীরে পুলকের শিহরণ বয়ে যায়।

সহযাত্রীরাও একে একে উঠে বসেছে, চা নিচ্ছে। শীতের সকালে গরম চা অমৃত সমান।

অমৃতকুম্ভ। কুম্ভমেলায় প্রথম প্রভাত। গতকাল মধ্যরাতে আমরা মেলায় এসেছি। শান্তি আশ্রমের অনতিদূরে শাস্ত্রী পুলের প্রায় নিচে আমাদের শিবির—তাঁবুর শিবির। দু-সারিতে বিশটি তাঁবু, মাঝখানে পথ। একপ্রান্তে বাথরুম। রান্নাঘর সামনের বড় রাস্তার ওপারে। ওখানেও আমাদের কয়েকটি তাঁবু রয়েছে। ফকিরবাবু গোরাদা ও মিসেস মণ্ডল অর্থাৎ কুম্ভ ট্র্যাভেল্‌স-এর কর্তৃপক্ষ সেখানে রয়েছেন।

প্রত্যেক তাঁবুতে সাতখানি করে খাটিয়া। পাশাপাশি দুখানি তাঁবুতে আমরা রয়েছি। কাল রাতে তাঁবুতে এসে গোছগাছ করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে একটা বেজে গিয়েছে। একঘুমে রাত কাবার হয়েছে। খাটিয়ার ব্যবস্থা করায় খুব একটা শীত লাগে নি। বেশ আরামেই ঘুমিয়েছি। সকাল হতেই গরম চায়ের কাপ হাতে পেয়েছি। আমরা কুম্ভমেলার মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের অন্যতম

প্রাতঃকৃত্য সেরে তাঁবুতে ফিরে এসে দেখি ব্রেক-ফাস্ট এসে গিয়েছে।

খেয়ে নিয়ে জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে আসি দল বেঁধে। একটু এগিয়ে দেখা হয় কাকীমা, অতনু ও শ্যামলের সঙ্গে। আমাদের সারিতেই তিনখানি তাঁবুর পরে ওদের তাঁবু।

কুশল বিনিময়ের পরে এগিয়ে চলি শাস্ত্রী পুলের দিকে। সহসা কান্নাটা কানে আসে। কি ব্যাপার, এই সুখের শিবিরে আবার দুঃখ কেন? তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই সেই তাঁবুর দরজায়। জনৈকা যুবতী সহযাত্রী খাটিয়ায় শুয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। আরেকটি মেয়ে তাঁকে বলছে—তুই এমন অবুঝের মত করছিস কেন মিনতি! মাসিমা হারিয়ে যাবেন কেন? নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।

মিনতি কাঁদতে কাঁদতেই বলে—তুই তো জানিস বকুল, মা ইংরেজী জানে না, হিন্দীও বলতে পারে না। আমি ভাইকে গিয়ে কী বলব এখন!

তাঁবুর আরেকজন মহিলা ঘটনাটা বলেন। মিনতির মা ও কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা খুব সকালে স্নান করতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ভিড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে সঙ্গীরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেন। অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করেও তাঁরা তাঁকে আর খুঁজে পান নি।

খুবই বিপদের কথা। একে সুবিশাল মেলা, তার ওপরে প্রত্যেক পথে সর্বদা মানুষের মিছিল। পথ খুঁজে আস্তানায় ফিরে আসা সত্যি কষ্টকর। তবে পুলিশের সাহায্য নিলে তো তাঁর ফিরে আসা উচিত।

চিন্তিত মনে সঙ্গীদের সঙ্গে এগিয়ে চলি। পথের ধারে দেখা হয় ফকিরবাবু, গোরাদা ও মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে—মিসেস ঝরণা মণ্ডল। ঝরণাদেবী দার্জিলিঙে ফকিরবাবুর হোটেল ব্যবসার অংশীদার। তিনিই হোটেলটা দেখাশোনা করেন। এখন সেখানে বাজার মন্দা। তাই তিনি ফকিরবাবুকে সাহায্য করার জন্য এখানে চলে এসেছেন। তিনি আমার পূর্ব-পরিচিতা। সেবারে অমরনাথ যাত্রায় তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। কারণ তিনি কয়েকদিন আগে এসেছেন। আমাদের শিবির তৈরি ও রক্ষা করেছেন।*

কুশল বিনিময়ের পরে মৃদু হেসে মিসেস মণ্ডল বলেন, "দল বেঁধে বের হচ্ছেন, দেখবেন আবার হারিয়ে যাবেন না যেন!"

একটু থেমে আবার বলেন, "অবশ্যি এ যা মেলা, হারিয়ে যাবেনই। মানে হারাতেই হবে। তাই একটা কথা বলে রাখি, যে যেখানেই হারিয়ে যান, পুলিশের সাহায্য নিয়ে শান্তি আশ্রম অথবা ভারত সেবাশ্রম সংঘের সামনে

---

* লেখকের 'অমরতীর্থ-অমরনাথ' দ্রষ্টব্য।

চলে আসবেন। সেখানে আমাদের লোক রয়েছে, তারা আপনাদের শিবিরে পৌঁছে দেবে।”

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি। তাঁবুর ফাঁকে ফাঁকে পথ। কোথাও সোজা, কোথাও আঁকাবাঁকা। আমরা শাস্ত্রী পুলের তলা দিয়ে দক্ষিণে চলেছি।

পুল ছাড়িয়েই পথের পাশে একটি তাঁবুর দিকে নজর পড়ে। সামনে ধুনি জ্বলছে। একজন সুপুরুষ যুবা সন্ন্যাসী ধুনির ধারে বসে আছেন। তাঁর পাশে নামাবলীর গাউন পরা জনৈক সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী শ্বেতাঙ্গিনী। দুজনেই চোখ বুজে বসে আছেন। বোধহয় ধ্যান করছেন। দু-জন সেবক সর্বদা পথের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। মাঝে মাঝে বলছেন—মহারাজকে দর্শন করুন, দান দিন, মনোবাসনা পূর্ণ হবে। দর্শন হলে নিজের পথে এগিয়ে চলুন। অযথা ভিড় বাড়াবেন না।

আমরা তাঁদের নির্দেশ পালন করি। অযথা ভিড় না বাড়িয়ে এগিয়ে চলি। তবে দর্শন করেও দর্শনী দিই না।

পথের দু'পাশেই তাঁবুর সারি। কোনটি ভক্তদের, কোনটি সাধুদের, কোনটি কল্পবাসীদের, কোনটি বা যাত্রীদের। কোনটি আশ্রম, কোনটি আখড়া! কোথাও কীর্তন হচ্ছে কোথাও পূজা-পাঠ, কোথাও বা মাইক চলেছে। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, ইহলোককে বিস্মৃত হয়ে এঁরা পরলোকের ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন।

প্রতি পথে পথচারীদের শোভাযাত্রা। কেউ যাচ্ছেন, কেউ আসছেন। কেউ এইমাত্র মেলায় পৌঁছে আশ্রয়ের সন্ধান করছেন, কেউ স্নান সেরে ফিরছেন। কেউ দর্শনে বেরিয়েছেন, কেউ বা মেলা দেখতে। ভিন্ন তাঁদের ভাষা, ভিন্ন তাঁদের পোশাক। তবু এঁদের মাঝে এক অভিন্ন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করছি। দেখতে পাচ্ছি বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের এক নিবিড় বন্ধন। সত্যই বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি ছিল সেকালের ধর্মীয় নেতা ও সমাজ সংস্কারকদের। তাঁরা আধ্যাত্মিকতার যে সূত্র দিয়ে খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতের অখণ্ড-সত্তাকে বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন, তা আজও অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সেকালে না ছিল পথ, না ছিল বেতার তবু শতশত পুণ্যার্থী দুর্গম গিরিতীর্থ দর্শনে যেতেন। হাজার হাজার মানুষ সমতলের মেলায়-মেলায় সমবেত হতেন। মেলা ছিল মহামিলনের মোক্ষক্ষেত্র।

শত শত বছর কেটে গিয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষে-মানুষে ব্যবধান বেড়েছে, আমরা নানারকম সংকীর্ণতার শিকার হয়েছি। কিন্তু তীর্থ

কিংবা মেলার প্রতি আমাদের আকর্ষণ আরও বেড়েছে। হাজার লোকের মেলা আজ কোটি মানুষের মহামেলায় রূপান্তরিত। কুম্ভমেলা ভারতের জাতীয়-সংহতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। যুগ-যুগান্ত থেকে এই মহামেলা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মাঝে মিলনের বীজ বপন করে আসছে। আমি আজ সেই মেলার পথে পথে পদচারণা করছি।

আমরা কালী সড়কে এসে পৌঁছলাম। এটি কুম্ভমেলার অন্যতম প্রধান পথ। তাই পথের পাশে বাঁশ অথবা শালবল্লীর বেড়া। এই বেড়া দিতেই নাকি একহাজার বাঁশ ও দেড় হাজারের ওপর শালবল্লী লেগেছে। এপথে ভিড় আরও বেশি। শুধু মানুষ নয়, একটি হাতিও রয়েছ। শুঁড় নাড়িয়ে হেলে-দুলে পথ চলেছে। তার পিঠে কৌপীন পরা ভস্মমাখা একজন মধ্যবয়সী স্বাস্থ্যবান সন্ন্যাসী। সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য-শিষ্যা।

ভিড় ঠেলে সঙ্গম মার্গের মোড়ে আসি। ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন, "কোন-দিকে যাবি ?"

আমি উত্তর দেবার আগেই কাকু আমাকে বলে, "চল্, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে যাই। মা নাকি আজ দশটায় দর্শন দান করবেন।"

কাকু ভক্ত মানুষ, সে বলতেই পারে। কিন্তু আমাদের দলের একমাত্র আধুনিকা শঙ্করীও সেই একই কথা বলে, "তাই ভাল। চলুন মা-কে দর্শন করা যাক।"

অতএব এগিয়ে এসে মায়ের আশ্রমে প্রবেশ করি। গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়ে ডানদিকে মন্দির। অনেকটা জায়গা নিয়ে অস্থায়ী মন্দির—টিনের ছাউনি। অপরপ্রান্তে মঞ্চের ওপরে রাম-সীতার মূর্তি। পাশে আরেকটি ছোট মঞ্চ। এখন খালি পড়ে আছে। তারপর থেকে প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে সতরঞ্চি পাতা। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পোশাকের বহু নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকা বসে রয়েছে। কয়েকজন শিষ্যা মধুর স্বরে ভজন গাইছেন। ভক্তবৃন্দ সমাহিত হয়ে সেই গান শুনছেন। শুনছেন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতী। তাঁরাও শান্ত এবং সমাহিত। তাঁরা হয়তো ভাষা বুঝছেন না, কিন্তু সুরের মাহাত্ম্যটি হৃদয়ে অনুভব করছেন। ভাষা আঞ্চলিক কিন্তু সুর সর্বজনীন।

আমরাও সবার সঙ্গে বসে পড়ি। আর তখুনি ওরা এসে হাজির হলো। দুটি শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতী। সাহেবের কাঁধে দু'টি ক্যামেরা আর মেমসাহেবের হাতে একটা টেপ্-রেকর্ডার।

একটু বাদে সাহেব ছবি নিতে শুরু করলেন আর মেমসাহেব আমাদের

পাশে এসে বসে পড়লেন। সামনে থেকে দেখছি বলেই মেমসাহেব বলতে পারছি, নইলে তাঁর উচ্চতা, স্বাস্থ্য ও পোশাক কোনটাই নারীসুলভ নয়।

ভজন শেষ হয় কিন্তু নীরবতা নষ্ট হয় না। সারা মন্দির জুড়ে বিরাজ করছে এক অনির্বচনীয় নীরবতা। অথচ এখানে বেশ কিছু ছোট-ছোট ছেলে মেয়ে এসেছে তাদের বাপ-মায়ের সঙ্গে। তারাও যেন কোন এক অদৃশ্য যাদুবলে দুষ্টুমি ভুলে শান্ত ও সংযত হয়ে গিয়েছে।

কয়েক শ' মানুষ এক পরমলগ্নের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁরা মায়ের দর্শন পাবার আশায় রয়েছেন। কলির ভগবতী মা-আনন্দময়ীকে দর্শন করার জন্য আমরা আকুল হয়ে বসে রয়েছি।

মা এলেন। স্মিত হাসিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করে মা মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তাঁর গায়ে একখানি সাদা চাদর, চোখে চশমা। এখনও তাঁর কেশরাশি তেমনি কৃষ্ণকালো। মায়ের মুখে পরম প্রশান্তি, ঠোঁটে করুণার হাসি।

কেউ ছবি তুলছেন; কেউ ফুল ও মালা দিচ্ছেন। মা সানন্দে গ্রহণ করছেন সকলের সকল শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন মন্দিরের দিকে। আমরা নতমস্তকে প্রণাম করি মা-অন্নপূর্ণাকে। তারপরে মনে মনে তাঁর আশীর্বাদ কামনা করি—মা, তুমি আমাকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত কর। আমি যেন সৎ জীবন যাপন করতে পারি।

রাম-সীতার পাশে সেই মঞ্চটিতে গিয়ে মা বসে পড়লেন। তারপরে হাত তুলে আবার আমাদের আশীর্বাদ করলেন।

একটু বাদে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার এগিয়ে গেলেন মায়ের কাছে। মাকে প্রণাম করে উঠে দু'হাত জড়ো করে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তারপরে সবিনয়ে বললেন—মা! আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না, না, অসুবিধে হবে কেন? এবার তো মেলায় খুবই ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। মা প্রশান্ত স্বরে উত্তর দেন।

পুলিশ অফিসার বলেন—সব আপনার আশীর্বাদ মা!

—না, না, আমার আশীর্বাদ কেন হতে যাবে? সবই তাঁর করুণা। মা, ওপর দিকে তাকিয়ে চোখ বোজেন।

—মা!

মা পুলিশ অফিসারের দিকে তাকান। পুলিশ অফিসার আবার বলেন—মা, আপনি কৃপা করুন মা! আর চার-পাঁচটা দিন যেন বৃষ্টি না হয়।

হঠাৎ কেন যেন মায়ের মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। তিনি একটুকাল

চুপ করে রইলেন। তারপরে গম্ভীরস্বরে বললেন—সবাই মিলে তাঁকে ডাকো। তিনি করুণাময়। তাঁর কৃপা হলে, আবহাওয়া নিশ্চয়ই ভাল থাকবে।

আবার মাকে প্রণাম করে পুলিশ অফিসার খুশি মনে বিদায় নিলেন। কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মা হঠাৎ কেন গম্ভীর হয়ে গেলেন! কেন ওভাবে বললেন কথাটা? তাঁর কৃপা হলে···। তার মানে কি এই যে তাঁর কৃপা নাও হতে পারে? কিন্তু এই রৌদ্রস্নাত শীতের সকালে বৃষ্টির ভয় করা কেন? এখানে এখন বৃষ্টি হলে লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্গতির শেষ থাকবে না সত্য, তবে এই মেঘমুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে সে দুশ্চিন্তা খুবই অমূলক নয় কি?

ইতিমধ্যে একজন সাহেব-সন্ন্যাসী মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে ছোট একটি কাঠের বাক্স। কী আছে কে জানে?

বাক্সটি মায়ের পায়ের কাছে রেখে তিনি মাকে প্রণাম করলেন। মা তাঁর মাথায় একখানি হাত রাখলেন একবার। তারপরে জনৈকা সেবিকার হাতে বাক্সটি দিয়ে দিলেন। ফুল ও মালাগুলিও তাঁকে দিলেন। বললেন—সব ঠাকুরকে দিয়ে দাও। তারপরে ভজন আরম্ভ করো।

চারিদিকে ছবি তোলার ধুম পড়ে গেল। এবং ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে আমাদের সুধাংশুও একজন। সে একেবারে মায়ের সামনে গিয়ে তাঁর ছবি নিয়ে এলো।

একটু বাদে শুরু হলো ভজন, মীরার ভজন—

'মেহা বরসিয়ো করে রে,
আজ তো রমিয়ো মেরে ঘরে রে
নান্হীঁ নানহীঁ বুঁদ মেঘ ঘন বরসে,
সুখসরবর-ভরে রে॥
বহুত দিনা পৈ পীতম পায়ো,
বিছুরণকো মোহিঁ ডর রে।
মীরা কহে অতি নেহ জুড়ায়ো,
মৈঁ লিয়ো পুরবলী বর রে॥'

শুনতে ভাল লাগছে। একে মীরাবাঈয়ের ভজন, তার ওপরে সামনে স্বয়ং মা বসে আছেন। তবু উঠতে হয়। আমরা মেলা দেখতে বেরিয়েছি।

মন্দিরের বাইরে এসেই পদ্মা বলে, "গানটা ভাল লাগল, কিন্তু অর্থ তো বুঝতে পারলাম না।"

বলি, "আমিও যে সবটা বুঝতে পেরেছি তা নয়, তবে ভাবার্থ বলতে পারি।"

"তাই বলুন।" কাকী যোগ করে।

আমি বলতে থাকি, "গানটির ভাবার্থ হচ্ছে, মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরছে, আজ আমার প্রিয়তম আমার ঘরে এসেছে। মেঘ ঘন হলেও অল্প অল্প জল পড়ছে, আমার সুখসায়র পূর্ণ হয়েছে। বহুদিন বাদে আজ আমি আমার প্রিয়তমকে পেয়েছি, তাই ভয় হচ্ছে আমি বোধহয় আবার তাকে হারিয়ে ফেলব।

—মীরা বলছেন, প্রভু তুমি আমার প্রেমতৃষা নিবারণ করেছো। আজ আমি আমার পূর্বজন্মের স্বামীকে পেয়েছি।"

"গানটি খুবই সুন্দর," আমি থামতেই শঙ্করী বলে, "কিন্তু মায়ের আশ্রমে এই শীতকালে বর্ষার গান কেন?"

কথাটা আমারও মনে হয়েছে কিন্তু শঙ্করীর প্রশ্নের উত্তর জানা নেই আমার। তাই চুপ করে থাকি।

শঙ্করী আবার বলে, "মা কি জানতে পেরেছেন বৃষ্টি হবে? তাই তখন পুলিশ অফিসারকে বললেন—সবাই মিলে তাঁকে ডাকো। আর তারপরেই ভক্তদের বর্ষার গান গাইতে বললেন। কিন্তু বৃষ্টি নামলে যে লক্ষ লক্ষ যাত্রী বড়ই বিপদে পড়ে যাবে!"

শঙ্করীকে কিছু বলতে পারার আগেই কানে আসে—শুনছেন! একটু শুনুন!

পেছন থেকে কেউ কাউকে ডাকছেন। কে ডাকছেন? কাকে ডাকছেন? আমাদের কি? তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি।

একজন ভদ্রমহিলা প্রায় ছুটে আসছেন। হাত নেড়ে তিনি আমাদের থামতে বলছেন। তার পরনে সাদা জামা-কাপড়, ব্রহ্মচারিণীর বেশ।

তিনি কাছে আসেন। ভদ্রমহিলা কালো না হলেও খুব ফর্সা নন, সুশ্রী হলেও সুন্দরী নন। কিন্তু তাঁর মুখখানিতে স্বর্গীয় সুষমা আর চোখদুটিতে নক্ষত্রের দীপ্তি। মনে হচ্ছে আশ্রমবাসিনী।

ব্রহ্মচারিণী মধুর স্বরে বলেন, "কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।

—"বেশ তো, করুন।" আমি ভরসা দিই।

তিনি প্রশ্ন করেন, "আপনারা কি কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর সঙ্গে এসেছেন?"

মাথা নেড়ে উত্তর দিই,, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, গোরাবাবু বলেছেন, শম্ভু মহারাজ আপনাদের সঙ্গে মেলায় আসবেন?"

মা-আনন্দময়ীর আশ্রমে কোনো ব্রহ্মচারিণীর কাছ থেকে এমন প্রশ্ন আশা করি নি। অতএব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। চুপ করে থাকি।

কিন্তু আমি নীরব হওয়ায় ভদ্রমহিলার কোনো ক্ষতি হয় না, কারণ আমার প্রকাশক স্বয়ং সুধাংশুশেখর সশরীরে উপস্থিত এই অকুস্থলে। সে মৃদু হেসে ব্রহ্মচারিণীকে আশ্বস্ত করে, "হ্যাঁ। তিনি এসেছেন আমাদের সঙ্গে।"

"কোথায় আছেন এখন? আপনাদের ক্যাম্পে?"

"আজ্ঞে না।" সুধাংশু সহাস্যে উত্তর দেয়, "আমাদের সঙ্গে।"

"সঙ্গে…!" ব্রহ্মচারিণী বুঝি আমারই মতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে।

আত্মপ্রকাশ যখন করতেই হবে, তখন তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হওয়াই ভাল। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "আপনার পরিচয়?"

"উল্লেখ করবার মতো কিছু নয়। আমি শ্রীশ্রীমায়ের একটি মেয়ে, বাইশ বছর ধরে তাঁর কাছে রয়েছি। আপনি?"

"শঙ্কু মহারাজ!" সুধাংশু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

ভদ্রমহিলা দু'হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করেন। আমিও তাঁকে প্রতিনমস্কার করি। তারপরে বলি, "কিন্তু আশ্রমবাসিনী ব্রহ্মচারিণী হয়ে আপনি আমাকে জানলেন কেমন করে?"

"আমি যে আপনার বই পড়তে খুব ভালোবাসি। আমি আপনার 'হিমতীর্থ হিমাচল' ছাড়া সব বই পড়েছি। আর পড়ে প্রচুর আনন্দ লাভ করেছি।"

সবিনয়ে বলি, "আমার সৌভাগ্য।"

কিন্তু ব্রহ্মচারিণী কিছু বলতে পারার আগেই সুধাংশু তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "আপনি 'হিমতীর্থ-হিমাচল' পড়েন নি কেন?"

তার পক্ষে এ প্রশ্ন করা খুবই স্বাভাবিক। কারণ সে বইখানির প্রকাশক।

ব্রহ্মচারিণী উত্তর দেন, "বইখানি হাতে পাই নি।"

"ঠিক আছে, এর পরে যখন কলকাতায় যাবেন, আমাকে একটা ফোন করবেন, বইখানি পাঠিয়ে দেব আপনার বাড়িতে।" সুধাংশু তাঁকে নিজের পরিচয় দেয়।

"খুব খুশি হব।" একবার থামলেন ব্রহ্মচারিণী। তারপরে আমাকে বলেন, "আপনি মেলায় আসছেন শুনেই ভেবে রেখেছিলাম, কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স-এর ক্যাম্পে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"বেশ তো, এখানেই যখন আলাপ হয়ে গেল, তখন কথাটা বলুন।"

"প্রশ্নটা কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত।"

ঠাকুরমা পিসিমা ও কাকু সঙ্গে রয়েছে, সুধাংশুরাও বয়সে ছোট। কিন্তু ওরা নিজেরাই একটু দূরে ঠাকুরমাদের কাছে সরে যায়। আমি ব্রহ্মচারিণীকে বলি, "এবারে বলুন।"

"রাজভূমি রাজস্থান-এর পরে আপনার মানসী হারিয়ে গেলেন কেন? ইতিমধ্যে খুকুর নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তারপরে মানসী কোথায় গেলেন?"

এই মেলার মাঝে কোনো মহিলা আমাকে এমন প্রশ্ন করতে পারেন, তা কখনও কল্পনা করি নি! কিন্তু একটা উত্তর তো দিতেই হবে। তাই যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলি, "কোথায় যাবে আবার, সে বৃন্দাবনেই রয়েছে।"

"কিন্তু বৃন্দাবন থেকে তো প্রয়াগ খুব দূরে নয়। তিনি এখানে এলেন না কেন?"

"তার দিক থেকে কোনো বাধা ছিল বলে জানি না। কিন্তু আমিই তাকে জানাতে পারি নি এখানে আসার কথা। হঠাৎ চলে এসেছি।"

"আমরা কি কুম্ভমেলার এই জনস্রোতের মাঝে মানসীর সঙ্গে সখার সহসা দেখা হয়ে যাবার কথা আশা করতে পারি?"

"সংসারে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। মানালীর মানসী যদি বৃন্দাবনে আবির্ভূতা। হতে পারে, তাহলে বৃন্দাবনের মানসীর সঙ্গে প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে দেখা হতে পারবে না কেন? তবে জানেন তো সংসারে যেমন কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, তেমনি আবার অনেক সময় যা একান্ত সম্ভব তাও নিতান্ত অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়।

"আপনি লেখক, আপনারা কথার মালাকর। আপনার সঙ্গে কথায় পারব না। তবে একটা কথা বলে রাখি, কুম্ভমেলায় মানসীর সঙ্গে লেখকের দেখা হলে, পাঠিকা খুশি হবে।"

"দেখা হলে পাঠিকা নিশ্চয়ই তা জানতে পারবেন। এখন আসি নমস্কার।"

তিনিও নমস্কার করেন। আমি এগিয়ে চলি।

ব্রহ্মচারিণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি সঙ্গীদের কাছে। সবার সঙ্গে বেরিয়ে আসি আশ্রম থেকে। কিন্তু মনে মনে আশ্রমবাসিনীর কথাই ভাবতে থাকি। কে এই ব্রহ্মচারিণী? ইনিই কি সেই ঈশান স্কলার শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ, যিনি আমার বই পড়তে খুব ভালবাসেন? গোরাদা বলেছেন, ভদ্রমহিলা আই. এ-তে ফিফ্‌থ এবং এম. এ-তে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিলেন।

স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকায় পি. এইচ. ডি. করতে যান। কিন্তু মা-আনন্দময়ীর ডাকে দেশে ফিরে আসেন। সেই থেকে মায়ের কাছে আছেন। হিমালয় সহ তিনি ভারতের তাবৎ তীর্থ দর্শন করেছেন।

কিন্তু তাঁর মতো একজন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা সাত্ত্বিক সাধিকা আমার মানসীকে ভালবেসে ফেলেছেন! এই কুম্ভমেলায় মানসীর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি খুশি হবেন! কি জানি? সংসারে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

তবে আমার মতো একজন নগণ্য লেখকের কাছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে?

হে তীর্থরাজ প্রয়াগ, তোমার অসীম করুণা। তোমার এই পুণ্যক্ষেত্রে প্রথম দিনেই তুমি আমাকে পরমানন্দ প্রদান করলে! পূর্ণকুম্ভের হে আনন্দস্বরূপ পুণ্যপ্রয়াগ, তোমাকে প্রণাম—শত-সহস্র প্রণাম।

মায়ের আশ্রম থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েই ভারত সেবাশ্রম সংঘ। কর্মব্যস্ত আশ্রম। এখন কাজের সময়, এখন থাক। পরে একসময় এসে দেখা করব স্বামীজীর সঙ্গে।

ঠাকুরমা আবার জিজ্ঞেস করেন, "এবারে কোনদিকে যাবি?"

"চলুন, অক্ষয়বট দেখে আসি।"

"তাই ভাল।" এবারেও শঙ্করী একই স্বরে উৎসাহ প্রকাশ করে। আসল কথা, সে বেড়াতে পারলেই খুশি। সব জায়গাতেই ওর সমান উৎসাহ।

সঙ্গম মার্গ অতিক্রম করে কালী সড়ক দিয়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে চলেছি। গতকাল রাত্রে এই পথ দিয়েই আমরা শিবিরে এসেছি।

হোস্-পাইপ দিয়ে রাস্তায় জল দেওয়া হচ্ছে। বালির চর, তাই ধুলোর হাত থেকে মেলার মানুষকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা চলেছে। ঝাড়ুদারও দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে। তারা পথ পরিষ্কার করছে।

পথের মোড়ে মোড়ে মাইক। কেবলই হারিয়ে যাবার ঘোষণা আর নির্দেশ—'ভুলে ভাট্‌কে পর্ চলা আইয়ে।' 'ভুলে ভাটকে' মানে পথভোলা যাত্রীদের মিলনস্থল। কিন্তু এই স্থলটি কোথায় তা কেউ ঘোষণা করছেন না। যাক্ গে, সে-কথা। হারিয়ে যাওয়া যে কোনো বড় মেলায় একটা সর্বক্ষণের ব্যাপার। কিন্তু আজই এত, কাল কত হবে? মৌনী অমাবস্যার স্নানের সময় কত মানুষ হারাবে?

রাস্তার ঠিক মাঝখানে দু'সারি বাঁশের বেড়া। এই অংশ দিয়ে কাউকে হাঁটতে দেওয়া হচ্ছে না। ওটা ইমার্জেন্সী রোড। অর্থাৎ ভি. আই. পি.-দের

গাড়ি যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট। ভি আই. পি.-রা যে কোন বড়মেলায় যন্ত্রণা বিশেষ। অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীকে তাঁদের সেবায় ব্যস্ত থাকতে হয়, সাধারণ মানুষরা হন অবহেলিত। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে। এইভাবেই চুয়ান্ন সালের সেই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে।

এখন অবশ্য কোন ভি. আই. পি. যাচ্ছেন না। ইমার্জেন্সী রোড দিয়ে একখানি এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ছুটে যাচ্ছে মেলায়। কে জানে কোথায় আবার কি হলো? অথবা কোন ভি. আই. পি. এ্যাম্বুলেন্সে করেই মেলায় এলেন।

বেলার মাইক পথের মোড়ে-মোড়ে আর সাধুদের মাইক তাঁবুর মাথায়-মাথায়। সাধুদের মাইকের শব্দে মাঝে-মাঝেই মেলার মাইক হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাবার ঘোষণাকে হারিয়ে জেগে উঠছে মন্ত্রপাঠ, উপদেশ অথবা গান। গান বলতে রামায়ণ। অধিকাংশ আশ্রমের রেকর্ড-প্লেয়ারে তুলসীদাসের রামচরিত মানস বাজানো হচ্ছে। মহাকবি তুলসীদাসের জনপ্রিয়তা দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

এখন পথের পাশে কোন আশ্রম নেই। আর তাই বাজনার শব্দটা কানে এলো। তাকিয়ে দেখি, আমাদের সোজাসুজি বাঁধের ওপরে বহু মানুষ, বোধ করি কোন শোভাযাত্রা। বাজনার শব্দটা ওখান থেকেই আসছে।

না, না, শুধু বাজনা নয়। এমনকি সাধারণ শোভাযাত্রাও নয়। প্রথমে হাতি, তার পেছনে কয়েকটি মোটরগাড়ি।

পুলিশের বাঁশি বেজে ওঠে। চারিদিক থেকে পুলিশ ছুটে আসছেন। তাঁরা বাঁশি বাজিয়ে শোভাযাত্রার জন্য পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।

পথের পাশে সরে দাঁড়াতে হলো। সুসজ্জিত ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি বাঁধ থেকে নেমে এই পথেই এগিয়ে আসছে।

আমার প্রশ্নের জবাবে জনৈক পুলিশ অফিসার জানান—শ্রীশ্রী ১০৮নিত্যানন্দ গোপালদাসজী মহারাজ মেলায় এলেন।

—কোথায় থাকেন?

—ইনি অযোধ্যার মণিরাম ছাউনীর ছোট মোহন্ত।

ব্যাণ্ডপার্টি সহ হাতি ও গাড়ির বৈচিত্র্যময় শোভাযাত্রা চলে যায়। আমরা আবার শুরু করি পথ-চলা। মনে মনে ভাবি—ছোট মোহন্তের বেলাতেই এত, বড় মোহন্ত যখন আসবেন, তখন কত হবে?

চলতে চলতে মাসিমা জিজ্ঞেস করেন, "শঙ্করাচার্যরা এসে গিয়েছেন কি?" কাকু উত্তর দেয়, "আদিগুরু শঙ্করাচার্যই তো কুম্ভমেলার বর্তমান রূপের

প্রকৃত রূপকার। তাই চারজন শঙ্করাচার্যই কুম্ভমেলায় আসেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এসে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শুনেছি পরমহংস, নিরঞ্জনী ও আনন্দ আখড়ার তিনি মণ্ডলেশ্বর এবং নিম্বাকাচার্যও এসে গিয়েছেন।"

"আমরা তাঁদের দর্শন করব না?" পদ্মা প্রশ্ন করে।

কাকী উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই। স্নান আর সাধু দর্শনের জন্যই তো কুম্ভ-মেলায় এসেছি।" সে কাকুর দিকে তাকায়।

কাকু কোনো কথা বলছে না। নীরবে হেঁটে চলেছে আমাদের সঙ্গে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বাঁধের ধারে এসে গিয়েছি। আমাদের কিন্তু বাঁধে ওঠার দরকার নেই। বাঁধের ঠিক তলা দিয়ে আরেকটি সমান্তরাল পথ—উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। আমরা সেই পথ ধরে দক্ষিণে অর্থাৎ যমুনার দিকে এগিয়ে চলি।

পথের বাঁদিকে মূল-মেলা তার মানে তাঁবুনগরী, আর ডানদিকে বাঁধ। আমরা এগিয়ে চলি।

খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে লাল সড়ক। বলা বাহুল্য, এখানেও লাল সড়ক কালী সড়কের সমান্তরাল অর্থাৎ পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত। এটিও কালী সড়কের মতো গঙ্গাদ্বীপ পেরিয়ে ঝুসি চলে গিয়েছে। গঙ্গার ওপরে তৈরি করা হয়েছে পন্টুন-ব্রিজ।

লাল সড়ক ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। ডানদিকে বাঁধের গায়ে মহাবীর মন্দির। একে অনেকটা উঁচুতে তার ওপরে প্রচণ্ড ভিড়। তাই রামভক্ত হনুমানজীকে মনে মনে প্রণাম করে এগিয়ে চলি যমুনার দিকে।

পাণ্ডারা কিন্তু শান্তিতে হাঁটতে দিচ্ছেন না। তাঁরা বীর হনুমান এবং ঐতিহ্যময় মন্দিরের মাহাত্ম্য উল্লেখ করে আমাদের মন্দির দর্শনের আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছেন। আমরা অবিচলিত বুঝতে পেরে পাণ্ডারা ক্রুদ্ধ হলেন। অভিশাপ দিলেন—এ মন্দির দর্শন না করে প্রয়াগ থেকে চলে গেলে তোমাদের কুম্ভস্নানের ফল হবে না।

তবু নির্বিকার চিত্তে নিঃশব্দে এগিয়ে চলি। শেষ পর্যন্ত নাছোড়বান্দা পাণ্ডাজীরা রণে ভঙ্গ দেন। যাবার সময় শুধু ঘোষণা করে গেলেন—তোমরা নাস্তিক, তোমরা অধার্মিক, তোমরা ম্লেচ্ছ।

বোবার শত্রু নেই। সুতরাং আমরা বোবার ভূমিকা অভিনয় করতে করতে এগিয়ে চলেছি।

বাঁদিকে আরও তিনটি পথ পেরিয়ে এলাম। প্রথম পথটি ত্রিবেণী রোডের

সংযোজিত অংশ—একসটেনশান, বাঁধ থেকে নেমে এসেছে। কিন্তু তারপরের পথ দুটি এই পথ থেকে বেরিয়ে পূর্বে প্রসারিত।

আমাদের পথটি যমুনার খানিকটা আগে পৌঁছে ডাইনে বাঁক নিল। এখান থেকে বালুকাবেলায় নেমে সোজাসুজি এগিয়ে গেলে যমুনা—কেল্লাঘাট। আর বাঁধানো পথটি ডাইনে বেঁকে চড়াই হয়ে কেল্লায় উঠে গিয়েছে। আমাদের ডানদিকে দুর্গের দেওয়াল—অবিকল আগ্রা ও দিল্লী দুর্গের মতো লাল পাথরের উঁচু পাঁচিল।

এই কেল্লা সম্রাট আকবর নির্মিত মোগল যুগের একটি বিশিষ্ট দুর্গ হলেও, হিন্দু আমল থেকেই এখানে দুর্গ ছিল। সম্রাট আকবর সেই দুর্গের জায়গাতেই নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন অনেকে অবশ্য বলেন, এই দুর্গের ভেতর অশোক-স্তম্ভের অবস্থান প্রমাণ করছে, এখানে সম্রাট অশোকের আমলেও দুর্গ ছিল। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য বোধকরি নির্ভুল নয়। কারণ অশোকস্তম্ভ প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিল বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বী নগরীতে। সম্রাট আকবরের সময়েই সম্ভবত সেই নগরীর দুর্দশা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই আকবর অশোকস্তম্ভটি এই দুর্গে নিয়ে আসেন।

অশোকস্তম্ভ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এই স্তম্ভে সম্রাট অশোকের অনুশাসন ও সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বিবরণ উৎকীর্ণ আছে। স্তম্ভটি এই দুর্গে আনার পর জাহাঙ্গীর তাঁর সিংহাসন আরোহণের কাহিনী খোদাই করেন। স্তম্ভটিতে বহু পুণ্যার্থীর নাম খোদিত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রাজা বীরবলের নামটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবরের সভাসদ বীরবল ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঘমেলায় প্রয়াগে পুণ্যস্নান করতে এসেছিলেন।

কিন্তু অশোকস্তম্ভের ভাবনা থাক। কারণ স্তম্ভটি দুর্গের যে অংশে রয়েছে, সেটি সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা। তাই আমরা সেটি দর্শন করতে পারব না। অতএব দুর্গের ভাবনায় ফিরে আসা যাক।

মনে হয় সম্রাট আকবরও বীরবলের সঙ্গে মাঘমেলা দেখতে এখানে এসেছিলেন। হিন্দু আমলের ভগ্ন দুর্গটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রতিরক্ষার দিক থেকে স্থানটির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি ৬, ২৩, ২০, ২২৪ টাকা খরচ করে এখানে সুবিশাল দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গটি ত্রিকোণাকার। দুই নদীর দিকে দুটি এবং জনপদের দিকে একটি—এই তিনটি তোরণ ছিল সেই দুর্গের। প্রধান তোরণটি ছিল পরিখাবেষ্টিত। অতএব হিন্দু আমলে দুর্গ থাকলেও এই দুর্গটির প্রকৃত রূপকার সম্রাট আকবর। তবে তারপরে যুগে যুগে এর সংস্কার করা

হয়েছে। এলাহাবাদ অধিকার করার পরে ইংরেজরাও এই দুর্গের গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তাই ১৮৩৮ সালে তাঁরা এই দুর্গের আমূল সংস্কার সাধন করেন। তখুনি যমুনাতীরের তোরণটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু ইংরেজদের কথা থাক। আবার আকবরের ভাবনায় ফিরে আসা যাক। আকবরের আমলেও অক্ষয়বটের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর কয়েকজন হিন্দুবন্ধু তাঁকে বলেন—সম্রাট আপনিও পূর্বজন্মে অক্ষয়বটের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিলেন। পরজন্মে ভারতের সম্রাট হবার কামনা করে আপনি এই অক্ষয়বট থেকে ঝাঁপ দিয়ে মোক্ষ লাভ করেছিলেন। অক্ষয়বট আপনার কামনা পূর্ণ করেছে।

সম্রাট আকবর বন্ধুদের বক্তব্য বিশ্বাস করেছিলেন কিনা জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি, তিনি হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো আঘাত করেন নি। তাই অত টাকা খরচ করে দুর্গ নির্মাণ করেও দুর্গের একাংশ তীর্থযাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

দুর্গের সেই অংশটি এখনও তীর্থরূপে সমাদৃত। আকবর নির্মিত পূর্ব-তোরণ পেরিয়ে আমরা এখন সেই অংশে এসে উপস্থিত হয়েছি। প্রয়াগতীর্থের প্রধান দেব-দেবীরা হলেন—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মাধব সোমনাথ শিব ভরদ্বাজ বাসুকী ও অক্ষয়বট। এটি সেই অক্ষয়বট-তীর্থ। য়ুয়ান চোয়াঙের সময় এই মন্দিরটি একটি মাটির ঢিবির ভেতরে অবস্থিত ছিল। তাই চৈনিক পরিব্রাজক বলেছেন—পাতালপুরী। সেকালে এই মন্দিরটি প্রয়াগপুরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। এখনও তাই।

আমরা সেই পাতালপুরীর ছাদে এসে দাঁড়িয়েছি। তবে য়ুয়ান চোয়াঙের সময়ে মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়েছিল অক্ষয়বট। এখনও আমাদের চারিপাশে উন্মুক্ত প্রান্তর। সেখানে কিছু গাছপালাও রয়েছে। তবে নেই সেই অক্ষয়বট। অতএব মোক্ষলাভ করে পরবর্তী জন্মে রাষ্ট্রপতি হবার নেই কোন সুবর্ণসুযোগ।

মন্দিরটি নিচে, ওপরে টালির ছাদ। মন্দিরে আলো-বাতাস যাবার জন্য কয়েকটি ওপর-ঢাকা জানলা। শুনেছি ১৯০৬ সালে এইসব জানলা তৈরি করা হয়েছে।

হঠাৎ পিসিমা বলে ওঠে, "অক্ষয়বট দর্শন করতে এসেছিস! কিন্তু এই পুণ্যবৃক্ষের মাহাত্ম্য জানিস?"

মাথা নেড়ে বলতে হয়, "না।"

"তাহলে চল্, ওখানে ঐ গাছের গোড়ায় একটু গিয়ে বসা যাক। কাহিনীটা

বলে নিই।"

উত্তম প্রস্তাব। সবাই বড় গাছটার গোড়ায় এসে বসি। পিসিমা শুরু করে, "ব্রহ্মা ও গায়ত্রীর চার ছেলে সনক, সনন্দ, সনন্দন ও সনৎকুমার একবার বিষ্ণুকে দর্শন করতে বৈকুণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভগবান তাঁদের ভক্তিতে খুশি হলেন। কুশল বিনিময়ের পরে তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা জগতে কি কি আশ্চর্য বস্তু দর্শন করেছো ?

"সনকাদি মুনিগণ উত্তর দিলেন—প্রভু, আপনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আশ্চর্যতম বস্তু, তাই আমরা আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

"মৃদু হেসে বিষ্ণু বললেন—আচ্ছা, ত্রিলোকের কথা থাক, মর্ত্যলোকে তোমরা কি আশ্চর্য বস্তু দর্শন করেছো ?

"একটু ভেবে চার-ভাই বললেন—মর্ত্যের সবচেয়ে আশ্চর্যময় বস্তু প্রয়াগের অক্ষয়বট।"

—"কি রকম ?" সর্বজ্ঞ বিষ্ণু অজ্ঞতার ভান করেন।

"মুনিগণ উত্তর দেন—সে এক সুবিরাট বটবৃক্ষ। পাঁচ যোজন অর্থাৎ বিশ ক্রোশ বিস্তৃত সেই পুণ্যবৃক্ষ। শত সহস্র ঝুরি নেমেছে সেই গাছ থেকে। তার মূল পাতাল পর্যন্ত প্রসারিত, তার পাতা সোনার মতো উজ্জ্বল। সে গাছের ফল সুমিষ্ট, ছায়া সুশীতল আর তার শাখা-প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অতি সুপ্রাচীন এই বৃক্ষের মূলে শুনেছি একজন তেজস্বী মহাপুরুষ বিরাজ করেন। তাঁর গলায় মালা এবং তিনি পীতাম্বর পোশাক পরিধান করেন।

"—এই হলো সেই আশ্চর্য অক্ষয়বটের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এখন হে সর্বজ্ঞ, আপনি আমাদের এই পুণ্যবৃক্ষের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।

"ভগবান ভক্তদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না, তাঁকে অজ্ঞতার মুখোস খুলতে হলো। তিনি বললেন—প্রয়াগ আমার কাছে বৈকুণ্ঠের মতই প্রিয়, তাই প্রয়াগও বৈষ্ণবক্ষেত্র। তোমরা যে অক্ষয়বটের কথা বললে, সেটি আমারই আশ্রয়ে শোভিত। তাঁর মূলের দেবপুরুষ অক্ষয়-মাধব। তোমাদের পিতা এবং অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে আমি সর্বদা সেখানে বিরাজ করি। সর্ববিঘ্ন নিবারণ ও ভক্তদের কার্যসিদ্ধির জন্য আমি তীর্থরাজ প্রয়াগে দশরূপে অবস্থান করছি—শঙ্খমাধব চক্রমাধব গদামাধব পদ্মমাধব অনন্তমাধব বিন্দুমাধব মনোহরমাধব অসিমাধব সংকটমাধব এবং বেণীমাধব। তবে এই দশরূপের মধ্যে বেণীমাধব রূপটিই প্রয়াগে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। কারণ বেণীমাধব রূপে আমি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে বাস করি এবং স্নানার্থীদের অর্থ কাম এবং মোক্ষ দান করি।"

পিসিমার গল্প শেষ হলো। সবাই মন্দির দর্শনের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আরেকটু সবুর করুন। আমি কয়েকটা কথা বলব।"

"বেশ বলুন।" দাদু সহযাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শুরু করি—"আপনারা জানেন মহারাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ ভারতে এসেছিলেন?..."

সেজদি মাথা নাড়েন।

বলতে থাকি, "৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে প্রয়াগে এসেছিলেন। তিনি তাঁর বিবরণে এই মন্দির ও অক্ষয়বটের কথা বলেছেন।"

"তার মানে প্রায় সাড়ে তেরো শ' বছর আগেও এখানে মন্দির এবং অক্ষয়বট ছিল?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ, য়ুয়ান চোয়াঙ বলেছেন, তখন এখানে ছিল কারুকার্যখচিত এক অনিন্দ্যসুন্দর দেবমন্দির। মন্দিরটি নিয়ে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। এটি বিখ্যাত ছিল নানা মাহাত্ম্যের জন্য। অন্যান্য মন্দিরে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করার চেয়ে এই মন্দিরে একটি কপর্দক দান বেশি পুণ্যের বলে বিবেচনা করা হতো। বলা হতো, এই মন্দিরে কেউ জীবন বিসর্জন দিলে তার আনন্দময় অনন্ত স্বর্গবাস।

"য়ুয়ান চোয়াঙ বলেছেন—মন্দিরের সামনে ছিল প্রকাণ্ড একটি গাছ। তার শাখা-প্রশাখায় সমস্ত মন্দিরটি সর্বদা ছায়াশীতল হয়ে থাকত। অ[illegible] সবাই বলতেন, সেই গাছে একজন অপদেবতা বাস করেন। ভক্তরা ঐ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মবিসর্জন দিতেন বলেই অপদেবতা সেখানে ঠাঁই নিয়েছিলেন।

"য়ুয়ান চোয়াঙ সেই গাছের গোড়ায় মানুষের অস্থির স্তূপ দেখেছেন। তিনি বলেছেন, মন্দির দর্শন করতে এলে সরল ভক্তদের বোঝানো হত—জীবন অনিত্য। ভগবানের চরণে আত্মবিসর্জন দিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ। পাণ্ডা, সন্ন্যাসী ও উপস্থিত দর্শনার্থীরা সরল ভক্তদের যেমন আত্মবিসর্জনে উৎসাহিত করতে থাকতেন, তেমনি অপদেবতার নাম করে চাতুরীর সাহায্যে নানা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে তাঁদের প্রলোভিত করতেন। য়ুয়ান চোয়াঙ বলেছেন—এই নিষ্ঠুর নিয়ম সুদূর অতীত থেকে আরম্ভ হয়ে তখন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।"

"তারপরেও তো বহুকাল এই কুপ্রথা ছিল ছোষদা!" আমি থামতেই শঙ্করী প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ। আর এ ব্যাপারে জনমত এতই প্রবল ছিল যে সম্রাট আকবর পর্যন্ত এই কুপ্রথা বন্ধ করতে সাহসী হন নি।" একবার থামি। তারপরে

উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "কিন্তু আর গল্প নয়, এবারে চল দর্শন করা যাক।"

সবাই উঠে দাঁড়ায়। আমরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলি। এসে দাঁড়াই সংকীর্ণ সিঁড়ির সামনে। দেখা হয় একজন যুবক পাণ্ডার সঙ্গে। তার সঙ্গে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে—একটি আধো অন্ধকার গলিপথের মুখে। গলিপথটি ২৫.৬০ মিটার দীর্ঘ ও ১৫ মিটার প্রশস্ত। আগে আরও সংকীর্ণ ছিল। ১৯০৬ সালে প্রশস্ত করা হয়েছে।

গলিপথ পেরিয়ে আমরা মন্দিরে আসি। মন্দির মানে প্রকাণ্ড একখানি ঘর। তবে উচ্চতা বেশি নয়। মাত্র ১.২০ মিটার। মাঝে মাঝে পাথরের পিলার কিন্তু কোথাও দেওয়াল নেই। ওপর থেকে আলো এসে মন্দিরটিকে মোটামুটি আলোকিত করে তুলেছে।

চারিদিকের দেওয়াল ও পিলারের পাশে পাশে বহু মূর্তি। সবই পাথরের। অধিকাংশ মূর্তি মধ্যযুগীয়। এর অনেক মূর্তি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির থেকে কুড়িয়ে এনে এখানে রাখা হয়েছে।

মূর্তিগুলি কিন্তু দেখার মতো। পাণ্ডাজীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দর্শন করি। আমরা বাঁদিক থেকে মন্দির পরিক্রমা করছি। পাণ্ডাজী একে একে দেবদেবীদের পরিচয় দিচ্ছে—সূর্যনারায়ণ, শঙ্কর, বালমুকুন্দ, দুর্বাসা, বেদব্যাস, গঙ্গা, প্রয়াগরাজ, সরস্বতী, গোরক্ষনাথ, কুবের, বেণীমাধব, অগ্নিদেব, যমুনা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ধর্মরাজ ও অক্ষয়বট।

একালের অক্ষয়বট কোনো সুবিরাট বৃক্ষ নয়, কেবল একটুকরো কাণ্ড। তারই সামনে পূজারীরা মনস্কামনা জানাতে বলছেন, দক্ষিণা দিতে বলছেন। সহযাত্রীরা সবাই কিছু কিছু দিলেন।

পিসী বলে, "এটি আদিবৃক্ষের প্রতিনিধি।"

অর্থাৎ সেই পুণ্যবৃক্ষেরই একখানি ডাল। কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন। তবু প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, "প্রতিনিধি-বিগ্রহ বহু দেখেছি, এবারে কুম্ভমেলায় এসে প্রতিনিধি-বৃক্ষ দেখার সৌভাগ্য হলো।"

পুণ্যবৃক্ষের প্রতিনিধিকে প্রণাম করে পাণ্ডাজীর সঙ্গে এগিয়ে চলি। পাণ্ডাজী আবার দেব-দেবীদের পরিচয় দেওয়া শুরু করে—শেষনাগ, গণেশ, পার্বতী, সত্যনারায়ণ, হনুমান, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, দত্তাত্রেয়, নরসিংহ, রামসীতা ও লক্ষ্মণ এবং যমরাজ।

যমরাজকে প্রণাম করে ফিরে আসি ওপরে। বেরিয়ে আসি কেল্লার বাইরে।

কাকী বলে, "ভাসুরপো, চলুন একবার কেল্লাঘাটটি দেখে আসি।"

কথাটা ভালই বলেছে কাকী। অন্যসময় যাঁরা প্রয়াগে আসেন, তাঁরা কেল্লাঘাট থেকেই নৌকো নিয়ে সঙ্গমে যান। এ ঘাটটি তীর্থযাত্রীদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

বালির চরের ওপর নেমে এসে কয়েক পা হেঁটে আমরা যমুনার তীরে পৌঁছই। গাড়োয়াল হিমালয়ের বান্দরপুছ হিমবাহ নিঃসৃতা যমুনা, কুরুক্ষেত্র দিল্লী ও বৃন্দাবনের যমুনা। যমরাজ ভগিনী কৃষ্ণপ্রিয়া যমুনা। এখানে এসে সে তার ১৩৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ পথযাত্রার যতি টেনেছে, গঙ্গায় বিলীন হয়েছে।

না, কথাটা বোধহয় বলা ঠিক হলো না। যমুনা এখানে গঙ্গার মতো অগভীর নয়। সে সুগভীর, গঙ্গার চেয়ে অনেক বেশি জল বয়ে নিয়ে আসছে। যমুনা প্রয়াগে এসে মৃতপ্রায় গঙ্গাকে পুনর্জীবিত করেছে। যমুনা নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গঙ্গার প্রাণসঞ্চার করেছে।

নৌকোর মাঝিরা নানাভাবে আমাদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। বলছে—আগামীকাল আর সুযোগ পাবেন না, অসম্ভব ভিড় হবে। আজই চলুন একবার ঘুরে আসবেন সঙ্গম থেকে।

সঙ্গম মানে গৈরিক-গঙ্গা ও নীল-যমুনা যেখানে প্রতিনিয়ত মিলিত হচ্ছে। অন্য সময় সবাই নৌকো চড়েই সেখানে যায়, পুজো দেয়।

পাণ্ডারাও সেই কথা বলেন—নারকেল নিন, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে চলুন, পুজো দেবেন।

কিন্তু তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হই না। আমরা মৌনী অমাবস্যার পুণ্যপ্রভাতে প্রয়াগে স্নান করব। অতএব আজ নয়। আমরা তাই যমুনার জলস্পর্শ করে নিঃশব্দে ফিরে চলি।

এবারে মাঝি ও পাণ্ডারা রেগে যায়। একজন আরেকজনকে বলে—এরা যাত্রী নয়, ট্যুরিস্ট্। এরা তীর্থ করতে আসে নি, মেলা দেখতে এসেছে · স্ফূর্তি করতে এসেছে।

কথাটা ভাল নয়। তবু প্রতিবাদ করি না, কারণ বোবার শত্রু নেই। আমরা নীরবে চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। যমুনার ওপারে তাকাই।

ওপারেও যমুনার তীরে তীরে মেলা বসেছে—কুম্ভমেলা। ওপারের নাম এ্যারাইল। ওখানে মেলার আয়তন ৬১০ একর। এ্যারাইলে যাঁরা ঠাঁই নিয়েছেন, তাঁরা ওপারেই সঙ্গমের সোজাসুজি গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারায় স্নান সারবেন।

না, তাঁরা কিছু কম পুণ্য লাভ করবেন বলে মনে হয় না। এ্যারাইল বেশ

প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জনপদ। ওখানে একটি পুরোনো মাটির কেল্লা রয়েছে। সম্রাট আকবর সেই কেল্লাটির সংস্কার সাধন করেছিলেন। ওখানে আছে পোস্ট অফিস ও দুটি বেসিক জুনিয়ার স্কুল। তার একটি মেয়েদের।

কুম্ভমেলা তো বটেই। প্রতিবছর মাঘমেলার সময়ও ওখানে বহু পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। তাছাড়া শিবরাত্রি, বসন্ত পঞ্চমী এবং প্রতি পূর্ণিমায় পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। এ্যারাইলে দুটি মসজিদ ও কয়েকটি মন্দির আছে। বেণীমাধব ও সোমেশ্বরনাথের মন্দির দুটি সবচেয়ে বিখ্যাত। এই দুটি মন্দিরে ঋগ্বেদ ও প্রয়াগ মাহাত্ম্যের অংশবিশেষ উৎকীর্ণ করা দুখানি প্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি রয়েছে। অনেকের মতে, সোমেশ্বরনাথ মন্দিরে চোদ্দ বছর প্রায়শ্চিত্ত করে চন্দ্রদেব ক্ষয়রোগ মুক্ত হয়েছিলেন।

কথিত আছে, সম্রাট আওরঙ্গজেব এই মন্দিরটি ধ্বংস করতে এসেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের প্রবেশপথে সহসা একঝাঁক মৌমাছি তাঁকে এমনভাবে আক্রমণ করে যে তিনি কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে পারেন না। সম্রাট এই ঘটনায় অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি পূজারীকে মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচাত্তরখানি গ্রাম জায়গীর দিয়ে দেন। মন্দিরের মোহন্তের কাছে সম্রাটের সেই ফরমানটি আজও রয়েছে।

অনেকের বিশ্বাস, প্রয়াগের স্নান ও দানের পরে সোমেশ্বরনাথকে দর্শন করতে হয়, নইলে তীর্থদর্শনের ফল লাভ করা যায় না। আর এই কেল্লাঘাট থেকেই এ্যারাইলে যাবার খেয়া পাওয়া যাচ্ছে। তবু আমরা এখান থেকেই সোমেশ্বর-নাথকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে ফিরে চলি মেলার দিকে।

ফিরে এলাম ত্রিবেণী রোডের সঙ্গমে। বেলা মোটে এগারোটা। যা শীত, তাতে আজ আর স্নানের হাঙ্গামা নয়, আগামীকাল একসঙ্গে পুণ্যস্নান করা যাবে। কাজেই এত সকালে শিবিরে ফিরে কি হবে? তার চেয়ে বরং দিনের আলোয় বাঁধের ওপারটা একবার দেখে আসা যাক। চমৎকার রোদ উঠেছে। হাঁটতে বেশ আরাম লাগছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সহযাত্রীদের অধিকাংশই আমার প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তাঁরা শিবিরে ফিরে বিশ্রাম করতে চান। শুধু সেজদি শঙ্করী ও সুধাংশুরা আমার সঙ্গী হতে সম্মত হলো। ওঁরা ফিরে যান শিবিরে। আমরা উঠে আসি বাঁধের ওপরে।

গতকাল রাতে এই বাঁধের ওপর থেকে আলোর রূপ উপভোগ করেছি। আজ দিনের আলোয় এখানে দাঁড়িয়ে মেলার বিশালত্ব উপলব্ধি করছি। আমার

সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু তাঁবু আর তাঁবু। কত রকমের তাঁবু, কত রঙের তাঁবু। গঙ্গা ও যমুনার এপারে তাঁবু, ওপারে তাঁবু। সরকারী হিসেবে এক লক্ষ দু-হাজার তাঁবু পড়েছে এবারে কুম্ভমেলায়, বে-সরকারী হিসেবে অনেক বেশী। ভাবতে ভাল লাগছে, এরই একটি তাঁবুতে আমি বাস করছি। এই সংখ্যাতীত পুণ্যার্থীর মহাসাগরে আমিও একটি বারিবিন্দু।

ত্রিবেণী রোড ধরে নেমে আসি বাঁধের অপর পাশে। আমাদের বাঁয়ে কেল্লার সীমারেখা, ডাইনে পুলিশ থানা। ডাইনের পথ ধরি। থানার পাশ দিয়ে এগিয়ে এসে লাল সড়কে উপস্থিত হই।

এখন লাল সড়ক ধরে ফোর্ট রোডের দিকে চলেছি। পথের বাঁদিকে যাত্রীদের সারি সারি তাঁবু আর ডাইনে স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

ফোর্ট রোডের মোড়ে এলাম। এখানেই রেলওয়ে মণ্ডপ। লাল সড়ক ধরে আরেকটু পশ্চিমে এগোলেই খাদি বোর্ড ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরের বিপণী। এটি একটি ছোট প্রদর্শনী। মেলার মূল-প্রদর্শনী শাস্ত্রী পুলের উত্তরে প্যারেড গ্রাউণ্ড-এর শেষপ্রান্তে, দারাগঞ্জের কাছে।

এখন আমরা ফোর্ট রোড ধরে এগিয়ে চলেছি কুম্ভদ্বারের দিকে। খানিকটা এগিয়ে আবার একসারি রেল লাইন। একটু আগে লাল সড়কের ওপরেও রেল লাইন দেখে এসেছি। তখন কেউ কোনো প্রশ্ন করে নি। এবারে শঙ্করী জিজ্ঞেস করে, "কুম্ভনগরে কি কোনো রেল-স্টেশন করা হয়েছে?"

"না, না, তেমন কথা শুনি নি তো!" দাদু উত্তর দেন।

"তাহলে এ রেল-লাইন?" শঙ্করী কিছু বলতে পারার আগেই মনোরঞ্জন প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই, "মেলা তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম সোজাসুজি এখানে আনার জন্য রামনগর স্টেশন থেকে এই রেল-লাইনটি নিয়ে আসা হয়েছে। এতে নিশ্চয়ই কাজের অনেক সুবিধা হয়েছে।"

ওরা মাথা নেড়ে আমার অনুমান সমর্থন করে। আমরা চারিদিক দেখতে দেখতে নীরবে পথ চলেছি। এটাও মেলার অংশ তবে এদিকে যাত্রীনিবাস কম, সরকারী দপ্তরই বেশি।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। দূরে কুম্ভদ্বার দেখা যাচ্ছে। আমাদের ডানদিকে একটা পথ। ফোর্ট রোড থেকে বেরিয়ে বাঁধের দিকে চলে গিয়েছে।

কথাটা সুধাংশুরও মনে আসে। আমি কিছু বলতে পারার আগেই সে বলে ফেলে, "বেলা প্রায় বারোটা, এবারে চলুন ফেরা যাক।" একটু থেমে ডানদিকের

পথটা দেখে নিয়ে সে আবার বলে, ' মনে হচ্ছে এ পথটাও বাঁধে গিয়েছে। চলুন, এটা দিয়েই হাঁটা যাক।"

আমরা ওকে অনুসরণ করি। এপথেও দেখছি প্রচুর সরকারী দপ্তর, তার মধ্যে আবার থানা আর পুলিশ শিবিরই বেশি। খুবই স্বাভাবিক। এদেশে এখন অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত কোনো উৎসব পুলিশ ছাড়া সুসম্পন্ন হয় না। এলাহাবাদ ডিভিশনের কমিশনার শ্রীদিলীপ কুমার ভট্টাচার্য আমাকে জানিয়েছেন, শুধু এই মেলানগরীতেই আট হাজার পুলিশ দিবারাত্র কর্মরত রয়েছেন। তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের সেবা করছেন, অথচ আমরা তাঁদের দেখলেই বিরক্ত হচ্ছি। এই অকৃতজ্ঞতা অবশ্য অকারণে নয়। দেশ স্বাধীন হবার তিরিশ বছর পরেও আমরা পুলিশকে জনগণের সেবক বলে ভাবতে পারছি না। কেমন করে পারব? গণতন্ত্রের নামগান গেয়ে যাঁরাই যখন দেশের শাসনক্ষমতা কব্জা করতে পারছেন, তাঁরাই পুলিশকে তাঁদের স্বার্থরক্ষার লেঠেলরূপে ব্যবহার করছেন।

ডানদিকে পুলিশ ক্যাম্প ছাড়িয়ে এলাম, বাঁদিকে পোস্ট অফিস ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। একটু এগিয়ে ডানদিকে নির্মাণ বিভাগের দপ্তর, তারপরে আবার একটি থানা। থানার পরে চৌকোণা একফালি ফাঁকা জায়গা। ইচ্ছে করেই ফাঁকা রাখা হয়েছে। বাঁধে ওঠার মুখে যাতে কোনোরকম চাপ সৃষ্টি না হয়।

তার মানে সুধাংশুর অনুমান অভ্রান্ত। বাঁধের একটু আগে আমাদের পথটি এসে কালী সড়কের সঙ্গে মিলিত হলো। গতকাল এই পথ দিয়ে আমরা কুম্ভমেলায় এসেছি। আজও একই পথে ফিরে চলেছি শিবিরে।

পথ তো নয়, শোভাযাত্রা। মানুষ আসছে। শত-শত সহস্র সহস্র লক্ষ-লক্ষ মানুষ আসছে। আসছে আর আসছে। গতকাল দুপুর-রাতে আসতে দেখেছি, আসতে দেখেছি আজ সকালে, এই দুপুরবেলাতেও আসছে। বিকেলে আসতে দেখব, আসতে দেখব রাতে, দেখব আগামীকাল। মানুষ আসবে আর আর আসবে। কুম্ভমেলা যে মানুষের মেলা—কোটি মানুষের মিলন-মেলা।

আর এ মিলন আজকের নয়, অনন্তকালের। সেই সুদূর অতীত থেকেই কুম্ভমেলা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মিলনমেলা। এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের এই মিলনই ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী।

আগের কথা বলতে পারি না। কিন্তু প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সেই চৈনিক পরিব্রাজকের যে কথা মনে হয়েছিল, এই মেলায় এসে আমারও আজ সেই একই কথা মনে হচ্ছে। এমনকি ১৯৫৪ সালের সেই অভিশপ্ত মেলায় বসেও

শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার রায় এবং তাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর এই একই কথা মনে হয়েছে। তাঁরা তাঁদের বইতে লিখেছেন—

'We had been accorded a veritable revelation of India's soul which, in spite of the deep ravages of time and the persistent follies of the human ego, was still as young and sane as ever.*

## পাঁচ

শিবিরে ফিরে এসেই শুভসংবাদটা পাওয়া গেল—মিনতি দেবীর মাতাঠাকুরাণী সশরীরে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যাবার সময় মিনতি দেবীকে কাঁদতে দেখে গিয়েছি, ফিরে এসে তাঁকে হাসতে দেখছি। তখন তাঁবুর ভেতরে, এখন বাইরে। পথে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে সোচ্চার স্বরে মিনতি দেবী তাঁর মায়ের অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বুদ্ধিবত্তার পরিচয় প্রদান করছেন। আমাদের বললেন, "আমার মাকে আপনারা মোটেই বোকা ভাববেন না। সে দলছাড়া হয়ে পড়েই একজন পুলিশের কাছে গিয়ে কেঁদে দিয়েছে। তিনিই মাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন।"

যাক্ মা-ও তাহলে মেয়ের মতই কান্নাকাটি করতে পারেন। কিন্তু সে-কথা মেয়েকে বলা যাবে না। তাই বলি, "আমরা আপনার মাকে মোটেই বোকা ভাবি নি। বরং আপনিই বলেছিলেন, আপনার মা রাষ্ট্রভাষা বলতে পারেন না।"

"কথাটা ঠিকই। মা বাংলাতেই কেঁদেছে···"

মিনতি দেবীর বোধকরি আরও কিছু বলার ছিল, কিন্তু আমাদের শোনার সময় নেই। খাবার দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। শিবিরের দু'দিক থেকে দু'দল পরিবেশক থালায়-থালায় খাবার বেড়ে তাঁবুতে-তাঁবুতে দিচ্ছে। তাঁরা দু-প্রান্তের তাঁবু থেকে পরিবেশন আরম্ভ করে মাঝের দিকে এগোচ্ছেন। গোরাদা পরিবেশন তদারকি করছেন। ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল শিবিরে নেই। তাঁরা শহরে গিয়েছেন। পাঁচ নম্বর বাসটি এখনও আসে নি। তাঁরা সেই বাস-এর খোঁজ করছেন।

* 'Kumbha—India's Ageless Festival'

আমাদের তাঁবুটা প্রায় শিবিরের মাঝখানে। এখানে খাবার আসতে একটু দেরী হবে। তাই চুপ-চাপ বসে পরিবেশন দেখছি।

"এই যে মিত্তিরমশাই! একবার এদিকে আসুন তো!" নারীকণ্ঠ হলেও অনেকটা আদেশের মতো শোনাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি রাশভারী চেহারার জনৈকা বিগতযৌবনা আধুনিকা গোরাদাকে ডাকছেন।

গোরাদা কিন্তু সবিনয়ে জিজ্ঞেস করেন, "কি বলছেন দিদি?" তিনি এগিয়ে আসেন ভদ্রমহিলার কাছে।

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, " আপনি কখনও এন. সি. সি. ক্যাম্পিং করেছেন?"

"আমাদের সময় এন. সি. সি-কে ইউ. টি. সি. মানে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর বলা হত। তবে করেছি বৈকি। ইউ. টি. সি, এবং স্কাউটস শিবিরে বহুবার বাইরে গিয়েছি।" গোরাদা উত্তর দেন।

"আমাদের এরকম দু'দিক থেকে খাবার ডিস্ট্রিবিউট্ করছেন কেন?" রং মাখা মুখখানা বেঁকিয়ে ভদ্রমহিলা বিকৃত স্বরে প্রশ্ন করেন।

এন. সি সি. ক্যাম্পিং-এর সঙ্গে এই খাবার পরিবেশনের সম্পর্কটা বোধকরি গোরাদার মাথায় ঢোকে না। ঢুকছে না আমার মাথায়ও। কিন্তু গোরাদা তো আমার মতো চুপ করে যেতে পারেন না। তাই তিনি কোনমতে বলে ফেলেন, 'আজ্ঞে সবাই যাতে তাড়াতাড়ি খাবার পান, তাই দু'দিক থেকে দু'দল পরিবেশন শুরু করেছে।"

"কিন্তু এতে যে আমরা যারা মাঝখানে রয়েছি, তারা সবার শেষে খাবার পাবো।" ভদ্রমহিলা তাঁর লাল ঠোঁটদুটি ফুলিয়ে অভিযোগ করেন। তারপরে সমাধান বাৎলে দেন, "তার চেয়ে এন. সি. সি. ক্যাম্পিং-এ যেমন দু'দল ডিস্ট্রিবিউটরস্ মাঝখান থেকে ডিস্ট্রিবিউশন্ আরম্ভ করে দু'-দিকে এগিয়ে যায়, আপনাদেরও সেই সিস্টেম্-এ ডিস্ট্রিবিউট করা উচিত।"

"আজ্ঞে বিকেল থেকে তাই করা হবে।" গোরাদা সর্তহীন অধীনতা স্বীকার করেন। কারণ এতক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই ক্যাম্পিং-এর সঙ্গে খাবার পরিবেশনের সম্পর্কটা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরেছি আমিও এবং তাতে আমার লাভই হয়েছে। কারণ আমাদের তাঁবুটিও মাঝখানে। নূতন নিয়মে আমরাও প্রথমদিকে খাবার পেয়ে যাবো। কিন্তু ভয় হচ্ছে, দু'দিকের তাঁবুতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা তখন আবার অন্য কোন উদাহরণ পেশ করবেন না তো?

শেষের দিকে এলেও গরম খাবার পাওয়া গেল। ডাল-ভাত, সুক্তো ভাজা ও তরকারী। রান্নাও বেশ ভাল। খারাপ লাগছে ঠাকুরমা ও কাকীমার জন্য।

তাঁদের আজও ফল-মিষ্টি। এবং এই খেয়েই ওঁদের পূর্ণকুম্ভের পুণ্যস্নান শেষ করতে হবে।

খাবার পরেই পথে বেরিয়ে পড়া গেল। ঠাকুরমা এবং মাসিমাও ভবঘুরেদের দলে নাম লিখিয়েছেন। আরও একজন নূতন সদস্যা দলে যোগ দিয়েছেন। মেয়েটির বয়স বছর তিরিশ, দেখতে এখনও বেশ সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে আজও অনূঢ়া। নাম বিদিশা বোস। তার মানে আমরা এখন আর 'আন্‌লাকী থার্টিন' নই, হয়তো বা 'লাকী-ফোরটিন'। কাকু অবশ্য বলছে —থার্টিন প্লাস ওয়ান।

খাবার পরেই পথে বের হবার কারণ আগামীকাল স্নানপর্ব চলবে দিনরাত। কাল আর সঙ্গম অঞ্চলটি ভালকরে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে না। তাছাড়া বিশ্বের বৃহত্তম মেলায় এসে বিশ্রাম করে সময় নষ্ট করা সমীচীন নয়। চারিদিকে চক্‌চকে রোদ। যতটা পারা যায় আজই দেখে নেওয়া ভাল।

আমরা গঙ্গাদ্বীপ ও গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে যাবো। সঙ্গম আমাদের শিবিরের দক্ষিণ-পূবে, কিন্তু এখন আমরা সারি বেঁধে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটছি। সকালে মেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ দেখেছি। এবেলা উত্তর-পশ্চিম দিকটা দেখে নিয়ে তারপর গঙ্গাদ্বীপে যাবো। হাতে অনেক সময়।

কাল রাতে বাস থেকে নেমে যেপথে শিবিরে এসেছিলাম, সেই পথ ধরে সঙ্গম মার্গে আসা গেল। সামনেই একটা বড় আশ্রম। বাইরে ফেস্টুন— 'শ্রীসত্যানন্দ গিরি মহারাজ, কালীঘাট।'

ভেতরে আসি। বাঁশ ত্রিপল ও কাপড়ের বেশ বড় ছাউনি। একদিকে মন্দির, আর একদিকে সভাগৃহ। মন্দিরের একাংশকে প্রায় প্রদর্শনী বলা যেতে পারে। দুই সারিতে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি। বেশ বড় বড় মাটির মূর্তি। মাঝখানে চলাচলের পথ। আমরা দর্শন করি—কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা, বৈষ্ণোদেবী, বগলা, মহিষমর্দিনী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, কামাখ্যা, গঙ্গা, শিবদুর্গা, কৃষ্ণার্জুন, রাধাকৃষ্ণ, রাম-লক্ষ্মণ সীতা ও হনুমান, শঙ্করাচার্য, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি বহু মূর্তি। জনৈক নাগা সন্ন্যাসীর একটি দণ্ডায়মান মূর্তিও রয়েছে। তিনি বোধকরি এদের পরমগুরু হবেন।

দর্শন শেষে বেরিয়ে আসি গিরি মহারাজের আশ্রম থেকে। কয়েক পা এগিয়ে মানবসেবা আশ্রম। এঁরা কুরুক্ষেত্র থেকে আসছেন। সামনে ফেস্টুন —'রাজরাজেশ্বরী জগদম্বা মা-দুর্গাকী ভব্য-বিগ্রহ দর্শন।'

"তার মানে শক্তি মণ্ডপ।" বিদিশা বলে।

আমরা ভেতরে প্রবেশ করি। কিন্তু ভব্য-বিগ্রহ দর্শন করতে পারি না। বিগ্রহ পর্দা দিয়ে ঢাকা। মা-দুর্গার দর্শন না পেলেও রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাকে দর্শন করি। সিংহাসনে উপবিষ্ট অপূর্বসুন্দর ধাতুমূর্তি।

মানবসেবা আশ্রম থেকে বেরিয়ে আসতেই ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করেন, "এখন কোথায় যাবি ?"

"শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলীতে।"

"তার মানে শ্রীমন্মহাপ্রভু যেথানে শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষাদান করেছিলেন ?" বিদিশা জিজ্ঞেস করে।

আমি মাথা নাড়ি।

কাকী বলে, "ভাসুরপো, যেতে যেতে একটু কাহিনীটা শুনিয়ে দিন না !"

"কাকী ঠিকই বলেছেন ঘোষদা !" শঙ্করী যোগ করে, "গল্পট' বললে আমাদের দর্শন ভাল হবে।"

সবারই এক রা। সুতরাং শুরু করতে হয়···।

কিন্তু তার আগে বলে নেওয়া দরকার আরো কোন পথে কোন দিকে চলেছি ? আমরা সঙ্গম মার্গ ধরে উত্তরে চলেছি। পেরিয়ে এসেছি রেলপুল। এলাহাবাদে তিনটি রেলপুল আছে। একটি যমুনা ও দুটি গঙ্গার ওপরে যমুনার পুলটি প্রাচীনতম ১৮৬৫ সালে তৈরি। তারপরে তৈরি হয় ফাফামউয়ের রেল ও মোটর পুল। এই পুল পেরিয়ে আমরা গতকাল এখানে এসেছি। আর তৃতীয় এই ঝুসির পুল। এটি নির্মিত হয়েছে সবচেয়ে পরে ১৯১৫ সাল নাগাদ। এটি শুধুই রেলপুল। তাই এখন তার পাশে মোটর চলাচলের জন্য শাস্ত্রী পুল তৈরি হচ্ছে।

রেলপুল পেরিয়ে সঙ্গম রোড ধরে উত্তরে এগিয়ে চলেছি। পথের দু'দিকেই মেলা—তাঁবুর মেলা, আশ্রম অথবা কল্পবাসীদের আশ্রয় কিংবা যাত্রীনিবাস। এটাই মেলার বৃহত্তম অংশ।

শিবির থেকে সঙ্গম মার্গ ধরে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে এগিয়ে বাঁদিকের পথটি ধরতে হবে। এর আগেও এমনি দুটি পথ পেয়েছি। বাঁদিকে বাঁধ থেকে নেমে এসে ডানদিকে গঙ্গাদ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত।

বাঁদিকের সেই পথটি ধরে কয়েক মিনিট পশ্চিমে হেঁটে আমরা পৌঁছব বাঁধের ধারে। বাঁধের সমান্তরাল সেই পথটি দিয়ে এমনি উত্তরে এগিয়ে চলব। দারাগঞ্জের দিকে এগিয়ে যাবো। তখনও আমাদের ডানদিকে মেলা থাকবে। সেখানেই বাঁধের গায়ে শ্রীরূপ গোস্বামীর শিক্ষাস্থলী।

এবারে শুরু করা যাক—"শ্রীরূপ গোস্বামী খবর পেলেন, মহাপ্রভু পুরী থেকে বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়ে গিয়েছেন। তাই শ্রীরূপও গৌড় থেকে বৃন্দাবন রওনা হলেন। ছোট ভাই শ্রীঅনুপম তাঁর সঙ্গী হলেন। রওনা হবার সময় দাদা শ্রীসনাতনকে খবর পাঠালেন—আমরা মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করছি। আপনি যে কোনো উপায়ে মুক্ত হয়ে বৃন্দাবনে চলে আসুন।

রূপ ও অনুপম প্রয়াগে পৌছলেন। তাঁরা শুনতে পেলেন—ব্রজপরিক্রমা পূর্ণ করে শ্রীচৈতন্য এখানে ফিরে এসেছেন। পুলকিত দু'ভাই প্রভুর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর চরণবন্দনা করলেন। সস্নেহে দুজনকে আলিঙ্গন করে শ্রীচৈতন্য তাঁদের কাছে সনাতনের কথা জানতে চাইলেন। করুণকণ্ঠে রূপ বললেন—রাজকার্য পরিচালনে অসুবিধে হবে বলে বাদশাহ হুসেন শাহ আমাদের কাউকেই ছাড়তে চান নি। আমরা কোনোরকমে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু দাদা পারেন নি। গৌড়েশ্বর তাঁকে বন্দী করে রেখেছেন। আপনি তাঁকে উদ্ধার করুন।

প্রশান্ত স্বরে প্রভু উত্তর দিলেন—সনাতনের বন্ধন মোচন হয়েছে। কয়েক-দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

প্রভুর কথায় রূপ ও অনুপমের অশান্ত চিত্ত শান্ত হলো। সেদিন তাঁরা প্রভুর প্রসাদ পেলেন। ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপ্রভুর বাসগৃহের পাশেই দু'ভাই বাসা বাঁধলেন! কিন্তু সঙ্গমে সর্বদাই ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে বলে প্রভু রূপকে বললেন—আমি দশাশ্বমেধ ঘাটে তোমাকে শিক্ষা দান করব, তোমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়—

'লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু "দশাশ্বমেধ" যাঞা।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব—প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥'

"কিন্তু বোবদা, দশাশ্বমেধ ঘাট তো কাশীতে!"

বিদিশার কথায় থামতে হয় আমাকে। থামাতে হয় শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলীর কথা। বলি, "হ্যাঁ, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট জগদ্বিখ্যাত। তবে এখানেও একটি দশাশ্বমেধ ঘাট আছে। আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি।" একটু থেমে আবার বলি, "শ্রীরূপকে শিক্ষাদান শেষ করে শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগ থেকে কাশী যান এবং

সেখানেই শ্রীসনাতনের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে মহাপ্রভু দীর্ঘ দু'মাস ধরে সনাতনকে শিক্ষাদান করেন।"

আমি থামতেই বিদিশার দিকে তাকিয়ে দাদু বলে ওঠেন, "এই জন্যই আধুনিকাদের নিয়ে তীর্থে আসতে নেই।"

"কি জন্যে দাদু!" শঙ্করী বিদিশার পক্ষ নেয়।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য মুখে টেনে দাদু বলেন, "এই যে তোমরা রামায়ণের মধ্যে ভূতের কাঁ্যাচকাঁ্যাচি শুরু করে দিলে, প্রয়াগের দশাশ্বমেধের কথায় বারাণসীর দশাশ্বমেধকে টেনে আনলে।"

তাড়াতাড়ি দু'হাত জড়ো করে সবিনয়ে শঙ্করী বলে, "আর কখনও এমন হবে না দাদু!" তারপরে আমার দিকে ফিরে বলে ওঠে, "আপনি শুরু করুন ঘোষদা!"

আমি আরম্ভ করি—"দশদিন শিক্ষাদানের পরে প্রভু রূপকে বললেন, আমি তোমার কাছে ভক্তিরসের দিকনির্ণয় করলাম মাত্র। তুমি হৃদয়ে ভক্তির ভাবনা বিস্তার করো। এবিষয়ে যত অনুধাবন করবে, ততই শ্রীকৃষ্ণ তোমার অন্তরে স্ফূর্তি প্রদান করবেন। মনে রেখো, কৃষ্ণের কৃপায় অজ্ঞব্যক্তিও ভক্তিরসসিন্ধুর শেষ সীমায় উপনীত হতে পারে।

"অবশেষে শ্রীচৈতন্য রূপ ও অনুপমকে আলিঙ্গন করে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় চাইলেন। রূপ বললেন—আমাকেও আপনার সঙ্গে নিন।

"গুরু শিষ্যের আবেদন অনুমোদন করলের না। তিনি বললেন—এতদূর এসে শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন না করে ফিরে যাওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত হবে না। তোমরা বৃন্দাবনে যাও, কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করো। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করো, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন করো, ভক্তিরস প্রচার করো। তারপরে সুবিধামত নীলাচলে চলে এসো, দেখা হবে।

"মহাপ্রভু প্রয়াগঘাট থেকে নৌকোয় চড়ে কাশীর পথে রওনা হলেন। আর দু'ভাই পায়ে হেঁটে রওনা হলেন বৃন্দাবনের পথে।"

যে পবিত্রস্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রিয়তম শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষাদান করেছিলেন, আমরা কুম্ভমেলার মধ্যদিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। পথের ডানদিকে মেলা বাঁদিকে বাঁধ। এখান থেকে এখন গঙ্গা প্রায় দু-কিলোমিটার। তবে বর্ষাকালে বন্যার জল প্রায় এই পর্যন্ত চলে আসে। তাহলেও এখানে এখন ঘাট তৈরির কথা কল্পনাতীত। অথচ সেকালে এখানেই ছিল দশাশ্বমেধ ঘাট। তাই মনে হয় সেকালে এখান

দিয়েই গঙ্গা প্রবাহিত হত। সেটি ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তার মানে গত ৪৬৬ বছরের মধ্যে গঙ্গা প্রায় দু'কিলোমিটার পূবে সরে গিয়েছে। আর এখন সেই বালির চরে বসেছে বিশ্বের বৃহত্তম মেলা।

মেলা কিন্তু উত্তরে আরও বহুদূর বিস্তৃত। যমুনা থেকে আমরা যতখানি এসেছি, আরও ততখানি তো হবেই। তবে এদিকটায় আশ্রম ও দোকানপাট প্রায় নেই বললেই চলে। সবই কল্পবাসী ও যাত্রীদের তাঁবু। বাঁধের এপাশে মেলা কিন্তু ওপারে শহর—দারাগঞ্জ।

পথের ডানদিকে একফালি জায়গাকে এখনও দশাশ্বমেধ বলা হয়। আমরা দর্শন করি। তারপরে সিঁড়ি বেয়ে বাঁধে উঠতে থাকি। কয়েকধাপ উঠে বাঁদিকে একটি অশ্বত্থ গাছ। গাছটি প্রাচীন কিন্তু ৪৬৬ বছরের পুরোনো নয়। পরবর্তীকালে কেউ এই পুণ্যস্থানে গাছটি লাগিয়েছিলেন। ভালই করেছেন। আজ গাছটি তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সমগ্র অঞ্চলটিকে অনুপম করে তুলেছে।

গাছটির গোড়া বাঁধানো। সেই বাঁধানো জায়গায় মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন—পাথরে খোদিত। হালে তৈরি।

আরেকখানি পাথরে লেখা—'জয় গৌর। শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী স্মারকস্তম্ভ'

আমরা প্রণাম করি। সবাই একে একে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করি। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আজ সারা পৃথিবীতে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদিপ্রচারক শ্রীরূপ গোস্বামী মাত্র বাইশ বছর বয়সে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে গুরু সন্দর্শনে ছুটে এসেছিলেন এখানে। এইখানে শিক্ষাগ্রহণ করে যাত্রা করেছিলেন বৃন্দাবনের পথে। আমরা সেই পরমপবিত্র ক্ষেত্রকে প্রণাম করি। সেই অমর মহাপুরুষের অক্ষয় আত্মার কাছে আশীর্বাদ কামনা করি।

পুণ্যক্ষেত্রের দুরবস্থা দেখে অবশ্য বড়ই ব্যথা পাচ্ছি। অত্যন্ত অবহেলিত। পূজা-পাঠ তো দূরের কথা, জায়গাটিকে কেউ পরিষ্কার পর্যন্ত করে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ এই পুণ্যভূমির প্রতি কেন এমন উদাসীন, আমার জানা নেই। তবে ভেবে বিস্মিত হচ্ছি, যাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দেশে-বিদেশে এত মঠ নির্মাণ করতে পারছেন, তাঁরা এখানে ছোট একটি স্মৃতিমন্দির তৈরি করতে পারলেন না! গৌড়ের বৈষ্ণব-ইতিহাসে যে এ-জায়গাটি অত্যন্ত মূল্যবান, একথা আশাকরি তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করবেন।

অবশ্য যিনি রাজদরবারের উচ্চ আসন থেকে স্বেচ্ছায় নেমে এসে সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, তাঁর অমর আত্মা এই অবহেলায় মোটেই ক্ষুব্ধ হচ্ছে

না। কেবল নিজেদের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে নিজেরাই লজ্জিত হচ্ছি।

প্রণামের পর অশ্বত্থগাছটিকে পরিক্রমা করি। তারপরে আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। এখানে কয়েকটি ছোট-ছোট মন্দির ও সেবাইতের ঘর রয়েছে। এই মন্দির ক'টি বর্তমানে শ্রীরূপ শিক্ষাস্থলীর প্রধান আকর্ষণ। অতএব দর্শন করি। একটি মন্দির শ্বেতপাথরে তৈরি, ভারী সুন্দর। ভেতরে হরপার্বতীর প্রাণময় মূর্তি। দুটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ, একটিতে গণেশ ও আরেকটিতে অন্নপূর্ণার অপূর্ব সুন্দর মূর্তি।

দর্শনের পরে সবাই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি পথে। ফিরে চলি সঙ্গমের দিকে। এখন আমাদের ডানদিকে বাঁধ ও বাঁদিকে মেলা—কুম্ভমেলা।

ফিরে এলাম কালী সড়ক ও সঙ্গম মার্গের সংযোগস্থলে। মাসিমা জিজ্ঞেস করেন, "এখন কোনদিকে যাবে?"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই সেজদি বলে ওঠে, "কুম্ভমেলায় মানুষ আসে দুটি কারণে, স্নান করতে ও সাধু দেখতে। এখনও যে সাধু দেখাই হলো না!"

"মাসিমা ঠিকই বলেছেন ভাইপো!" পদ্মা যোগ করে, "চলো, আখড়াগুলো দেখে নেওয়া যাক।"

"কিন্তু তখন যে সঙ্গমে যাবার কথা বলেছিলে?" আমি প্রশ্ন করি।

পদ্মা কোনো উত্তর দেয় না। তবে সুধাংশু বলে, "আখড়াগুলো দেখে নিয়ে সঙ্গমে যাবো।"

সুধাংশু বয়সে যুবক, তার পক্ষে এ প্রস্তাব খুবই স্বাভাবিক কিন্তু সঙ্গে ঠাকুরমা ও মাসিমা রয়েছেন। তাঁরা এত ধকল সইতে পারবেন কি?

তাঁরা কিন্তু কোনো আপত্তি করছেন না। অতএব নিঃশব্দে এগিয়ে চলি। বেশি দূর এগোতে হয় না। কারণ কালী সড়ক থেকে প্রায় যমুনা পর্যন্ত সঙ্গম মার্গের সারা বাঁদিক জুড়েই আখড়া। মাঝখানে লাল সড়ক গঙ্গাদ্বীপের দিকে চলে গিয়েছে। লাল সড়কের দু'পাশেও আখড়া আর আশ্রমের সারি।

আমরা সদলবলে একটি আখড়ায় এসে ঢুকি। আখড়া মানে অনেকখানি ঘেরা জায়গা, ভেতরে সারি-সারি তাঁবু ও ত্রিপলের ছাউনি। কোনটিতে মন্দির ও সভাগৃহ, কোনটিতে সাধুদের বাস। এ আখড়ায় অনেক সাধু রয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। তোরণের সোজাসুজি আখড়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলাচলের পথ। দু'পাশের তাঁবু কিংবা ত্রিপলের ছাউনিতে সাধুরা রয়েছেন। কেউ চোখ বুজে ধ্যান করছেন, কেউবা মন্ত্রপাঠ করছেন। কেউ

নগ্নদেহে ভস্ম মেখে পদ্মাসন করে আগুনের সামনে মৌনী হয়ে বসে আছেন, কেউবা ঢিলাঢালা জাঁকাল পোশাক পরে মাইকের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অনেকে আবার নানারকম শারীরিক কসরৎ দেখাচ্ছেন। কেউ মাটির মধ্যে মাথা পুঁতে কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কেউবা তারকাঁটার ওপরে শুয়ে আছেন। কেউ রোগা কেউ মোটা কেউ খাটো কেউ লম্বা, কেউ সুন্দর কেউ কুৎসিত। কারও চেহারা হিংস্র, মুখের দিকে তাকালে ভয় হয়, আবার কারও চেহারা বড়ই প্রশান্ত, দেখে মনটা আনন্দে ভরে উঠছে।

এক জায়গায় একজন সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী দরাজ গলায় গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। আমরা সবাই হিন্দি ভাল বুঝতে পারি না, তবু সাধুজীর স্বরে মোহিত হই। দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকি, সাধুজী বলছেন—একবার হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় স্নানের বহর দেখে মা-গঙ্গা বিষ্ণুভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী স্নানের সঙ্গে নানা নোংরা ফেলে আমার জলকে দূষিত করে তুলেছে। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

—মৃদু হেসে নারায়ণ উত্তর দিলেন, তুমি সাধারণ স্নানার্থীদের পবিত্র করে তোলো, সাধুরা স্নান করে তোমার জলকে পবিত্র করে তুলবেন।

আমরা আবার চলা শুরু করি। চলতে চলতে ভাবি এইসব সাধুদের মাঝে হয়তো বহু ভণ্ড রয়েছে কিন্তু এদের মধ্যে প্রকৃত সাধু নেই সেকথাও তো মনে হচ্ছে না। আমি তাঁদের চিনতে পারছি না কারণ যে অন্তর্দৃষ্টি থাকলে মহাত্মাদের চেনা যায়, তা আমার নেই। তবু আমার মন বলছে—এঁদের মাঝেই মিশে আছেন এমন অনেক সন্ন্যাসী, যাঁরা সর্বপ্রকার পার্থিব সুখ বিসর্জন দিয়ে, দেহ ও মনের সকল অস্থিরতাকে জয় করে, জগতের সমস্ত জিজ্ঞাসার উর্ধ্বে উঠে মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের কোনো সম্প্রদায় নেই, কোনো ধর্ম নেই, কোনো দেশ নেই—তাঁরা শুধুই সেই পরমাত্মার পূজারী, সর্বশক্তিমানের একনিষ্ঠ সাধক। নাইবা চিনতে পারলাম তাঁদের, শুধু তো অনুভব করছি, তাঁরা আছেন, আছেন আমার আশেপাশে, এই কুম্ভমেলার মাঝে।

অনেকের ধারণা জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে মানুষ সংসার ত্যাগ করে, সন্ন্যাস নেয়। কিন্তু এ অপবাদ অনেকের পক্ষেই সত্য নয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমে অস্থির হয়ে আপন সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডি ত্যাগ করে বৃহত্তর বিশ্বসংসারের মাঝে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দর্শন করে আমাদের জীবন আজ ধন্য হয়ে উঠেছে।

আখড়া দেখতে দেখতে আমরা লাল সড়ক ও সঙ্গম মার্গের সঙ্গমে এলাম।

লাল সড়ক ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। কারণ সঙ্গম মার্গ ধরে আর এগিয়ে লাভ নেই। আমরা গঙ্গাদ্বীপ দেখে সঙ্গমঘাটে যাবো। সঙ্গম মার্গ ঠিক সঙ্গমে যায় নি, যমুনার তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

কিন্তু গঙ্গাদ্বীপ কিংবা সঙ্গমের কথা পরে হবে। আপাতত আখড়াগুলো দেখে নেওয়া যাক। লাল সড়কের দু'পাশেও আখড়া। বাঁদিকে নিরঞ্জনী, শ্রীপঞ্চায়তী আনন্দ ও শ্রীপঞ্চ দশনাম জুনা আখড়া আর ডানদিকে ত্যাগী, নির্মোহী, নির্বাণী ও দিগম্বর আখড়া।

পিসিমা বলে, "চল্, নিরঞ্জনী আখড়া দেখে নিই আগে। অনেক মহাত্মা আছেন এ আখড়ায়।

অতএব পিসিমার পেছন-পেছন ভেতরে প্রবেশ করি। দু-খানি ঝকমকে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপরেই তাঁবুর সারি। প্রায় প্রত্যেক তাঁবুতেই সাধুরা রয়েছেন। দর্শন করতে করতে এগিয়ে চলি। সবচেয়ে সুবিশাল ছাউনির নিচে মন্দির ও সভাগৃহ।

মন্দির দর্শন করে বেরিয়ে আসার পথে রসুইঘরের সামনে থমকে দাঁড়াতে হয়। শঙ্করী বলে, "খাঁটি ঘি-য়ের গন্ধ, বোধহয় পোলাউ রান্না হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকো না।" দাদু তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "দাঁড়ালেই জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে।"

হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসি নিরঞ্জনী আখড়া থেকে। নিরঞ্জনীর পরে শ্রীপঞ্চায়তী আনন্দ আখড়া। গড়ন একই রকম। ভেতরে কয়েকখানি গাড়ি। আমরা আর ভেতরে প্রবেশ করি না।

কয়েক পা এগিয়ে শ্রীপঞ্চদশনাম জুনা আখড়া। পিসিমা বলেন, "ভেতরে চল্।"

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে আসি। তেমনি মাঝখানে চলা-চলের পথ, দু-পাশে তাঁবু ও ছাউনির সারি।

বাঁদিকে একটা চারদিক খোলা ছোট ছাউনির সামনে বেশ ভিড়। আমরাও সেখানে আসি। দু-জন ছাইমাখা নাগা সন্ন্যাসী। একজন সামনে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীদের পয়সা দিতে বলছেন, আর একজন একটা উঁচু বেদীর ওপরে পদ্মাসন করে মৌনী হয়ে রয়েছেন। তাঁর মাথার ওপর একটা পেতলের ফুটো কলসী টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। অনবরত ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে সেই নাগা সন্ন্যাসীর জটাময় মস্তকে। জটা বেয়ে জল পিঠ বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

"আইডিয়া-টা কি? কানাই জিজ্ঞেস করে।

শঙ্করী উত্তর দেয়, "সম্ভবত শিব মাথার ওপরে গঙ্গাকে গ্রহণ করছেন।"

"আসল ব্যাপার, সাধুবাবার সহ্যশক্তি দেখানো হচ্ছে। এই শীতেও মাথায় ঠাণ্ডা জল পড়ায় তাঁর শীত লাগছে না।" সুধাংশু যোগ করে।

হঠাৎ দাদু আমাকে ইসারা করে কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে অর্থাৎ নাগা সন্ন্যাসীর পেছন দিকে আসি। দাদু আবার ইসারা করেন। আমি দেখি—মহাদেব রূপী নাগা সন্ন্যাসীর জটার ভেতর থেকে সরু একফালি 'প্লাস্টিক-শীট' পিঠ বেয়ে নিচে নেমে এসেছে। তারই ওপর দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়ছে। এতে সাধুবাবার কতখানি শীত কম লাগছে বুঝতে পারছি না, তবে ব্যবস্থাটি অভিনব।

কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল! যাঁরা এখানে সাধু দর্শন করতে আসছেন, তাঁরা তো কেউ এমন পরীক্ষা নিতে চান নি। নাগা সন্ন্যাসীরা বসে থাকলেই দর্শনার্থীরা সাধ্যমত প্রণামী দেন। তাছাড়া যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছেন, এমনকি যাঁরা বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণকে পর্যন্ত বাহুল্য বলে বোধ করেন, তাঁরা কেন পয়সা রোজগারের জন্য এমন ছল-চাতুরির আশ্রয় নেবেন?

মনটা খারাপ হয়ে যায়। তবু সহযাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে চলি। কয়েক পা এগিয়ে আরেকটা ছাউনির তলায় তিনজন নাগা সন্ন্যাসী। তাদের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটা, মুখে দাড়ি। তাঁরা চুপচাপ চোখ বুজে বসে আছেন। বোধকরি ধ্যান করছেন।

কম্বল গায়ে দিয়ে জনৈক জটাধারী সন্ন্যাসী তাঁদের তিনজনের তদারকী করছেন। তিনি মাঝে মাঝেই হাত নেড়ে বলছেন—দর্শন করো, প্রণামী দেও, আউর চল্‌তে রহো। খাড়া মত্ হো যাও।

পথের দু-পাশেই মাঝে মাঝে এমন নাগা সন্ন্যাসীরা আসন পেতেছেন। দর্শনার্থীরা ভক্তিভরে তাঁদের প্রণাম করছেন, প্রণামী দিচ্ছেন আর বিভূতি নিচ্ছেন। একজন দীর্ঘদেহী নাগা সন্ন্যাসী কঠিন আসনে সমাসীন। তাঁর সারা গায়ে সোনারা অলঙ্কার। তিনিও নির্বাক। কেবল মাঝে মাঝে ঠোঁট দুটি নড়ে উঠছে। কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

আরেক জায়গায় কয়েকজন নাগা সন্ন্যাসী জটলা পাকিয়ে বসে আছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন এবং পালা করে গাঁজা টানছেন। এক-একজন হঠাৎ 'ব্যোম্' 'ব্যোম্' বলে চেঁচিয়ে উঠছেন।

আমরা আখড়ার প্রায় শেষপ্রান্তে উপনীত। বাঁদিকে আর একটিমাত্র দর্শন। তাড়াতাড়ি সেখানে আসি। এসে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। সঙ্গে ঠাকুরমা, কাকী

ও শঙ্করী রয়েছে। এমন সাধু দেখতে হবে বলে জানা ছিল না। তাহলেও এসে পড়েছি। অতএব তাঁকে দেখতে হয়।

তিনি নাগা সন্ন্যাসী, যুবক এবং স্বাস্থ্যবান। তাঁর পরনে কাপড় নেই, মাথায় জটা নেই, মুখে দাড়ি নেই। কিন্তু গলা কোমর ও হাত-পায়ে গয়না আছে। এমন সন্ন্যাসী আমরা অনেক দেখেছি! সুতরাং আমি এজন্য লজ্জিত নই। লজ্জা পাচ্ছি তাঁর শিশ্নের (penis) দিকে তাকিয়ে। সন্ন্যাসী সেটির সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বড় হাতঘড়ি বেঁধে রেখেছেন। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, যাতে সেটির দিকে সবার চোখ পড়ে।

সাধুবাবার পাশে আরেক যুবক সন্ন্যাসী বসে আছেন। তিনি একটা ভোট-কম্বল গায়ে দিয়ে বেশ মৌজ করে বসেছেন। তাঁর একহাতে জলন্ত সিগারেট আরেক হাতে ছোট একটি ট্রান্‌জিস্টার। তিনি ক্রিকেট টেস্ট্‌ম্যাচের রিলে শুনছেন। হঠাৎ রেডিও নামিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হেঁকে উঠলেন, "বাবাকো দর্শন করো, আউর প্রণামী দেও। লেকিন খাড়া মত্‌ হো যাও, চল্‌তে রহো। চরৈবেতি।

তাড়াতাড়ি দর্শনী দিই। কিন্তু চলতে পারি না। তার আগেই কথাটা কানে আসে। নাগাবাবা তাঁর সঙ্গীকে বলছেন, "এ রামুয়া! তেরা কম্বল আউর গামছা মুঝে দে দে, অভি তু নাঙ্গা হো যা!"

তাহলে কি এরা অশন-বসনত্যাগী তপস্বী নন? পয়সা রোজগারের জন্য উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন? পালা করে নাঙ্গাবাবা সাজছেন? 'শিফ্‌ট ডিউটি' দিচ্ছেন? কিন্তু এরা আদিগুরু শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত এই আখড়ায় স্থান পেলেন কেমন করে?

মনটা খারাপ হয়ে যায়। কি দেখতে এসে, কি দেখতে পেলাম? অবশ্য জানি এই ভেজালের দুনিয়ায় আসল খুঁজে পাওয়া ভার, তাহলেও আসল আছে! আছে এই সব আখড়া ও আশ্রমের ভেতরেই। আমি নিজে জানি গঙ্গোত্রীর স্বামী কৃষ্ণাশ্রম ও ভারমৌরের (মণিমহেশ) স্বামী জয়কৃষ্ণ গিরি মহারাজ নিয়মিত কুম্ভমেলায় আসতেন।*

এখন আর খোঁজাখুঁজি করার সময় নেই। এখনও বহু দূর যেতে হবে। সন্ধ্যে হতে আর বেশি দেরি নেই। তাই আর কোনো আখড়ায় না ঢুকে আমরা ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলি।

লাল সড়ক এসে শেষ হলো একটা পুলের গোড়ায়—পণ্টুন ব্রিজ। মানে

* লেখকের 'চতুরঙ্গীর-অঙ্গনে' ও 'হিমতীর্থ-হিমাচল' বই দু-খানি দ্রষ্টব্য।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার বয়া জলে ভাসিয়ে তার ওপর লোহা আর কাঠের পুল। ওপরে লোহার পাত। সঙ্গম নামক ভূখণ্ডটি এখানেই শেষ হলো। এর পরে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত গঙ্গার দুটি ধারা। মাঝখানে গঙ্গাদ্বীপ। গঙ্গাদ্বীপের ওপারে অর্থাৎ পুবে ঝুসি।

সঙ্গম ও গঙ্গাদ্বীপ এবং গঙ্গাদ্বীপ ও ঝুসির মধ্যে মেলা উপলক্ষে এমনি দশটি অস্থায়ী পুল তৈরী করা হয়েছে। পুলগুলো বারো ফুট চওড়া ও সাড়ে চারশ' ফুটের মতো লম্বা।

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে গঙ্গার বুকে গঙ্গাদ্বীপ। বর্তমান আয়তন ৩২০ একর। এটি নূতন ভূখণ্ড। অস্থায়ীও বটে। বর্ষাকালে দ্বীপটি জলের নিচে তলিয়ে যায়। কারণ ওটি অনেক নিচে। প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে সঙ্গম নিচু, সঙ্গম থেকে গঙ্গাদ্বীপ আরও নিচে। শুধু গঙ্গাদ্বীপ নয়, সঙ্গমও বর্ষার বন্যায় তলিয়ে যায়। ফলে আগামী কুম্ভমেলা তো দূরের কথা, আগামী মাঘী মেলায়ও এইসব পথের কোনো চিহ্ন থাকবে না। আবার নূতন করে সব কিছু তৈরি করতে হবে। প্রতি বছর মাঘ মাসে এখানে মেলা হয়। বেশ বড় মেলা। কয়েক লক্ষ নর-নারী স্নান করেন।

ওপারে প্রাচীন ঝুসির বেলায় কিন্তু একথা সত্য নয়। প্রাচীন ঝুসি বেশ উঁচু এবং স্থায়ী ভূখণ্ড। কিছুকাল আগেও ঝুসিতে গঙ্গাতীরে তেমন জনবসতি ছিল না। তাই অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করতেন ওখানে। তাঁরা জপ-তপ ও সাধন-ভজন করে দিন কাটাতেন। এখন সংসারীরা সন্ন্যাসীদের পাড়া দখল করে নিচ্ছে।

কনৌজের প্রতিহার রাজা ত্রিলোচনপালের রাজধানী প্রতিষ্ঠান একালে প্রাচীন ঝুসি বা ঝুসি কোহনা গ্রাম নামে পরিচিত। গ্রামটি সঙ্গমের বিপরীত দিকে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। ওখানেও বেলাভূমিতে মেলা বসেছে, আয়তন ৫১৭ একর।

পুরাণে প্রতিষ্ঠানকে কেশী নামে উল্লেখ করা হয়েছে। য়ুয়ান চোয়াঙ তাঁর বিবরণে বলেছেন—'Kia-Shi-Pu-Lo'. অনেকের মতে একদা ঐ জনপদকে বলা হত—হরবংপুর অথবা হরভূমপুর। হরবং হলেন একজন পৌরাণিক রাজা। গোরখনাথ নামে জনৈক ঋষি ও তাঁর গুরুদেবের অভিশাপে হরবঙের রাজধানী ধ্বংস হয়ে যায়। আবার অনেকে বলেন, সঈদ আলি মুর্তাজা নামে একজন পীরের অভিসম্পাতে ১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল ভূমিকম্প হয়ে প্রাচীন ঝুসি ধ্বংস হয়ে গেছে।

তাহলেও ঝুসি কোহনায় বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে। গঙ্গাতীরেই আছে হংসকুটি বা হংসতীর্থ। দেড়শ' বছরের এই প্রাচীন তীর্থটি একটা উঁচু ঢিবির ওপরে অবস্থিত। অনতিদূরে আরেকটি মন্দিরে বিগ্রহের পাদদেশে সংস্কৃত শিলালিপি রয়েছে।

হংসতীর্থের কাছেই মৎস্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণে বর্ণিত সেই বিখ্যাত সমুদ্রকূপ। তবে পৌরাণিক কূপটি বোধহয় কালক্রমে ভরাট হয়ে গিয়েছিল। কারণ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে ওখানে কোনো কুয়ো ছিল না। ঐ বছর সুদর্শন দাস নামে জনৈক সাধু নূতন করে কুয়ো কাটান। ইদারাটির গায়ে আরবী লিপিতে কিছু লেখা রয়েছে।

সমুদ্রকূপ দর্শন করা কিন্তু সহজ নয়। কারণ কুয়োটি প্রায় তিনশ' ফুট উঁচুতে অবস্থিত। আড়াই শ' ধাপ সিঁড়ি ভেঙে কুয়োর কাছে পৌছতে হয়। সেকালে ওখানেই ছিল দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ। মৎস্যপুরাণে আছে পৃথিবী যখন পাপে পরিপূর্ণ হবে, তখন এই কুয়ো থেকে জল উঠে পৃথিবীকে প্লাবিত করে দেবে।

সমুদ্রকূপের যিনি বর্তমান মোহন্ত, তাঁর বয়স নাকি একশ' সত্তর বছর। তিনি তাঁর জীবনে দুবার এই কূপের জলকে স্ফীত হতে দেখেছেন। দেখা মাত্র যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। এবং যজ্ঞের পরে জলস্ফীতি প্রশমিত হয়েছে।

শুনেছি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় এবং সূর্য গ্রহণের সময় এই কূপ প্রদক্ষিণ করলে বিশ্বপরিক্রমার পুণ্য হয়। আগামীকাল মৌনী অমাবস্যা। কিন্তু আমাদের সে সৌভাগ্য হবে কি?

সমুদ্রকূপের কাছে একটি হনুমান মন্দির ও বেশ কয়েকটি গুহা রয়েছে। এইসব গুহায় কিছুকাল আগেও সাধুরা নির্জনবাস করতেন। এখন সংসারীদের ভিড়ে তাঁদের অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন।

একালে যেখানে সমুদ্রকূপ, সেকালে সেখানেই নাকি পৌরাণিক রাজা হরবঙের দুর্গ ছিল আর সেই দুর্গ মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত গন্ধর্বরাজ বৃষকেতুর কন্যা মহাসতী মদালসার স্মরণীয় কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত।

কিন্তু মদালসার কাহিনী এখন নয়, এখন কেবল ঝুসির কথা ভাবা যাক। সমুদ্রকূপের দক্ষিণে পীরসাহেব শেখ তাকির সমাধি। পীরসাহেব ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে ঝুসিতে জন্মগ্রহণ করেন্ এবং চৌষট্টি বছর পরে ঝুসিতেই তাঁর পুণ্যময় মহাজীবনের অবসান হয়।

তাঁর সমাধিক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুবিশাল বৃক্ষ। গাছটির গোড়ার পরিধি আঠারো মিটার আর ওপর দিককার পরিধি বিশ

মিটার। ভক্তরা বলেন, গাছটির বয়স ছ' শ' বছর। তাঁদের মতে পীরসাহেবের দাঁতন থেকে গাছটির জন্ম। তাঁরা তাই গাছটির নাম দিয়েছেন—দাঁতন। স্থানীয়রা বলেন, 'বিলায়তী ইম্‌লি' তথা বিলেতী তেঁতুল গাছ। উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীরা অবশ্য তাঁদের সঙ্গে একমত নন। কিন্তু তাতে ভক্তদের কিছু যায় আসে না। কারণ ভক্তি অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত, ভক্তি বিজ্ঞানের যুক্তিগ্রাহ্য না-ও হতে পারে।

কিন্তু ওপারের ভাবনা থাক, এপারে পদচারণা করা যাক। আমরা সারি বেঁধে পুলের ওপরে উঠে আসি। পুলের দু'পাশে লোহার তারের বেড়া, আর মেঝেতে লোহার পাত। তারই ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ভাসমান পুল, দুলছে অবিরত। তবে বেশ মজবুত ও সুদৃশ্য পুল।

পুল পেরিয়ে গঙ্গাদ্বীপে আসি। এ অঞ্চলটি দেখছি আরও জম-জমাট। পথেও ভিড় বেশি। তাই তো হবে। গঙ্গাদ্বীপের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই নাকি মহাত্মাদের বাস। সবই প্রায় আশ্রম ও আখড়া। তাছাড়া এখানেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্বশান্তি যজ্ঞ। এবং এটি কুম্ভমেলায় সঙ্গমের নিকটতম অংশ।

লোহার পাত কেবল পুলের ওপর নয়, পথের ওপরেও। কারণ গঙ্গাদ্বীপ একেবারে বালিময় তার ওপরে এখানেও প্রায় প্রতি আশ্রমে গাড়ি দেখতে পাচ্ছি।

পথ বন্ধ। ভীষণ ভিড়। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপার কি?

জনৈক পথচারী জানান—সামনের ঐ আশ্রমে দ্বারকাধামের শ্রীশঙ্করাচার্য রয়েছেন। আমরা দর্শনের আশায় দাঁড়িয়ে রয়েছি।

"ওরে দাঁড়িয়ে পড়, শিগ্‌গীর দাঁড়িয়ে পড়। ভগবানকে দর্শন করার এমন সুযোগ আর পাবি নে!" পিসিমা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

অতএব দাঁড়িয়ে পড়ি। আর দাঁড়িয়েই-বা কি করব—পথ বন্ধ।

দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু কামনা অপূর্ণ থেকে গেল। সংসারে সবার ভাগ্যে কি ভগবৎ-দর্শন লেখা থাকে? সহসা আশ্রমের মাইকে ঘোষণা করা হলো—ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য আজ আর দর্শন দান করবেন না। আপনারা দয়া করে ভিড় করবেন না। এখন ফিরে যান। আগামীকাল সকাল দশটায় আসুন, দর্শন পাবেন।

ভগ্নহৃদয়ে ভিড় ভেঙে যায়, পথ পরিষ্কার হয়। আমরা এগিয়ে চলি।

চলতে চলতে দাদু বলেন, "শঙ্করী হয়ে শঙ্করাচার্যকে দর্শন করতে পারলে না!"

"শুধু আমাকে বলছেন কেন? শঙ্কুদাও তো শঙ্করাচার্যের দর্শন পেলেন

না।" সঙ্গে সঙ্গে সহাস্যে শঙ্করী জবাব দেয়।

আমি আশ্বাস দিই, "আজ না হলেও আরেক দিন হবে। দ্বারকা শৃঙ্গেরী যোশীমঠের শঙ্করাচার্যগণও মেলায় এসেছেন।"

"বেঁচে থাক্ বাবা।" ঠাকুরমা সকৃতজ্ঞ স্বরে আশীর্বাদ করেন।

কাকু পিসিমা ও মাসিমা সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। আমি এগিয়ে চলি।

পাশাপাশি পথ চলা যাচ্ছে না। পথে প্রচণ্ড ভিড়। একে তো পথের তুলনায় পথচারীদের সংখ্যা বেশি। তার ওপরে পথের পাশে পাশে লোটা-কম্বল নিয়ে শত শত যাত্রী শুয়ে-বসে রয়েছেন। এরা আশ্রয় না পেয়ে পথে ঠাঁই নিয়েছেন। রাতটা এখানেই কাটিয়ে কাল একেবারে সঙ্গমে স্নান সেরে ঘরের পথে পা বাড়াবেন।

তাই সারি বেঁধে ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছে আমাদের। মানুষের চেয়ে মাইকের জন্য আরও বেশি অসুবিধে হচ্ছে। পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে রয়েছে মেলার মাইক। তাতে ক্রমাগত হারান-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের ঘোষণা হয়ে চলেছে। আর প্রতি আশ্রমের সামনে রয়েছে নিজেদের মাইক। কোথাও মন্ত্রপাঠ কিংবা কীর্তন, কোথাও উপদেশ অথবা নির্দেশ। সত্যি কান ঝালা পালা হবার অবস্থা।

আগেও দেখেছি, এখনও দেখছি। কিছু শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতী মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কারও পরনে প্যাণ্ট্-কোট, আবার কারও নামাবলী কিংবা গেরুয়া। প্রায় প্রত্যেকের কাছেই ক্যামেরা ট্রান্‌জিস্টার কিংবা দূরবীন। এবং অধিকাংশকেই জোড়ায় জোড়ায় দেখতে পাচ্ছি। খুবই স্বাভাবিক, ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য সমাজ কোনোদিন 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' কথাটি মেনে নেন নি। তবে এরা 'পতি' কিংবা 'সতী' না-ও হতে পারে। শুধু বন্ধু কিংবা বান্ধবী হতেও বাধা নেই কিছু। পাশ্চাত্যসমাজে 'সেক্স' শব্দটির সঙ্গে 'ফ্যামিলি' শব্দটার কোনো সম্পর্ক নেই।

সামনের ঐ শ্বেতাঙ্গ যুবতীটি অবশ্য ব্যতিক্রম। সকাল থেকেই সে একটা বাঘ-সিংহ ছাপা রঙিন 'কাপ্তান' পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিচিত্র পোশাকের জন্যই চিনতে পারছি তাকে।

মেয়েটি পোশাক পালটায়নি কিন্তু সঙ্গী পালটে চলেছে। তার কাঁধে ক্যামেরা নেই। সে সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে পথ চলে। সকালে অনেক শিখ যুবকের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাকে কেল্লা থেকে ফিরতে দেখেছি। এখন দেখতে পাচ্ছি

দাড়ি ও পাগড়িবিহীন জনৈক সুশ্রী মারাঠী যুবকের কণ্ঠলগ্না।

এমন মেয়ে আমি কেঁদুলি ও গঙ্গাসাগর মেলাতে দেখেছি। এরা কেউ দেহপসারিনী নয়। প্রচুর পয়সা-কড়ি নিয়ে এরা এদেশে আসে। প্রত্যেকেই লেখা-পড়া জানে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় বয়-ফ্রেণ্ড-এর অভাব নেই তবু এরা একা আসে। অথচ একা থেকে দেহকে উপোসী রাখতে পারে না। বরং এদেশের ইতিহাস ভূগোল ও সংস্কৃতিকে জানার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের যৌবনের জ্বালা মেটায়। এবং সেই সঙ্গে এদেশের মানুষ ও সমাজকে জেনে যায়।

কিছুক্ষণ ধরে একজন কৌপীন পরিহিত ভস্মমাখা জটাধারী যুবক সাধু আমাদের আগে আগে পথ চলেছেন। তিনি হাঁটছেন আর মাঝে মাঝে পেছন ফিরে আমাদের দেখছেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। টাকা-পয়সা চাইবেন বোধহয়।

সাধুজী অবশ্য বেশিক্ষণ কৌতূহলের মধ্যে রাখলেন না। সহসা পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। কাছে পৌঁছতেই বিশুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন করেন, "আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?"

একটু অবাক হই। এই বয়সের বাঙালী তরুণ এই পোশাকে কুম্ভমেলায়! তাহলেও বিস্ময় কাটিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিই, "হ্যাঁ।"

"আমার বাড়ি শ্যামবাজারে।"

"কতদিন ঘর ছেড়েছেন?"

"তা বছর সাতেক হলো, তখন আমার বয়স সতেরো।"

"এত অল্প বয়সে বাড়ি ছাড়লেন কেন?"

"সংসার ভাল লাগল না। মনে হলো ভগবৎ-লাভেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। কিন্তু ভগবৎ-লাভের পথ যেমন দুর্গম, তেমনি দীর্ঘ। তাই শক্তি ও সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়লাম।"

একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি, যাঁকে পাবার জন্য সব কিছু স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছেন, তাঁকে পেয়েছেন কি? কিন্তু সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। অন্য কথা বলি, "বাড়িতে কে কে আছেন?"

চট করে উত্তর দিতে পারেন না সাধুজী। কি যেন একটু ভাবেন, তারপরে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিলেন, "যখন বাড়ি ছেড়েছিলাম, তখন তো সবাই ছিলেন— ঠাকুরমা, বাবা-মা, দাদা-দিদি ও ছোটবোন।" একবার থামেন তিনি, তারপরে হঠাৎ জোরে জোরে বলে ওঠেন, "এখনও নিশ্চয়ই সবাই আছে⋯ভালই আছে।"

"বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেন না?"

"না।"

"কোথায় থাকেন এখন?"

"শীতের চার-পাঁচ মাস সমতলের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই, বছরের বাকী সময়টা হিমালয়ে থাকি।"

"হিমালয়ের কোথায় আপনার আশ্রম?"

"আমার কোনো আশ্রম নেই, কোনো ঠিকানাও নেই। আমি ভক্তিপথের পথিক, সর্বশক্তিমানের সেবক। আমার আবার আশ্রম কেন? আমি যখন যেখানে থাকি, সেটাই আমার আশ্রম। আমি পথের মানুষ, চিরপথিক।"

সতেরো বছরের ছেলে ভগবানের ডাকে ঘর ছেড়েছে। সে ডাক আমার কানে কোনোদিন পৌঁছবে না। সেজন্য দুঃখ করি না। দুঃখ পাচ্ছি এই ভেবে, আমি যে এদের মতো করে পথকে ভালবাসতে পারলাম না!

পথিক পথের মানুষের মাঝে মিলিয়ে গেলেন। যেমন অতর্কিতে কাছে এসেছিলেন, তেমনি অতর্কিতে অদৃশ্য হলেন। বিদায় জানাবার অবকাশ পর্যন্ত পেলাম না। আর কি কোনোদিন দেখা হবে না ওর সঙ্গে?

"এবারে চল্, দু-একটা আশ্রমে ঢুকে দেখা যাক্।" কাকু বলে।

নিরঞ্জনবাবু সমর্থন করেন তাঁকে, বলেন, "কথাটা মন্দ বলেন নি কাকু। চলুন না পাশের এই আশ্রমটাতেই ঢোকা যাক, বেশ বড় আশ্রম।"

কাকু ও নিরঞ্জনবাবু আমাদের কোন চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না দিয়েই সোজাসুজি সামনের আশ্রমে প্রবেশ করেন। বাধ্য হয়ে আমরা তাঁদের অনুসরণ করি।

চারিদিকে টিন দিয়ে ঘেরা বেশ বড় আশ্রম। আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে আসি। তোরণের পরে একফালি ফাঁকা জায়গা। কয়েকটি ফুলের টব, একটি জলের ফোয়ারা ও বাঁধানো চৌবাচ্চা। দু-দিকে সারি সারি তাঁবু, মাঝখানে ত্রিপলের ছাউনির নিচে বিরাট সভামণ্ডপ ও প্রদর্শনী।

সভায় বক্তৃতা চলেছে। বলা বাহুল্য, হিন্দীতে। আমার সঙ্গীদের অনেকেই হিন্দী বুঝতে পারে না। সুতরাং চেয়ার খালি পড়ে থাকতে দেখেও আমরা আসন গ্রহণ করি না। প্রদর্শনী, মানে ঠাকুর-দেবতা মূর্তি দেখে বেরিয়ে আসি আশ্রম থেকে। এগিয়ে চলি বিশ্বশান্তি যজ্ঞমণ্ডপের দিকে।

সামনেই দেখা যাচ্ছে—বিশ্বশান্তি যজ্ঞমণ্ডপ। দেখা যাচ্ছিল ওপার থেকেই। চারিপাশের সমস্ত তাঁবু ও ছাউনির ওপরে সুবিরাট খড়ের চাল—বোল চালা

বাড়ি। এতক্ষণে আমরা তার সামনে এসেছি।

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে আসি। এখানেও তেমনি একফালি আঙিনা। কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে যজ্ঞসভা ও যজ্ঞকুণ্ডের ছবি বিক্রি করছে। দু-টাকা করে দাম। অনেকে কিনছেন। আমাদের দলের কয়েকজনও কিনে ফেললেন।

যজ্ঞসভার চারিদিকে মাইক বসানো। সারা অঞ্চলটি সর্বদা পবিত্র বেদমন্ত্রে মন্ত্রিত হচ্ছে। ভেসে আসছে ঘি ও ফুলের গন্ধ। মনটি মুহূর্তে পবিত্র হয়ে উঠল।

আমরা যজ্ঞসভার সামনে আসি। চারিদিকে লোহার উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা গোলাকার যজ্ঞভূমি, সুবিরাট এলাকা। মাঝখানে সুবিশাল প্রধান যজ্ঞকুণ্ড, আর চারিদিকে ছোট-ছোট একশ' আটটি যজ্ঞবেদী। প্রতি কুণ্ডে চন্দনকাঠের আগুন জ্বলছে, খাঁটি ঘি পুড়ছে। নামাবলী কিংবা গেরুয়া গায়ে কয়েক শ' পুরোহিত ও সন্ন্যাসী একসঙ্গে একশ' আটটি যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞ করে চলেছেন।

মানবকল্যাণ ও বিশ্বশান্তির জন্য এই যজ্ঞ হচ্ছে। একান্নজন মহাত্মা ও একশ'জন বৈদিক ব্রাহ্মণ এখানে অহোরাত্র বেদমন্ত্র পাঠ করছেন। উদ্যোক্তারা বিশ্বাস করেন—এই যজ্ঞের ফলে বিশ্বের অশান্তি দূর হবে, বিভিন্ন দেশ, জাতি ও ধর্মের মধ্যে স্থায়ীশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই এই মহাযজ্ঞের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য জগৎগুরু স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বশান্তির জন্য চেষ্টা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন —মানবসেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-সেবা। যারা দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, তারাই ভগবানের প্রকৃত সেবা করতে পারবে।

সকাল থেকে মাইকে মাইকে নিরুদ্দেশের ঘোষণা শুনেছি আর হাসাহাসি করেছি। তখন বুঝতে পারি নি শেষ পর্যন্ত আমাকেই মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সেই একই ঘোষণা করতে হবে। বিশ্বশান্তি যজ্ঞস্থল থেকে বেরিয়ে আসার পরে গুণতে গিয়ে দেখা গেল একজন কম। একটু পরে পদ্মা আবিষ্কার করল, শ্রীমতী বিদিশা আর আমাদের সঙ্গে নেই। বেশ কিছুক্ষণ ভিড় সহ্য করে তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু বিদিশার দিশা পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে পাশের আশ্রমের মাইকে এসে নিরুদ্দেশ ঘোষণা করতে হচ্ছে। প্রথমে ওঁরা হিন্দীতে বলেছেন, এখন আমি বাংলায় বলছি—বিদিশা দেবী, শ্রীমতী বিদিশা ...! আমরা এখানেই রয়েছি, আপনি ফিরে আসুন, বিশ্বশান্তি যজ্ঞসভার তোরণের সামনে চলে আসুন। বিদিশা দেবী... ।

দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু বৃথা। বিদিশার দিশা পাওয়া গেল না। অতএব বিদিশাকে বাদ দিয়ে আবার শুরু হয় আমাদের পথ-চলা।

এখন চলেছি ঘাটের দিকে—সঙ্গম ঘাট। এঘাটে আমি আগেও এসেছি। বালুময় গঙ্গাদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে পাশাপাশি কয়েকখানি খড়ের চালা। বারোমাস এখানে পাণ্ডারা সারাদিন যাত্রীদের প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। যাত্রীরা আসেন। তাঁরা স্নান করেন, শ্রাদ্ধ করেন, পূজা করেন। পাণ্ডারা পুলকিত হন।

আজ ঘাটের অন্য চেহারা। হাজার হাজার মানুষের ভিড়। শত শত মানুষ সর্বদা স্নান করছেন, কারও পাণ্ডা জুটছে। কারও জুটছে না। এখানে ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, নারী-পুরুষ বাছ-বিচার নেই। মানুষ এসেছে ত্রিবেণী তীর্থে, অবগাহন করে মোক্ষলাভ করতে।

সহসা শঙ্করী বলে ওঠে, "আজই এই, কাল কি হবে ?"

সত্যই তাই। কাল কি হবে এখানে ? প্রায় দেড় কোটি মানুষ নাকি স্নান করবেন। ভাবতেই পারছি না।

"কাল প্রচণ্ড ভিড় হবে সারাদিন।" পিসিমা বলে, "কাল পারা যাবে না। তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি চুলটা ফেলে আসি।"

"চুল ফেলে আসবে !" সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ। মৌনী অমাবস্থায় কুম্ভস্নান করব, মস্তক মুণ্ডন করতে হবে না !"

"মস্তক মুণ্ডন করবে !"

"হ্যাঁ। তাই যে করতে হয়।" পিসিমা বলে, "ঐ যে দেখ না কত মানুষ মস্তক মুণ্ডন করছে। তোরা একটু দাঁড়া এখানে, আমি ঘুরে আসছি।"

পিসিমা মস্তক-মুণ্ডন মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। আমরা তাকিয়ে থাকি সেদিকে। সত্যি দেখার মতো। ঘাটের একপাশে পথের ধারে কাঠের মঞ্চ। চার-পাঁচখানি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় ওপরে। সেখানে সারি বেঁধে নরসুন্দরের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। সারি বেঁধে বসে পুণ্যার্থীরা মস্তক মুণ্ডন করে চলেছেন। সবাইকে কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। এমন পাইকারী হারে মস্তক মুণ্ডন আমি এর আগে কোথাও দেখি নি।

পিসিমা মুণ্ডন প্রার্থীদের লাইনে দাঁড়িয়েছে। এক-একজনের মুণ্ডন শেষ হচ্ছে, সে মঞ্চের অপরদিক দিয়ে নেমে যাচ্ছে, আর এদিকের লাইন থেকে এক-একজন মঞ্চে উঠে যাচ্ছে। ওখানেও ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। সবার জন্যই এক লাইন। যার ভাগ্যে যে নরসুন্দর

পড়ছে, তাকে তার সামনে গিয়েই বসে পড়তে হচ্ছে। কয়েকজন পুলিশ দেখাশুনা করছে। দু-জন ঝাড়ুদার সবসময় চুল পরিষ্কার করছে। মঞ্চের পেছনে চুলের পাহাড় জমে উঠেছে।

পিসিমার কেশমুক্ত হতে অন্তর আধঘণ্টা সময় লাগবে। ততক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে বরং একটু ঘোরাঘুরি করে নেওয়া যাক।

এই সেই সঙ্গম—গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম। য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণে রয়েছে—দুটি নদীর সঙ্গমে যে ভূখণ্ড, তা যেমন উন্নত, তেমনি মনোরম। সারা অঞ্চলটি চমৎকার বালুময়। প্রাচীনকাল থেকে মহারাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত দেশের রাজা কিংবা ধনীদের কোনো দানযজ্ঞ করার ইচ্ছে হলেই এখানে চলে আসতেন। এটি পরম দানক্ষেত্র—Sacred Charity Enclosure.

আমরা সেই পুণ্যক্ষেত্রে পদচারণা করছি। ঋগ্বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতে এই পুণ্যভূমির উল্লেখ রয়েছে। মৎস্যপুরাণ ও পদ্মপুরাণে এই পুণ্যপ্রয়াগের তীর্থমাহাত্ম্য সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

জলের ধারে এসে দাঁড়াই। গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারা গঙ্গা। এই গঙ্গা বেয়ে আর্যসভ্যতা বাংলার বুকে পৌঁচেছে। এই গঙ্গাবারি সগরসন্তানদের উদ্ধার করেছে। এই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘট ভরে বাংলার কুলবধূ। এই গঙ্গার তীরে আমি জন্ম নিয়েছি। এই গঙ্গার উৎস আর সঙ্গম দর্শন করে তাদের কথা লিখে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। এই গঙ্গাতীরে পঞ্চভূতে মিশে যেতে পারলে আমার জন্ম সার্থক হবে। আগামীকাল মৌনী অমাবস্যার পুণ্যপ্রভাতে প্রয়াগে স্নান করে আমি মা-গঙ্গার কাছে কেবল এই কামনা জানিয়ে যাবো।

স্নানের শেষ নেই। স্নান চলেছে সবসময়। পুণ্যার্থীরা বাড়তি পুণ্য সঞ্চয় করে নিচ্ছেন। তবে মনে হচ্ছে এঁদের মধ্যে কিছু কল্পবাসীও আছেন। তাঁরা একমাস ধরে প্রতিদিন দু-বেলা গঙ্গাস্নান করছেন। এঁদের অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। এঁরা সকালে স্নান সেরে ডেরায় ফিরে দুপুর পর্যন্ত জপ-তপ করেন। তারপর কোনোরকমে চারটি চাল ফুটিয়ে সিদ্ধ-ভাত খান। বিকেলে আবার গঙ্গাস্নান করে ফেরার পথে কোনো আশ্রমে গিয়ে ধর্মকথা শ্রবণ করেন।

পুণ্যার্থীরা অবশ্য দৈনিক একবারের বেশি স্নান করেন না। কিন্তু তাঁরা অনেকেই স্নানের সময় জননী জাহ্নবীকে ফুল ও দুধ নিবেদন করছেন। কেউ কেউ স্নানশেষে ব্রাহ্মণদের বস্ত্র দান করছেন।

আর্যসভ্যতার আদিযুগ থেকেই প্রয়াগে স্নান করা অতিশয় পুণ্যকর্ম রূপে সমাদৃত। কিন্তু সে যুগের স্বীকৃত ইতিহাস নেই আমাদের। প্রয়াগ-স্নান

সম্পর্কে প্রাচীনতম ইতিহাস চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙের বিবরণ। আগেই বলেছি, মহারাজা হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণে তিনি ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে এসে সেই স্নান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেকালে এখানে জীবন উৎসর্গ করাও বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। অনেকে তা-ও করতেন। য়ুয়ান চোয়াঙ তাঁর বিবরণে বলেছেন—'...at the confluence of the two rivers, every bay there are many hundreds of men who bathe themselves and die. The people of the country consider that whoever wishes to be born in heaven ought to fast to a grain of rice and then drown himself in the waters. For bathing in this water, they say, all the pollution of sin is washed away and destroyed , therefore from various quarters and distant regions people come together and rest, During seven days they abstain from food and afterwards end their lives.*

ফিরে আসি মস্তক-মুণ্ডন মঞ্চের কাছে। কিন্তু কোথায় পিসী? লাইনে নেই, মঞ্চে নেই, পথেও নেই। সে বোধকরি ইতিমধ্যে কেশমুক্তা হয়েছে। কিন্তু তার যে এখানেই অপেক্ষা করার কথা ছিল। তবে কি মঞ্চ থেকে নেমে এসে আমাদের না দেখে ভেবেছে—আমরা চলে গিয়েছি। একথা সে ভাবল কেমন করে? কিন্তু সে কি একা-একা শিবিরে ফিরতে পারবে?

"তা পারবেন।" শঙ্করী আশ্বাস দেয়। বলে, "কিছুক্ষণ আগেও আমার সঙ্গে পিসিমার কথা হয়েছে, হারিয়ে গেলে আমরা পুলিশের কাছে পথ জেনে নিয়ে সোজা ভারত সেবাশ্রম সংঘে চলে যাবো।"

তাই যেন যান। মা-গঙ্গার কৃপায় পিসী যেন নিরাপদে শিবিরে ফিরে যেতে পারেন।

"পিসীমা প্রয়াগে নূতন নন।" সেজদি যোগ করেন, "তিনি মাঘীমেলায় এসেছেন এবং চমৎকার হিন্দী বলতে পারেন।"

কথাটা ঠিকই বলেছেন সেজদি। কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে আমরা ফিরে চলি শিবিরের দিকে। রাত আটটা বাজে। তার মানে পাঁচঘণ্টার ওপর ঘোরাঘুরি করছি। সবাই শ্রান্ত। এখান থেকে শিবির দু-কিলোমিটার। পথে যা ভিড়, তাতে ঘণ্টাখানেক তো লাগবেই।

* অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Samuel Beal ('Buddhist Records of the Western World').

দেখতে দেখতে পথ চলেছি। দেখার মতই বটে। পথের পাশে যেমন যাত্রীদের জটলা, তেমনি সাধুদের। কোথাও কালো আলখাল্লা পরা উদাসী, কোথাও নামাবলী গায়ে বৈষ্ণব, কোথাও বা নাগা সন্ন্যাসীদের আড্ডা। কেউ উপদেশ দিচ্ছেন, কেউ কীর্তন করছেন, কেউবা মৌনী হয়ে আগুনের সামনে বসে রয়েছেন।

সাধুদের কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলেছি। সাধারণত সাধুরা কিন্তু বেশ আড্ডাবাজ। আর সে আড্ডা কেবল নিজেদের মধ্যে নয়। অপরিচিত মানুষকে সাধুরা প্রথমে পাত্তা দিতে চান না। কিন্তু কেউ যদি তাঁদের প্রাথমিক উপেক্ষাটা হজম করে আন্তরিকভাবে তাঁদের সঙ্গে মিশতে চান, তাহলে তাঁর সাধুসঙ্গ ভাল লাগবে। সাধুরা যেমন সেবা পেতে ভালবাসেন, তেমনি তাঁরা সেবা করতে পারেন। সাধুরা যেমন খেতে পারেন, তেমনি খাওয়াতে ভালবাসেন। সাধুরা খুব তাড়াতাড়ি মানুষকে আপন করে নিতে পারেন।

আমার কাছে অবশ্য সাধুদের যে-দুটি গুণ সব'চয়ে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে, তা হলো—সহ্যশক্তি ও মেধা। আমি হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলে অনেক সাধুকে দিনের পর দিন অনাহারে থেকে নগ্নদেহে নগ্নপদে পদচারণা করতে দেখেছি। দেখেছি বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে। আমার ধারণা কেবল কঠোর ব্রহ্মচর্য ও যোগবলের সাহায্যেই এই অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করা সম্ভব।

দু-একজায়গায় দেখেছি সাধুরা জটলা পাকিয়ে পালা করে গঞ্জিকা সেবন করছেন। তাঁদের সঙ্গে দু'চারজন যাত্রীও জুটে গিয়েছেন। ভালই করেছেন—সাধুসেবা এবং শীত তাড়ানো দুটোই একসঙ্গে চলেছে।

ভিড় ঠেলা ছাড়া পথ চলতে অন্য কোনো কষ্ট নেই। নানা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে পথ চলেছি। রাত হলেও সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুম্ভমেলার দিনরাতের ফারাক নেই। সারা মেলা উজ্জ্বল আলোয় আলোময়। এবং লোডশেডিং-য়ের সম্ভাবনা নেই।

কাঠিয়াবাবার আশ্রম পেরিয়ে এলাম। আমার রাজস্থান পরিক্রমার সঙ্গী মোহিত সরকার সস্ত্রীক এখানে উঠেছেন। পরে খোঁজ করতে হবে।*

পথের পাশে একজন সাধুর আস্তানার সামনে বেশ ভিড়। জনৈক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শুয়ে আছেন। জনৈকা যুবতী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সন্ন্যাসী বোধকরি অসুস্থ। তবু ভক্তদের দর্শন দেবার জন্য এই ঠাণ্ডায় খোলা বারান্দায় শুয়ে আছেন।

---

* লেখকের 'রাজভূমি রাজস্থান' এবং 'দ্বারকা ও প্রভাসে' বই দু'খানি দ্রষ্টব্য।

হাতজোড় করে প্রণাম করি। ঠাকুরমা ও মাসিমা প্রণামীর বাক্সে দুটি টাকা পুরে দিলেন।

ভেতর থেকে একটি শিষ্যা একটা বাটিতে করে জল নিয়ে এলেন। সন্ন্যাসী জলটুকু নিঃশেষে পান করে আবার চোখ বুজলেন।

"ইনি কে?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

আমারও একই প্রশ্ন। কিন্তু কেউ সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। সবাই আমাদের মতো, ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

কয়েক পা হেঁটে পুলের গোড়ায় পৌছন গেল কিন্তু পার হওয়া গেল না। এটি সঙ্গম থেকে গঙ্গাদ্বীপে আসার পুল, ফিরে যাবার নয়। পরের পুলটি দিয়ে আমাদের ওপারে যেতে হবে। অতএব উত্তরে এগিয়ে চলি।

শুধু শীত আর শীতল বাতাস নয়, বেশ কুয়াশা পড়েছে। দূরের মানুষগুলোকে ঝাপসা মনে হচ্ছে। আমরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। বলা বাহুল্য, পথের মাঝখান দিয়ে চলতে হচ্ছে। পথের দু-দিকটাই যাত্রীদের দখলে। কেউ কাপড় কিংবা এ্যাল্‌কাথিন শীট টাঙিয়ে বেশ ভাল বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন, কেউবা কেবল সতরঞ্চি কিংবা চট বিছিয়ে নিয়েছেন। কাঁথা কম্বল চাদর যার যা আছে, তাই গায়ে দিয়ে মুক্ত আকাশতলে বেশ বহাল তবিয়তে বসে রয়েছেন।

এদের মধ্যে বহু সচ্ছল পরিবার রয়েছেন। একটি সুন্দরী বউ কয়েক মাসের ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে। পাশে শাশুড়ী কিংবা মা। স্বামীটি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে এক কোণে। গায়ের জামা-কাপড় বেশ দামী, কিন্তু সঙ্গে লেপ-তোষক নেই। বোধকরি হোটেলে উঠবে ভেবে এলাহাবাদ এসেছিলেন। ঠাঁই না পেয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। কাল সকালে স্নান সেরে ফিরে যাবেন। কিন্তু আজ রাতটা ওঁরা ঐ শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখবেন কেমন করে?

না, ওঁদের বাঁচাতে হবে না। মা-গঙ্গাই বাঁচিয়ে রাখবেন এই অবোধ শিশুটিকে।

এগিয়ে চলি। আরেকটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। বেশ বড় পরিবার, সব মিলিয়ে দশ-বারোজন। তবে সঙ্গে শিশু নেই, আছে দুটি আধুনিকা। তারা তাস খেলছে সবার সঙ্গে।. এদের বিছানাপত্র অনেক উন্নত। তোষক নেই, তবে লেপ-কম্বল রয়েছে। পথের ওপর কম্বল পেতে লেপ গায়ে দিয়ে তাস খেলছে কিংবা প্রভাতের প্রতীক্ষা করছে—মৌনী অমাবস্যার পুণ্যপ্রভাত।

"শঙ্কুদা! সুধাংশুরা কোথায় গেল?" দাদুর চিৎকারে পেছন ফিরি।

তাই তো! সামনে-পেছনে কোথাও যে ওদের দেখতে পাচ্ছি না। ওরা মানে চারজন—সুধাংশু, মনোরঞ্জন, কানাই ও নিরঞ্জনবাবু। তাহলে কি ওরাও হারিয়ে গেল!

"ওঁরা বলবেন, আমরা হারিয়ে গিয়েছি।" শঙ্করী সহাস্যে বলে।

কথাটা মিথ্যে নয়, পনেরোজনের ছ'জন হারিয়েছে, আর দু-জন হারালে যে আমরাই 'মাইনরিটি' হয়ে যাবো।

"ওঁরা নিশ্চয়ই শিবিরে ফিরে যেতে পারবেন?" পদ্মা প্রশ্ন করে।

আমি মাথা নাড়ি। পদ্মা আবার বলে, "তাহলে চলো ভাইপো! যা ভিড়! এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে, আবার কেউ হারিয়ে যাবো।"

অতএব সারি বেঁধে ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি।

কয়েক মিনিট বাদে পুল পেরিয়ে এপারে এলাম।

পৌঁছলাম সঙ্গম মার্গে। এপথের পাশেও বহুযাত্রী ঠাঁই নিয়েছেন খোলা আকাশের নিচে। তাহলেও পথটি প্রশস্ততর। পথ-চলা সহজ। অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি। আমরা মেলা দেখে মেলার মানুষের ভিড় ঠেলে ফিরে চলেছি মেলার আস্তানায়—কুম্ভমেলা থেকে কুম্ভমেলায়।

## ছয়

'মাঘ মাসের হাড়কঁপানো শীত। জনৈক পুণ্যার্থী প্রয়াগে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। বাঁ-হাত দিয়ে সে শক্ত করে একটা বাছুরের লেজ ধরে রয়েছে আর তার ডান হাতে পাণ্ডাকে দেবার জন্য দক্ষিণার পয়সা। পাণ্ডাজী তাঁকে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন।

'একসময় মন্ত্রপাঠ শেষ হলো। পুণ্যার্থী পাণ্ডাজীর হাতে দক্ষিণার পয়সা তুলে দিল। সবটাই তাঁর নয়। এর থেকে কয়েকটি পয়সা তাঁকে দিতে হবে বাছুরের মালিককে—চতুষ্পদটির ভাড়া বাবদ। অথবা পুণ্যার্থীর পূর্বপুরুষদের বৈতরণী পারের কড়ি। তারপরে পুণ্যার্থী আরেকটি পয়সা ধরে দিল পাণ্ডাজীর হাতে। পাণ্ডাজী সে পয়সাটি দিলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন ব্রাহ্মণকে। তিনি পাতালপুরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

'পশ্চিমী শীত ও হাওয়ার দাপটে এ-বছর কুম্ভমেলার সাড়ে ছ' হাজার তীর্থযাত্রী খুবই অসুবিধেয় পড়েছেন। এবার কুম্ভমেলায় খরচের বাজেট ১৩,৭৪২ টাকা। টোল-ট্যাক্স থেকে এত টাকা উঠবে না। সরকার ঘাটতি পূরণ করবেন। তীর্থযাত্রী সাড়ে ছ'হাজার কিন্তু বৈরাগী এসেছেন বত্রিশ হাজার। তাছাড়া রয়েছেন বিভিন্ন আখড়ার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুগণ—নির্বাণী, নির্মোহী ও দিগম্বরী প্রভৃতি।

'মাঝে মাঝেই এক আখড়ার সঙ্গে অন্য আখড়ার ঝগড়া বেধে যায়। গত-বারের কুম্ভমেলায় এই ঝগড়া থামাতে এক স্কোয়াড্রন সৈন্য ডাকার দরকার পড়েছিল। তাই মেলায় যেমন হরেক রকমের দোকান বসেছে, যাত্রী ও সাধুদের হাজার হাজার ছাউনি পড়েছে, তেমনি থানা করতে হয়েছে। বাসন-পত্র, মূর্তি, রঙীন টুপি, গয়নাগাটি ও ধর্মগ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে বেচা-কেনা চলেছে। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশ থেকে যাত্রীরা মেলায় এসেছেন।

'এবারে গঙ্গায় প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়ায় সঙ্গমে যাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে। কুম্ভ-ভক্তদের বলে কল্পবাসী। তাঁরা প্রতিদিন সঙ্গমে স্নান করেন, সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যার পর স্বপাক আহার করেন।

'দক্ষিণ ভারতের ভক্তযাত্রীরা অনেকেই মস্তক মুণ্ডন করেছেন। মেলায় বহু নরসুন্দর এসেছে।

'আখড়াগুলির মধ্যেও আবার ছোট-বড় আছে। সব আখড়ার কৌলিন্য সমান নয়। তাই প্রয়োগের কুম্ভমেলায় নির্বাণী আখড়ার নাগা সন্ন্যাসীরা স্নানের শোভাযাত্রায় প্রথমে থাকেন। এঁরা সবাই শিবভক্ত। এঁদের প্রত্যেকের মাথায় জটা এবং কেউ জামা-কাপড় পরেন না। এঁরা কিন্তু কখনও ভিক্ষে করেন না।…'

"কিরে কথা বলছিস না কেন? কী ভাবছিস?"

কাকুর কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। রাতের খাওয়া শেষ করে আমরা আবার মেলা দেখতে বেরিয়েছি। আমরা মানে আমি, কাকু ও সুধাংশুরা। মেয়েরা কেউ আসে নি সঙ্গে।

না, কথাটা বোধহয় বলা ঠিক হলো না। পিসিমা, পদ্মা, সেজদি ও শঙ্করী আসতে চেয়েছিল। কেনই বা চাইবে না! কুম্ভমেলায় কি দিন-রাতের পার্থক্য আছে? তাহলেও আমরা ওদের সঙ্গে আনি নি। একে ওরা সবাই শ্রান্ত, তার ওপরে হারিয়ে যাবার ভয়। তখন অবশ্য যারা হারিয়ে গিয়েছিল, সবাই ঠিকমত শিবিরে ফিরে এসেছে। কিন্তু তখন ছিল সন্ধ্যেবেলা। এত রাত্রে

হারিয়ে গেলে হাঙ্গামা আরও বেশি হবে। তাই এখন আর মেয়েদের সঙ্গে আনি নি।

আমরা গভীর রাতের মেলা দেখতে বেরিয়েছি। তবু আমি এতক্ষণ ঠিক মেলা দেখি নি মেলার কথা ভাবছিলাম মনে মনে। আজকের মেলা নয়, আজ থেকে একশ' সাত বছর আগে প্রয়াগে অনুষ্ঠিত আর এক কুম্ভমেলার কথা।

সেই কথাই বলি কাকুকে, "১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ই. এল. ব্রাউন নামে একজন ইংরেজ সাংবাদিক প্রয়াগের কুম্ভমেলায় এসেছিলেন। তাঁরই বিবরণের কথা এতক্ষণ ভাবছিলাম মনে মনে।"

"তা ভাবনা চিন্তার পরে কি সাব্যস্ত করলেন ?" দাদু জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর দিই, "কুম্ভমেলা এখন তার চেয়ে হাজার গুণ বড় এবং লক্ষ গুণ ব্যয়-বহুল ও আধুনিক হলেও, মেলার মূল-প্রকৃতি মোটামুটি একই রয়ে গিয়েছে।

রাত দশটা। বেশ জোরে বাতাস বইছে, খুবই ঠাণ্ডা পড়েছে। কিন্তু কুম্ভনগরের কর্মব্যস্ততা কমে নি কিছুমাত্র, ভাটা পড়ে নি মানুষের জোয়ারে। মানুষ আসছে তো আসছেই।

আর কেনই বা আসবে না! এখানে যে দিনরাতের তফাৎ নেই। চারিদিকে শুধু আলো আর আলো। অমবস্যার রাতেও দিনের মতো আলোময় পথ।

কেবল পথ নয়, জেগে রয়েছে পথের পাশের আখড়া ও আশ্রম। মাইকে তারা পাঠ ও ভজনের সঙ্গে উপদেশ বিতরণ করে চলেছেন।

শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে পথ চলেছি—কুম্ভনগরের পথ। চলতে চলতে থামতে হলো। পাশের আশ্রমের সামনে খুব ভিড়। ব্যাপার কি ? তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকি। দেখতে পাই—রামলীলা হচ্ছে। তিনটি কিশোর বালক রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সেজেছে। তারা নেচে নেচে গান গাইছে।

কিছুক্ষণ রামলীলা দেখে বেরিয়ে আসি বাইরে। আবার এগিয়ে চলি। আরেক আশ্রমে মহাকবি তুলসীদাসের রামচরিত মানস পাঠ চলেছে। পাঠক সুর করে পড়ছেন। গলাটি মিষ্টি। শুনতে ভালই লাগছে। কিন্তু আমরা থেমে থাকি না। শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি।

এবার কীর্তনের শব্দ—

"ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ
ভজ গোবিন্দ, কি নাম রে।

গোবিন্দ কা নাম বিনা তেরা
কোই না আওয়ে কামরে ॥…”

বুঝতে পারছি, এটি গৌরীয় বৈষ্ণবদের আখড়া এবং কীর্তনীয়ারা বাঙালী। তাঁরা বাংলা গানকে হিন্দী করে গাইছেন কারণ কুম্ভমেলার স্বীকৃত ভাষা হিন্দী।

কানাই জিজ্ঞেস করে, “কি দাদু! গিয়ে বসবেন নাকি একবার ?”

“রক্ষে করো বাপু! গোবিন্দ আমার মাথায় থাকুন।” দাদু চলার বেগ বাড়াতে চান।

পেছন থেকে মনোরঞ্জন তাঁর একখানি হাত ধরে ফেলে। দাদুকে মনে করিয়ে দেয়, “কেত্তন শুনলে কিন্তু শীত কমে যায়।

“আমার শীত করছে না।”

দাদুর কণ্ঠস্বর শুনে ও ভঙ্গি দেখে হাসি সামলাতে পারি না। অতএব প্রবল হাস্যরোল।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা রেলপুলের তলায় এসেছি। এদিকে দোকান-পাট নেই। আখড়া আশ্রমের সংখ্যা কম। সবই যাত্রীদের তাঁবু। কাজেই মাইকের অত্যাচার কম।

তাই বলে পথ নীরব নয়। বন্যার জলের মতো মানুষ আসছে—বিভিন্ন পোশাকের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষ। কেউ সন্ন্যাসী কেউ সংসারী, কেউবা ভবঘুরে। কেউ ধনী, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউবা দরিদ্র। কিন্তু প্রত্যেকের হাঁটা-চলা ও কথা-বার্তায় যেন খুশি উপচে পড়ছে। তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত কুম্ভমেলায় এসে পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁরা অমৃত লাভ করতে পারবেন। তাঁরা ভাগ্যবান।

“দেখুন, দেখুন শঙ্কুদা!

সুধাংশুর ডাকে তাড়াতাড়ি ফিরে তাকাই। সত্যি অভিনব। একজন মধ্যবয়সী সাধু সাইকেলে চড়ে সঙ্গমের দিকে চলেছেন। তাঁর মুখে দাড়ি, মাথায় জটা, গায়ে গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ঘড়ি পায়ে চপ্পল। তাঁর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে হাঁড়ি কলসী ও কমণ্ডলু ঝুলছে, ফ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে কম্বল জামা-কাপড় তেলের টিন ছাতা ও একটা ত্রিশূল বাঁধা আর ক্যারিয়ারে ত্রিপল স্টোভ ও বেশ বড় বেতের ঝুড়ি। ঝুড়িতে বোধকরি চাল-ডাল আটা-চিনি মসলাপাতি ও তরি-তরকারি ইত্যাদি রয়েছে। অর্থাৎ একখানি সাইকেলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিবির চলেছে।

আমাদের দিকে একটু হেসে সাধুজী সাইকেল চালিয়ে চলে গেলেন।

আমরা তবু তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে। তিনি মেলার মানুষের মাঝে মিশে গেলেন। আমরা আবার চলা শুরু করি।

"কিন্তু মেলার ভেতরে তো সাইকেল নিয়ে আসতে দেয় না।" মনোরঞ্জন বলে।

আমি বলি, "সাধারণ যাত্রীদের দেয় না কিন্তু সাধুদের দেয়। দেখলে না প্রায় প্রতি আখড়ায় একাধিক গাড়ি রয়েছে। কুম্ভমেলা সাধুদের মেলা, তাঁদের জন্য সব নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।"

'তাছাড়া এই সাধুজীকে সাইকেল নিয়ে না-আসতে দিলে তো কর্তৃপক্ষকে কুলি করে তাঁর জিনিসপত্র মেলায় পৌঁছে দিতে হতো।" সুধাংশু যোগ করে। একবার থেমে সে কাকুকে জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, এই সাধুবাবার কি নাম রাখা যেতে পারে?"

কাকু সঙ্গে উত্তর দেয়, "সৌখিন সাইকেল-সাধু।"

সমবেত হাস্যরোল।

আমরা ধীরে ধীরে পায়চারি করছি। দেখতে দেখতে পথ চলেছি। হঠাৎ দাদু জিজ্ঞেস করেন, "এই যে সব লক্ষ লক্ষ সাধু মেলায় এসেছেন ও আসছেন, এঁদের মধ্যে অনেকেই তো পাহাড়ে-জঙ্গলে বাস করেন। সে সব জায়গার সঙ্গে সভ্যজগতের কোন সম্পর্ক নেই। সেখানে সংবাদপত্র প্রবেশ করে না, পঞ্জিকা পাওয়া যায় না। তাহলে এঁরা কেমন করে জানতে পারেন, কবে কোথায় কুম্ভমেলা হচ্ছে? কে তাঁদের বলে দেন সে কথা?"

"কেউ বলেন না।" কাকু উত্তর দেয়, "এঁরা নিজেরাই আসেন, কারও আমন্ত্রণের অপেক্ষা করেন না।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু এঁরা কুম্ভমেলার তারিখ ও জায়গা জানতে পারেন কেমন করে?" এবারে নিরঞ্জনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

কাকু উত্তর দেয়, সভ্যজগতের বাইরে যেসব মহাত্মারা আসন পাতেন, তাঁরা শুধু যোগী নন, সুপণ্ডিতও বটে। তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই জ্যোতির্বিদ্যা জানেন। তাঁরা গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ বুঝতে পারেন। আমাদের হিন্দু সমাজের উৎসবাদি সবই তো অঙ্কের হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই যোগী সন্ন্যাসীরা যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে কুম্ভস্নানে অংশ নেন।"

"আশ্চর্য!"

"তা একটু আশ্চর্য বৈকি। কিন্তু এই আশ্চর্য ঘটনাটি যুগ যুগ ধরে নিয়মিত ঘটে চলেছে!"

কেউ কোনো কথা বলছে না। সবাই বোধকরি আশ্চর্য ঘটনাটির কথা ভাবছে। আমরা ভাবতে ভাবতে পথ চলেছি।

"আমাদের কিন্তু ত্যাগীবাবার আশ্রমটি দেখা হলো না আজ!" নিরঞ্জনবাবু নীরবতা ভঙ্গ করেন। কথাটা হঠাৎ মনে পড়েছে তাঁর।

তাঁকে আশ্বাস, দিই, "আগামীকাল সুবিধে মতো বাবাকে দর্শন করা যাবে।"

"ত্যাগীবাবা কে শঙ্কুদা?" সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

নিরঞ্জনবাবু বলেন, "মোহন্ত সর্বেশ্বর দাস ত্যাগীজী। এই নিয়ে তিনি পঞ্চমবার প্রয়াগের পূর্ণ-কুম্ভমেলায় যোগ দিলেন। ষাট বছর আগে সত্তেরো বছর বয়সে এই প্রয়াগের কুম্ভমেলাতেই তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই আগামীকাল তাঁর আশ্রমে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছেন।..."

"তার মানে ত্যাগীবাবার দীক্ষা গ্রহণের হীরক-জয়ন্তী উৎসব পালিত হচ্ছে।" মাঝখান থেকে মনোরঞ্জন মন্তব্য করে।

একটু হেসে নিরঞ্জনবাবু বলেন, "তা বলতে পারো।" একবার থেমে তিনি আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন, "ত্যাগীবাবা জাতিভেদের বিপক্ষে। তাই তাঁর আশ্রমে কোনো জাতিভেদ নেই। বাবা কয়েকটি অনাথশিশুকে প্রতিপালন করেন। মথুরায় তাঁর একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে।" আবার থামেন নিরঞ্জনবাবু। বলেন, "তাই বলে ভেবো না ত্যাগীবাবা কেবল সাধন-ভজন ও সমাজসেবা নিয়েই থাকেন। তিনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। ১৯৭২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছেন। ১৯৫৫ সালে গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে পর্তুগীজদের গুলি খেয়েছেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন।" থামলেন নিরঞ্জনবাবু।

সবাই নীরব রয়েছে। বোধকরি ত্যাগীবাবার কর্মময় মহাজীবনের কথা ভাবছে। আমিও নিঃশব্দে হাঁটতে থাকি।

একটু বাদে সুধাংশু আমাকে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, ত্যাগীবাবা কি গত ষাট বছরে প্রয়াগেই পাঁচটি কুম্ভমেলায় যোগ দিলেন?"

"তাই তো দেবেন!" উত্তর দিই, "বারো বছর বাদে বাদে হরিদ্বার প্রয়াগ নাসিক ও উজ্জয়িনীতে পূর্ণকুম্ভ হয়। তার মানে এটি নিয়ে গত ষাট বছরে এখানেই পাঁচটি পূর্ণ-কুম্ভমেলা হলো।"

"আর অর্ধকুম্ভ?" -দাদু জিজ্ঞেস করেন।

"প্রতি তিন বছর অন্তর হরিদ্বার ও প্রয়াগে পালা করে অর্ধকুম্ভ হয়। যেমন ১৯৮০ সালে হরিদ্বারে অর্ধকুম্ভ হবে আবার সে বছরেই উজ্জয়িনীতে

হবে পূর্ণকুম্ভ। আর ১৯৮২ সালে এখানেই অনুষ্ঠিত হবে অর্ধকুম্ভ।"

"তার মানে প্রতি তিন বছর বাদে একটি অর্ধ ও একটি পূর্ণকুম্ভের মেলা বসে ?

"না, সবসময় তা হয় না। যেমন ছ' বছর বাদে এখানে অর্ধকুম্ভ হবে কিন্তু বারো বছর বাদে হবে পূর্ণকুম্ভ। সে বছর আর অর্ধকুম্ভ হবে না। একই বছরে হরিদ্বারে কিংবা প্রয়াগে অর্ধ ও পূর্ণকুম্ভের পালা পড়লে কেবল পূর্ণকুম্ভ হয়, অর্ধকুম্ভ হয় না। আর বারো বছর বাদে বাদে নাসিক ও উজ্জয়নীতে কেবল পূর্ণকুম্ভ হয়।"

"আচ্ছা, হরিদ্বারে তো ব্রহ্মকুণ্ডে কুম্ভস্নান হয় ? দাদু জিজ্ঞেস করেন।

আমি মাথা নাড়ি।

দাদু আবার বলেন, "কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে তো জায়গা বড়ই কম, মেলা বসে কোথায় ?"

"এপারে বাড়ি-ঘর ভেঙে ব্রহ্মকুণ্ডের সামনে রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে। নূতন নূতন ঘাটও তৈরী করা হচ্ছে গঙ্গার দুটি ধারার তীরে তীরে। কিন্তু এসব শুধুই স্নানের সুবিধার জন্য। মেলা বসে ওপারে। কম্বল পুলের ওপারে মহাত্মা গান্ধী মার্গ থেকে একটা নূতন হাইওয়ে তৈরি করা হচ্ছে ব্রহ্মকুণ্ডের ওপার অর্থাৎ গঙ্গার বাঁ-তীর দিয়ে। সেই পথটি হৃষিকেশ রোডের সঙ্গে যুক্ত হবে।"

"কিন্তু হৃষিকেশের পথ তো গঙ্গার ডান তীরে দিয়ে ?" নিরঞ্জনবাবু বিস্মিত।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ। প্রতিরক্ষা দপ্তর অস্থায়ী বোট-ব্রিজ তৈরি করে দেবেন গঙ্গার ওপর দিয়ে। যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম, সেই নির্মিয়মান উঁচু-পথের দু'পাশে সুবিশাল প্রান্তরে ১৯৮০ সালের মার্চ-এপ্রিলে হরিদ্বারের অর্ধ-কুম্ভমেলা বসবে। এই মেলার হাঙ্গামা মিটলেই হরিদ্বারে কাজ শুরু হয়ে যাবে।"

আমি চুপ করি। আর কেউ কোনো কথা বলে না। আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলি। কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে কানাই নীরবতা ভঙ্গ করে। বলে, "একটি উল্লেখযোগ্য আশ্রম আজ দেখা হয় নি আমাদের।"

"কোন আশ্রম ?" দাদু জিজ্ঞেস করেন !

কানাই উত্তর দেয়, "ইস্কন্—ইণ্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কন্‌শাসনেস, অর্থাৎ আমেরিকান বৈষ্ণবদের আশ্রম।"

"কাল দেখব।" আমি কানাইকে একই আশ্বাস দিই।

"কিন্তু তুমি আবার হঠাৎ এখানে ওদের আশ্রম দেখার জন্য এত উৎসাহী হয়ে উঠলে কেন ? শুনেছি এবার কুম্ভমেলায় এরকম ছ' শ' সাতটি আশ্রম

হয়েছে। মহর্ষি মহেশ যোগীর যোগাশ্রম নাকি এখানে সবচেয়ে দর্শনীয়। পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে সেই আশ্রম করা হয়েছে। তাছাড়া তুমি কলকাতায় ইস্কনের আশ্রম দেখো নি ?"

"দেখেছি! কেবল কলকাতায় কেন মায়াপুরেও দেখেছি। তবু দেখতে চাইছি। এখানে ওঁদের আশ্রমে শুনেছি আমেরিকা থেকে বহু সাহেব-মেম বৈষ্ণব এসেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, প্রয়াগে স্নান করলে মোক্ষলাভ হয় কারণ স্বয়ং মহাপ্রভু এখানে অবগাহন করেছেন।"

সত্যিই বিস্ময়কর! মনে মনে প্রণাম করি ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী মহারাজকে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ষড়গোস্বামীকে প্রেমধর্ম প্রচারের পবিত্র কর্তব্য প্রদান করেছিলেন। স্বামী মহারাজ তাঁদের সুযোগ্য উত্তরসাধক। প্রেমধর্মের পুণ্যপ্লাবনে এখন য়ুরোপ-আমেরিকা প্রায় প্লাবিত।

নানা কথা ভাবছি, নানা আলোচনা করছি, কিন্তু পথ-চলার ইতি টানছি না। হাঁটছি আর হাঁটছি। আমরা গভীর রাতে কুম্ভনগরের পথে পথে পদচারণা করছি, আলো-ঝলমল কুম্ভমেলা দেখছি। সেই সঙ্গে বুঝতে পারছি —কুম্ভমেলা কখনও ঘুমায় না। সে অতন্দ্র।

পৌষ-পূর্ণিমার পুণ্যপ্রভাতে প্রয়াগে কুম্ভস্নান শুরু হয়েছে। সেই থেকে এই পনেরো দিন প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে এখানে মানুষ স্নান করেছেন। স্নান চলবে আরও পনেরো দিন, মাঘী পূর্ণিমা পর্যন্ত।

কিন্তু সব স্নানের সেরা স্নান মৌনী অমাবস্যায়। আর মাত্র ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যে শতাব্দীর সেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্নান শুরু হতে চলেছে। সন্ন্যাসীরা স্নান করবেন ব্রাহ্মমুহূর্তে। তাঁদের শোভাযাত্রা বের হবার আগেই অনেকে স্নান সেরে নিতে চান। ভিড় এড়াবার জন্য কুণ্ডু ট্রাভেল্‌স সেই ব্যবস্থাই করেছেন। কিছুক্ষণ আগে মিসেস মণ্ডল তাঁবুতে এসে বলে গিয়েছেন—"যাঁরা আমাদের সঙ্গে স্নান করতে যেতে চান, তাঁরা রাত ঠিক একটার সময় শিবিরের সামনে চলে আসবেন। আমি আপনাদের সঙ্গমে নিয়ে যাবো। ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের সাহায্য করবেন।"

অনেকে আঁতকে উঠে প্রশ্ন করেছেন—"রাত একটায় বেরুতে হবে ?"

মিসেস মণ্ডল মৃদু হেসে বলেছেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। সাধুদের শোভাযাত্রা বের হলেই ভিড় লেগে যাবে, ভারত সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকেরাও তখন আর আমাদের সাহায্য করতে পারবেন না।"

আমরা কিন্তু মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে যাচ্ছি না। কাল সকালে স্নান করলেও

যখন চলতে পারে, তখন কেন আর এই শীতের রাতে হাঙ্গামা করা? সকালে ভিড় হবে, তা হোক্ গে। আমি তো আর পুণ্যসঞ্চয় করতে আসি নি! আমি এসেছি, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ভারতের শাশ্বত সনাতন আত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে। অমৃতময় মানুষের সান্নিধ্যই শুধু আমাকে অমৃত দান করতে পারে।

তাই আমরা কাল সকালেই সঙ্গমে যাবো। আমার ভিড়ই ভাল। আমি এসেছি মানুষ দেখতে, মানুষের মুক্তিস্নান দেখতে— মিলনমেলা দেখতে।

কিন্তু এসব তো আগামীকালের কথা। অতএব আজ আর স্নানের কথা নয়, তার চেয়ে বরং অতন্দ্র-কুম্ভকে দেখা যাক। নিদ্রাহীন-তন্দ্রাহীন শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন কুম্ভনগরের পথে পথে পদচারণা করছি। কেবল মুখর পথ নয়, মুখরতা সর্বত্র। পথের পাশে তাঁবুতে তাঁবুতে সাধন-ভজন পাঠ-কীর্তন যাগ-যজ্ঞ সমানে চলেছে। দোকানে-দোকানে হয়তো বা কেনাকাটাও চলেছে। এখানে তা বোঝার উপায় নেই। এখানে যে দোকানপাট নেই। তবে মেলার আয়তনের তুলনায় কুম্ভমেলায় দোকানের সংখ্যা বড়ই কম। কুম্ভমেলা কেনাকাটার মেলা নয়। কুম্ভমেলা সাধুদের মেলা, স্নানের মেলা, অমৃতপ্রাপ্তির মেলা। বেশি দোকান বসলে কুম্ভমেলা তার আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে বলে, কর্তৃপক্ষ মেলার বাইরে এগ্‌জিবিশনের ব্যবস্থা করেছেন, মেলার ভেতরে বেশি দোকান বসতে দেন নি। তাছাড়া মেলায় স্টল ভাড়া ও ট্রেড্-ট্যাক্স্ অত্যন্ত বেশি। সাধারণ দোকানীদের পক্ষে এ মেলায় দোকান দেওয়া কষ্টকর।

আশ্রম এবং আখড়ার মাইকগুলোর মতো মেলার মাইকও রয়েছে জেগে। নিখোঁজ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে স্নান সম্পর্কে নানা নির্দেশ ঘোষণা করা হচ্ছে। এইসব নির্দেশ আসছে মেলার কন্ট্রোল-রুম থেকে। তিন শ' কর্মী পালা করে সেখানে দিন-রাত কাজ করে চলেছেন। একটি চারতালা বাড়িতে এই কন্ট্রোল-রুম করা হয়েছে। বাড়িটির ষাট ফুট উঁচু ছাদের ওপরে এক শ' ষোলটি ওয়ারলেস পোস্ট রয়েছে। সঙ্গম সহ মেলার বিভিন্ন অংশে এক শ' ত্রিশটি প্রহরী-মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। সেগুলি থেকে সর্বদা কন্ট্রোল-রুমে ওয়্যারলেস পোস্টগুলিতে খবর আসছে। টেলিভিশনে ছবি আসছে কন্ট্রোল-রুমে। একজন এ্যাডিশনাল এস. পি সেখান থেকে মেলায় কর্মরত পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। আর একজন স্পেশাল এস. পি. সর্বদা সারা মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন দল-বল নিয়ে। তিনি কখনো গাড়িতে, কখনো ঘোড়ায়, কখনো বা পায়ে হেঁটে ঘুরছেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন কর্মীরা কন্ট্রোল-

রুমের নির্দেশ মানছেন কিনা। কর্তৃপক্ষ বলেন—সঙ্গমের পুলিশমঞ্চ হচ্ছে মেলার হৃদপিণ্ড আর কণ্ট্রোলরুম হচ্ছে মস্তিষ্ক—এই দুয়ে মিলে মেলা পরিচালিত।

"রাত এগারোটা বেজে গিয়েছে, এবার চল্ ফেরা যাক্।

কাকুর কথায় কণ্ট্রোলরুমের ভাবনা হারিয়ে যায়। ঘড়ির দিকে তাকাই। সত্যি তাই। এবারে ফেরা দরকার। কাল খুব সকালে উঠতে হবে। ভাগ্যিস কাকু কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছে। নইলে কেমন যেন নিশি-পাওয়া মানুষের মতো এগিয়েই চলেছিলাম।

আমরা শিবিরে ফিরে চলেছি। মেলা তেমনি কর্মচঞ্চল, তেমনি শব্দমুখর। কোথাও 'হর হর মহাদেও', কোথাও 'জয় জগদীশ হরে'…, কোথাও 'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে'…আরও কোথাও বা 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'… গতকাল মেলায় পৌঁছবার পর থেকে এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে এসব শুনছি। সুতরাং নির্বিকার চিত্তে চলেছি এগিয়ে।

কিন্তু এবার থামতে হলো। সংস্কৃত নয়, হিন্দী নয়, বাংলা গান—বাউল গান। মাইক নয়, খালি গলায়—একতারা ও খঞ্জনি বাজিয়ে কোমল ও মধুর নারীকণ্ঠ। তাড়াতাড়ি ছাউনিটার সামনে আসি। ত্রিপলের ছাউনি, সামনের দিকে বেড়া নেই। ভেতরে কয়েকজন নারী-পুরুষ।

গায়িকার গায়ের রং ফর্সা নয়, কিন্তু সে ভারী সুশ্রী। মুখখানি বড় মিষ্টি। মেয়েদের বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের বয়স অনুমান করা কঠিন, তবু মনে হচ্ছে তার বয়স তিনের ঘরে পৌঁছয় নি। এমন মেয়ে এই সময় এখানে একতারা বাজিয়ে গান গাইবে, এটা আশাতীত। তবু ঘটনাটি বাস্তব সত্য। তাই তার গান শুনি। সে গাইছে—

'বলে কয়ে মানুষকে কি সাধু করা যায়।<br>
মানুষ নাই পটে নাই ফটে,<br>
মন ছবি বাঁশি বাজায়॥<br>
শুধু নেংটি পরলে হয় না সাধু,<br>
ও-যার অন্তরে নাই প্রেমের মধু,<br>
আবার মানুষ হয়ে সদাই বেহুঁশ<br>
চিরদিন ভরে থেকে যায়॥<br>
বলে কয়ে মানুষকে কি সাধু করা যায়।…

গায়িকা বৈষ্ণবী। তার গলায় তুলসীর মালা। সে যথারীতি তিলকসেবা করেছে।…

সহসা তার মুখখানি মনে পড়ে যায় আমার। এমনি কোমল কণ্ঠ, এমনি মিষ্টি মুখ—এই বয়স। দশ বছর আগে আরেক মহামেলায় যাবার পথে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তারপরে বহু তীর্থের পথে পথে ঘুরেছি, কিন্তু শ্যামার মতো বৈষ্ণবীর আর দেখা পাই নি। গঙ্গাসাগরের অতল সলিলে শ্যামাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি চিরদিনের মতো—

তাই আর বৈষ্ণবীর ভাবনা নয়, তার চেয়ে গান শোনা যাক। বৈষ্ণবী গেয়ে চলেছে—

'সোনার মানুষ দেশ-বিদেশে,
ঘুরে বেড়ায় পাগল-বেশে,
আবার অবশেষে চিনলি তারে
দেশ ছেড়ে যেদিন পালায়॥
ভবা পাগলার সাধন ভজন
ওরে জন্মের মতন হয় বিসর্জন, ভোলা মন,
রইল আপন গাছ-তলায়॥
বলে কয়ে মানুষকে কি সাধু করা যায়।...'

"আর কতক্ষণ গান শুনবি? রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছে।"

কাকুর কথায় খেয়াল হয়। তাইতো শিবিরে ফিরতে হবে! কাল স্নান, সকাল-সকাল উঠতে হবে।

বেরিয়ে আসি বৈষ্ণবীর আখড়া থেকে। আখড়ায় বৈষ্ণবী একা নয়, আরও কয়েকজন বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেখে এলাম ওখানে। তাহলেও আমার কাছে গায়িকা বৈষ্ণবীটিরই আখড়া। সে যে আমার শ্যামার মতো। এক মেলায় হারিয়ে দশ বছর বাদে আরেক মেলায় তাকে আমি খুঁজে পেলাম!

কাল আমাকে একবার আসতে হবে এখানে। গান শুনতে নয়, বৈষ্ণবীর সঙ্গে আলাপ করতে। জানতে হবে, এই বয়সে এমন রূপ-যৌবন নিয়ে কেন সে এ জীবন বেছে নিয়েছে? তারও কি শ্যামার মতো কোনো করুণ কাহিনী আছে?

কিন্তু সে কাহিনী শুনে কি লাভ হবে আমার? হয়তো মানুষের অবিচার আর প্রতারণা শ্যামার মতো এই মেয়েটিকেও টেনে এনেছে এ জীবনে। সেকথা শুনে তো কেবল কষ্ট পাওয়া। দশ বছর ধরে যে জ্বালা সইছি, তাকে তীব্রতর

করে তোলা নিতান্তই নির্বোধের কাজ হবে। না, না, আর এ আখড়ায় নয়, কোনোদিন নয়, কখনই নয়।

"পাশে সরে যান, মিছিল আসছে।"

দাদুর কথায় তাড়াতাড়ি পথের ধারে সরে আসি। পেছনে তাকাই। না, ঠিক মিছিল নয়। কুম্ভমেলায় তো নয়ই। কুম্ভমেলার মিছিল মস্ত-এক জমকালো ব্যাপার। বিভিন্ন আখড়ার মণ্ডলেশ্বরগণ যখন মেলায় আসেন, তখন সে শোভাযাত্রা দেখার মতো। হাতি ঘোড়া ও পদাতিকদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। মহামণ্ডলেশ্বর মহামূল্যবান সিংহাসনে হাতির পিঠে বসে থাকেন। সামনে ব্যাণ্ডপার্টি বাজে, পেছনে শিষ্যদের জয়ধ্বনি ওঠে। আতসবাজিতে আকাশের রং পালটে যায়। কিন্তু এসব দেখার সুযোগ পাই নি আমরা। শঙ্করাচার্য ও মহামণ্ডলেশ্বরগণ আমাদের আগেই মেলায় এসে গিয়েছেন। নিরঞ্জনী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর যতীন্দ্র কৃষ্ণানন্দজী যখন হাতিতে চড়ে মেলায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন তাঁকে দেখে নাকি মনে হয়েছিল—কোনো রাজপুত্র রাজপথ দিয়ে চলেছেন, আজ তাঁর অভিষেক।

এ-মিছিল সে-মিছিল নয়। একে তাই মিছিল না বলে সাধুদের একটি প্রবাহ বলা যেতে পারে। কয়েক শ' গেরুয়াধারী সাধু কাঁধে অথবা মাথায় নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে সারি বেঁধে সঙ্গমের দিকে চলেছেন। বোধকরি রেল-স্টেশন কিংবা বাস-টারমিনাস থেকে সোজা স্নানের জায়গায় চলে যাচ্ছেন।

সাধুরা চলে যাবার পরে আবার চলা শুরু করি। রাত যতই হোক, আমরা কিন্তু তাড়াহুড়া করছি না। ধীরে ধীরে পথ চলেছি। গঙ্গাদ্বীপের মতো এখানে পথের পাশে অত যাত্রী আশ্রয় নেন নি, কিন্তু কিছু নিয়েছেন বৈকি। এঁদের মধ্যেও যেমন দীন-দরিদ্র আছেন, তেমনি আছেন বহু অবস্থাপন্ন ঘরের নারী-পুরুষ।

তাঁদেরই একটি পরিবারের দিকে নজর পড়ে আমার। বাপ-মা ও ছেলে-মেয়ে সবাই দেখতে সুন্দর, প্রত্যেকের গায়ে আধুনিক ডিজাইনের দামী পোশাক। তাদের সঙ্গে রয়েছে একজন পরিচারক ও দুজন কুলি। তাদের কাছে বাক্স বিছানা সহ নানা রকমের মালপত্র।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাঁর স্ত্রীর বয়স চারের ঘরে, মেয়েটির বছর বিশ আর ছেলেটির পনেরো-ষোলো। হিন্দীতেই কথা বলছে। উত্তর ভারতের মানুষ বলেই বোধ হচ্ছে।

কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, আশ্রয়ের জন্য বেশ কয়েকটি জায়গায় চেষ্টা

করে ব্যর্থ হয়েছেন। কী করবেন, ভদ্রলোক বুঝে উঠতে পারছেন না। বিছানাটার ওপর বসে পড়েছেন, স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ মেয়েটি বলে ওঠে, "ড্যাডি, রাত আর কতটুকুই বা বাকি আছে! আমরাও তো ওদের মতো এখানেই বিছানা পেতে কম্বল গায়ে দিয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারি। কাল সকালে স্নান সেরে সোজা স্টেশনে চলে যাবো।"

আগেই বলছি মেয়েটির পরনে আধুনিক ডিজাইনের পশ্চিমী পোশাক—কোট প্যান্ট টুপি দস্তানা। হাতে ঘড়ি, কাঁধে দামী ক্যামেরা। তার ঠোঁটের রং এখনও অম্লান। বোধকরি কলেজে পড়ে। সুতরাং তার কথা শুনে একটু অবাক হই।

বাবা নিরুপায়। তবু তিনি মেয়ের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন না। বলেন, "রাস্তায় রাত কাটাবো!"

"কি দোষ ড্যাডি?" এবারে ছেলেটি কথা বলে, "দেখো না, কত মানুষ পথে শুয়ে আছে! কয়েকটা ঘণ্টা বই তো নয়।"

বাবা কী বলবেন বোধহয় বুঝে উঠতে পারছে না, মা-ও নীরব। মেয়ে পরিচারককে বলে, "লছমন, বিছানা বিছিয়ে ফেল। আমরা এখানেই রাত কাটাবো।"

পরিচারক কুলিদের বলে, "বিস্তারা খোল।"

চলতে চলতে মনে হয়, এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমন লক্ষ লক্ষ স্বচ্ছল পরিবার আজ কুম্ভনগরের পথে পথে বিছানা পেতেছে। তবু এ ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য, কারণ যে দুটি ছেলে-মেয়ে রাস্তায় রাত্রিবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করল, তাদের শুধু বয়স অল্প নয়, তারা মনে হয় সোনার চামচ মুখে নিয়েই জন্মেছে। এটাই কুম্ভমেলার বৈশিষ্ট্য। এ মেলায় এলে সবার সব আভিজাত্য, সব অহঙ্কার ঘুচে যায়। সবাই সমান হয়ে যান। মনুষ্যত্বের এই অপরূপ বিকাশ, মানসিকতার এই অনুপম উত্তরণই কি অমৃতলাভ নয়?

শান্তি আশ্রমের সামনে ফিরে এসেছি। আশ্রমের মাইক এখনও ঘোষণা করে চলেছে—ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান করতে হবে কিংবা সঙ্গমেই স্নান করতে হবে, তার কোন মানে নেই। আগামীকাল বেলা বারোটার আগে স্নান করলেই চলতে পারে, সঙ্গম থেকে যে কোন দিকে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে গঙ্গা অথবা যমুনায় স্নান করলেই অমৃতলাভ হবে।

"আরে! এ যে বৃষ্টি পড়ছে!" হঠাৎ সুধাংশু বলে ওঠে।

ঠিকই বলেছে সে, আমার গায়েও একফোঁটা পড়ল। তাড়াতাড়ি আকাশের

দিকে তাকাই। তাই তো, একটাও যে তারা দেখতে পাচ্ছি না। একে মাঘ মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দশী, তার ওপর কুম্ভনগরের পথ দিনের মতো আলোময়। তাই এতক্ষণ পথের দিকে তাকিয়েই পথ চলেছি, আকাশের নিচে থেকে একবারও আকাশের দিকে তাকাই নি। এখন মনে হচ্ছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে। বড় বড় ফোঁটা, বিচ্ছিন্ন ভাবে। জোরে নামবে কি? না নামাই ভাল। বৃষ্টি নামলে যে কুম্ভমেলার লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর প্রাণ সংশয় হবে।

একটু আগে দেখে আসা অভিজাত পরিবারটির কথা মনে হচ্ছে। লছমন বোধহয় এখনও বিছানা বিছিয়ে সব গোছগাছ করে নিতে পারে নি। এরই মধ্যে বৃষ্টি নামল। এই শীতে বৃষ্টি মাথায় করে কিভাবে রাত কাটাবে ওঁরা?

আর কেবল ওঁদের কথাই বা ভাবছি কেন? কুম্ভনগরে যে আজ এমন লক্ষ-লক্ষ মানুষ পথে-পথে শুয়ে বসে সেই পরমলগ্নের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। শিশু থেকে বৃদ্ধ, রিক্ত থেকে বিত্তবান সবাই রয়েছেন তাঁদের মাঝে। তাঁদের কি হবে?

সকালের সেই পুলিশ অফিসার ও আনন্দময়ী মায়ের কথোপকথন মনে পড়ছে। আচ্ছা, মা কি জানতেন যে বৃষ্টি নামবে? নইলে তখন তাঁর সদা-হাস্যময়ী মুখ থেকে সহসা হাসি মিলিয়ে গেল কেন? কেন তিনি পুলিশ অফিসারকে কোন আশ্বাস দিলেন না, শুধু সবাইকে সর্বশক্তিমানের করুণা প্রার্থনা করতে বললেন?

অথচ আজ সারাদিন আকাশে কোনো কালো মেঘ দেখতে পাই নি। বিকেল পর্যন্ত প্রখর সূর্যালোকে সারামেলা উদ্ভাসিত হয়েছে। মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে একি বিস্ময়কর প্রাকৃতিক পরিবর্তন! অথচ এই পরিবর্তনের কথা মায়ের অজানা ছিল না। মা যে শুধু অন্নপূর্ণা নন, তিনি অন্তর্যামিনী। তাই তিনি সবাইকে সর্বশক্তিমানের করুণা প্রার্থনা করতে বলেছেন।

এখন আর ছিটে-ফোঁটা নয়, রীতিমত বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। জোরে পা চালাতে হয়। ছুটে এসে তাঁবুতে ঢুকি। ঠাকুরমা নিশ্চিন্ত হন, নিশ্চিন্ত হয় কাকী পিসী পদ্মা সেজদি শঙ্করী—অন্যান্য সবাই। নিশ্চিন্ত হই আমরা।

কিন্তু ওঁরা? যাঁদের ভাগ্যে রাতের আশ্রয় জোটে নি, যাঁরা এই কুম্ভনগরের পথে পথে আশ্রয় নিয়েছে? তাঁদের কারও একটা ছাতা পর্যন্ত নেই। পকেটে যত টাকাই থাক, তার বিনিময়ে কেউ একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই কিনতে পারবেন না। এক শ' বছরের বৃদ্ধ আর এক মাসের শিশু সমান অসহায়। তাঁদের কি হবে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কেমন করে সম্ভব হবে। আমি যে তাঁবুর ভেতরে খাটিয়ায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে সেইসব হতভাগ্যদের ভাবছি। এ ভাবনা বিলাসিতা ছাড়া আর কি হতে পারে? আমার পক্ষে তাঁদের দুর্গতির কথা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

তবু আমার মন বলছে—ওঁদের কারও কোনো ক্ষতি হবে না। তীর্থের দেবতা নিশ্চয়ই করুণা করবেন। এখুনি বৃষ্টি বন্ধ হবে, বাতাস থেমে যাবে, আকাশে তারা ফুটবে—কুম্ভমেলা আবার উঠবে হেসে। যাঁরা এখন অসহায়ের মতো বৃষ্টিতে ভিজছেন, তাঁদের সকল দুর্গতির অবসান ঘটবে। তাঁরা সবাই পুণ্যস্নান করে সুস্থ দেহে ঘরে ফিরে যাবেন। এবং তাঁরাই প্রকৃত অমৃত লাভ করবেন।

## সাত

না, আমার সকল আশা বিফল হয়েছে। সমস্ত অনুমান হয়েছে মিথ্যে—আর সত্য হয়েছে আশঙ্কা। সেই থেকে সারারাত মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

গতকাল বিকেলেও এমন বর্ষণ ছিল আশাতীত। মাঘ মাস, কেউ বৃষ্টির জন্য প্রস্তুত ছিল না। আমাদের তাঁবুগুলো কাপড়ের এবং পুরনো। যথেষ্ট জোড়া-তালি রয়েছে। তাছাড়া মোটেই ভাল করে টাঙানো নয়। টাঙাবার সময় যে এমন বৃষ্টির কথা কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁবু টাঙানো হয়েছিল শীত আর শিশিরের কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে। এমন বর্ষার বর্ষণ সহ্য করার শক্তি এ-সব তাঁবুর কেমন করে থাকবে?

সুতরাং জল পড়ছে। জোড়া-তালি ফুটো ও ফাঁকা দিয়ে জল পড়ছে, দরজা দিয়ে জলের ঝাপটা আসছে। এসব তাঁবুর কোনো 'গ্রাউণ্ড শীট্' থাকে না। তাঁবুর মেঝে মানে বালির চর। মেঝের ওপর দিয়ে সমানে জলস্রোত বইছে। তবে জল জমছে না, কারণ আমাদের শিবিরটা একটা ঢালের ওপর। জল নেমে যাচ্ছে, কিন্তু খাটিয়ার তলায় রাখা জিনিসপত্র সব ভিজে গেছে। এখন অবশ্য সেগুলি খাটিয়ার ওপরে তোলা হয়েছে।

জল পড়ছে খাটিয়ার ওপরেও—সর্বত্র নয়, জায়গায় জায়গায়। বিছানাপত্র

জামা-কাপড় প্রায় সবই ভিজে গিয়েছে।

শুধু জল নয়, সেই সঙ্গে প্রবল বাতাস বইছে। রাতে তো মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তাঁবু বুঝি উড়ে যাবে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছেন। তাঁদের আর্তনাদ অবশ্য অমূলক হয়েছে। তাঁবুগুলো এখনও অক্ষত। তবে সবাই শীতে বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছি। আমরা যে মাত্র একখানি করে কম্বল সঙ্গে এনেছি। কম্বল গায়ে দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছি। পা মেলার উপায় নেই। ওপর থেকে জল পড়ছে।

কিন্তু আর কতক্ষণ শুয়ে থাকব? সকাল হয়েছে, মৌনী অমাবস্যার সকাল। একশ' চুয়াল্লিশ বছর পরে ভারতে সেই পরমপুণ্যময় সুপ্রভাত সমাগত। অথচ এখনও শুয়ে রয়েছি!

না থেকেই বা কি করব? এই ঝড়-জলের ভেতরে কি আমার অশক্ত সঙ্গীদের নিয়ে বের হওয়া সম্ভব? তাছাড়া এখনও পুরো আলো ফোটে নি, আরেকটু ফর্সা হোক। অদৃষ্ট ভাল হলে বৃষ্টিটা কমে যেতেও বা পারে!

অনেকক্ষণ তো বৃষ্টি হলো। এই মাঘমাসে আর কত বৃষ্টি হবে! জলে ও পুণ্যার্থীদের হাঁটা-চলায় সঙ্গমের পথ নিশ্চয়ই এতক্ষণে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি মাথায় করে সেই দুর্গমপথ পেরিয়ে সঙ্গমে পৌছনো প্রায় দুঃসাধ্য। বৃষ্টি বন্ধ হলে যেমন শীত কম লাগবে, তেমনি দৃষ্টিশক্তি বাড়বে। মানুষের সঙ্গে ধাক্কা কম খেতে হবে।

দেরি করার অবশ্য একটা অসুবিধে রয়েছে। যত বেলা হবে, মেলায় ভিড়ও তত বাড়বে। কর্তৃপক্ষ অনুমান করছেন, আজ সকাল আটটার পরে প্রতি মিনিটে চোদ্দ হাজার মানুষ মেলায় প্রবেশ করবেন। সকাল ন'টার মধ্যে মেলার জনসংখ্যা দাঁড়িয়ে যাবে এক কোটি সাত লক্ষ। গতকাল প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ মেলায় রাত্রিবাস করেছেন। আজ আরও প্রায় এক কোটি পনেরো লক্ষ মানুষ সঙ্গমে স্নান করতে আসবেন। অথচ চারটি স্নানের ঘাটে এক সময় বড় জোর পনেরো লক্ষ চুরাশি হাজার স্নানার্থী সমবেত হতে পারেন এবং প্রতি মিনিটে দেড় হাজার পুণ্যার্থী স্নান করতে পারেন। কাজেই দেরি করলে অসুবিধে বাড়বে। তবু দেরি করি, যদি তীর্থের দেবতা করুণা করেন, বৃষ্টি বন্ধ হয়!

কিন্তু লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পথে রাত কাটাচ্ছে দেখেও যে নিষ্ঠুর দেবতা বরুণের বেয়াদপি বরদাস্ত করে চলেছেন, তিনি কি আমাদের প্রতি করুণা করতে পারেন? সুতরাং বৃষ্টি বন্ধ হলো না। তবু চুপচাপ শুয়ে রইলাম।

একদল সহযাত্রী স্নান করে ফিরে এলেন। তাঁরা রাত আড়াইটেয় বেরিয়ে-

ছিলেন, এই ভোর ছ'টায় শিবিরে ফিরলেন। এখান থেকে সঙ্গম মাত্র দেড় কিলোমিটার। তিন কিলোমিটার পথ যাতায়াত করতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে। জলে কাদায় ও শীতে ঠেলাঠেলি করে তাঁরা প্রায় আধমরা। কিন্তু তাঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে না, কোনো কষ্ট হয়েছে। তাঁরা হাসাহাসি করছেন। ওঁরা যে অমৃত লাভ করেছেন!

না আর শুয়ে থাকা গেল না। তাছাড়া বৃষ্টি বোধকরি বন্ধ হবে না, আলো যা হবার হয়ে গিয়েছে। এবারে বেরিয়ে পড়াই ভালো।

ভয় ছিল, দলের অনেকেই এত সকালে এই জল-ঝড় মাথায় করে বের হতে রাজী হবে না। কিন্তু আমার আশঙ্কা অমূলক। কথাটা বলতেই ওরা উঠে বসল। সবাই যেন মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে একটা বাহ্যিক আমন্ত্রণের অপেক্ষায় ছিল।

তৈরি হতে সময় বেশি লাগল না। জামা-কাপড় থেকে পূজার উপকরণ পর্যন্ত সবই কাল রাতে গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। সেগুলি কেবল কিট্‌ব্যাগে ভরে নিতে হয়—বৃষ্টি পড়ছে যে।

বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে, সবে সকাল সাড়ে ছ'টা। শিবিরের সামনে দেখা হলো মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কাছে টাকা-পয়সা ও ঘড়ি-আংটির থলেটা দিয়ে দিই। তিনি ভোর চারটেয় স্নান সেরে ফিরেছেন। মাত্র কয়েকজন সহযাত্রী তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। আমার মাসিমা তাঁদের অন্যতমা। তখন ভিড় কম ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল।

মিসেস মণ্ডল বলেন, "শিবির থেকে বেরিয়েই দেখবেন শোভাযাত্রার মতো মানুষ চলেছে প্রত্যেক পথের বাঁদিক দিয়ে। আপনারা তাঁদের পেছনে এগিয়ে যাবেন। সবাই সর্বদা একসঙ্গে থাকবেন। ঘাটে পৌঁছে অন্তত দু-জন মাল পত্র পাহারা দেবেন। যাঁরা স্নান করতে জলে নামবেন, তাঁরা তাঁদের দিকেও নজর রাখবেন।"

মাসিমা সঙ্গে আসেন নি কিন্তু বিদিশা আমাদের সঙ্গী হয়েছে। গতকাল রাতেই সে কথা দিয়েছে আজ আর হারিয়ে যাবে না। সেই সঙ্গে বলেছে নিজের জীবনের কিছু করুণ কাহিনী। সব শুনে ওকে আর সঙ্গে না এনে পারি নি।

বেরিয়ে আসি শিবির থেকে। এটি কোন প্রধান পথ নয়, তবু একি কাণ্ড! এযে দেখছি জনারণ্য। গতকালও ভিড় ছিল, কিন্তু এ ভিড়ের কাছে সে কিছুই নয়। অবশ্য তাইতো হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমান আজ সকাল আটটার পর থেকে প্রত্যেক প্রধান পথের সর্বত্র প্রতি মিনিটে পাঁচ শ' মানুষ যাতায়াত

করবেন। অথচ বৃষ্টি-কাদা ও শীতের ভয়ে আমরা এতক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। এঁরা হয়তো সারারাত ধরেই বৃষ্টিতে ভিজেছেন। তবু এঁদের কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো কষ্টবোধ নেই। পরমানন্দে পথ চলেছেন। অভূতপূর্ব, এমন অপরূপ শোভাযাত্রা আমি আর কখনও দেখি নি।

গতকাল সঙ্গম থেকে ফেরার সময় পথে একটুকরো বাঁশের কঞ্চি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তার মাথায় একখানি রঙিন রুমাল বেঁধে সবাইকে দেখিয়ে বলি, "আমাদের দলের পতাকা। এটি আমি সব সময় মাথার ওপরে উঁচু করে রাখব এবং আগে আগে পথ চলব। সবাই এটার দিকে নজর রাখবেন, তাহলে আর হারিয়ে যাবেন না।"

"হারিয়ে গেলেই বা কি হবে?" পিসী বলে, "আমরা স্নান সেরে ঠিক ফিরে আসব।"

"ঠিক বলেছেন পিসিমা।" সুধাংশু সমর্থন করে তাকে।

তাই তো করবে। গতকাল সঙ্গম থেকে ফেরার পথে সে-ও হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু বিদিশা সহ সবাই নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে। সুতরাং ওদের সাহস বেড়ে গিয়েছে। খেয়াল করছে না যে কালকের সঙ্গে আজকের ভিড়ের কোনো তুলনা হয় না। তাছাড়া একসঙ্গে না থাকলে স্নান করতে খুবই অসুবিধে হবে। সেই কথাই বলি সবাইকে এবং পিসী কথাটার সত্যতা স্বীকার করে। সে আর হারিয়ে যেতে চায় না।

"তাহলে আপনি আমাদের 'গাইড'!" শঙ্করী সহাস্যে আমাকে বলে।

কাকু মন্তব্য করে, "গাইড নয়, পালের গোদা।"

প্রবল হাস্যরোল।

হাসি থামতেই দাদু জয়ধ্বনি শুরু করেন—গঙ্গা মাঈ কী···

আমরা সাড়া দিই—জয়!

—যমুনা মাঈ কী···জয়!

—কুম্ভমেলা কী···জয়!

কেবল আমরা নই, চারিপাশের অপরিচিত যাত্রীরাও আমাদের সঙ্গে গলা মেলালেন। অপরিচিতের সব ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে। আর তাই দাদু থেমে যাবার পরেও জয়ধ্বনি চলতে থাকে। এতো কোন দেবতার জয়ধ্বনি নয়, অমৃতের পুত্র মানুষের বিজয়বার্তা, যে মানুষ সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাজিত করে যুগ যুগ ধরে এই মহামেলায় অমৃত আহরণ করছে।

আমরাও তাদের সঙ্গে মিলিত হই। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি পথে। এ-পথ

সঙ্গমের পথ, পুণ্যস্নানের পথ, অমৃতলাভের পথ।

বেলেমাটির পথ। বৃষ্টির জলে ও অসংখ্য মানুষের চলাচলে কর্দমাক্ত। এখানে-ওখানে জল জমে গিয়েছে। ঠাণ্ডা জল। খালি পা। খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

বৃষ্টির বিরাম নেই। যেন শ্রাবণের বর্ষণ, কখনো জোরে কখনো আস্তে। কিন্তু থামবার নাম নেই। বৃষ্টি মাথায় করে ধীরে ধীরে সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি।

মাঝে মাঝে ধাক্কাধাক্কির ভেতরে পড়ে যাচ্ছি। একে অপরের হাত ধরে তাড়াতাড়ি পাশে সরে কোনমতে টাল সামলাতে হচ্ছে। আমি সর্বদা সেই রুমালের পতাকা একহাতে উঁচু করে রেখেছি। পতাকা থামলে ওরা থামছে, পতাকা চললে ওরা চলা শুরু করছে।

আবার থামতে হলো। ধাক্কা নয়, ভিড়। কলকাতার রাস্তায় যাকে 'জ্যাম্' বলা হয়। তবে কলকাতার মতো গাড়ির নয়, মানুষের জ্যাম্। কুম্ভমেলা যে মানুষের মেলা—মহামেলা।

এখানে এত ভিড় কেন? সবারই এক প্রশ্ন। কিন্তু কে উত্তর দেবে? সামনে জনসমুদ্র। মানুষ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপরে বৃষ্টি, পায়ের নিচে জল। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সামনের জনসমুদ্র নড়ে উঠল। আমাদেরও নাড়া লাগল। এক-পা, দু-পা করে এগিয়ে চললাম।

একটু একটু করে শাস্ত্রী পুলের নিচে পৌঁছন গেল। আর সে সঙ্গে জ্যাম্-এর কারণটা বুঝতে পারলাম। শাস্ত্রী পুল ওপর দিয়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে পিলার। পিলারের ফাঁকে ফাঁকে পুলের তলায় প্রচুর জায়গা। সেখানে আশ্রয় নিলে পুলটা ছাউনির কাজ করে। সুতরাং হাজার হাজার পথের মানুষ পুলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। পোঁটলা-পুঁটলি পাশে রেখে শিশুদের বুকে নিয়ে তাঁরা জড়াজড়ি করে বসে রয়েছেন। পুলের এপাশ থেকে ওপাশে যাবার পথ বন্ধ হয়েছিল। তাই ঐ জ্যাম্। এখন তাঁদের দু-পাশে সরিয়ে দিয়ে একফালি পথ বের করা হয়েছে। আমরা সেই পথ দিয়ে এপাশে এলাম।

নিমজ্জমান মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। তাই শাস্ত্রী পুলের তলায় এসে এত মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। নইলে তিরিশ-চল্লিশ ফুট ওপর দিয়ে প্রসারিত একটা পুলের তলায় আশ্রয় নিলে কতটা মাথা বাঁচে? শুধু তো বৃষ্টি নয়, সেই সঙ্গে প্রবল বাতাস বইছে। পুলের তলায় দু-দিক ফাঁকা। কাজেই ওপর থেকে জল না পড়লেও, আশ্রিতরা জলের ঝাপটা থেকে রেহাই পাচ্ছেন

না।  তবু তাঁরা ঠাঁই নিয়েছেন পুলের তলায়।

শাস্ত্রী পুল পেরিয়ে এগিয়ে এসেছি। আবার থামতে হলো। কয়েকজন মানুষ একখানি খাটিয়া কাঁধে করে নিয়ে আসছেন। না, কোন শবযাত্রা নয়, স্নানযাত্রা। জনৈকা বৃদ্ধা খাটিয়ার ওপরে বসে বসে কাঁপছেন। তিনি স্নান করে ফিরে এলেন। বোধকরি পায়ে হেঁটে তাঁর অমৃত লাভ করা সম্ভব নয় বলেই নাতি-নাতনীরা এই অভিনব পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। ভালই করেছেন। কারণ তাঁদের দিদিমার জীবনে আর কুম্ভস্নানের সুযোগ আসবে না।

বৃষ্টি ও বাতাস কখনো বাড়ছে কখনো কমছে কিন্তু থামছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারছি, থামার কোনো সম্ভাবনাও নেই।

মাঘ মাসে মানুষ ছাতা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় না, তাই ছাতা আনি নি। কিন্তু আনলেও কোনো কাজে আসত কি? লোকে-লোকারণ্য পথ। এখন ছাতা মেললে বোধকরি দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে।

তবে ক্যামেরা অনেকেই এনেছেন। এই আবহাওয়া ও আলোতে ছবি তোলা সম্ভব নয়। তবু তাঁরা অভ্যাস দোষে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে পথে বের হয়েছেন। আর শেষ পর্যন্ত সেই ক্যামেরাই কাল হলো। ক্যামেরা নিয়ে সঙ্গমে যাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং পুলিশ তাঁদের পথরোধ করেছে।

"ভাগ্যিস আগের থেকে দেখতে পেয়েছিলাম, নইলে তো আমাকেও তাঁবুতে ফিরে যেতে হতো।" কাঁধের ক্যামেরা পিসীর ঝোলায় চালান করে সুধাংশু স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

পিসিমা প্রমাদ গণে, "কিন্তু পুলিশ যদি আমার ঝোলা সার্চ করতে চায়?"

"আমরা তাহলে মানহানির মামলা করব। ভদ্রমহিলার ঝোলা সার্চ! করলেই হলো!" দাদু পিসিমাকে সান্ত্বনা দেন।

জানি না তাঁর আশ্বাসে পিসী কতটা আশ্বস্ত হলো। তবে সে আর ক্যামেরা প্রসঙ্গে কোন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে না।

শেষ পর্যন্ত সুধাংশুর কৌশল কার্যকরী হলো। পুলিশ পিসীর ঝোলা দেখতে চাইল না। ক্যামেরা বহাল তবিয়তে নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করল।

কাদায় পা ডুবে যাচ্ছে। ভেজা জামা-কাপড় ও চাদর গায়ের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে এক-পা এক-পা করে পথ চলেছে অগণিত মানুষ। কিন্তু কেউ বিমর্ষ নয়। সবার মুখে হাসি। অনেকে আবার হাত ধরাধরি করে কাঁপা গলায় গান গাইছেন।

রুমালের পতাকা উঁচিয়ে আমি চলেছি সবার আগে। আমার পেছনে কাকু,

তারপরেই দলের মেয়েরা। তাদের পরে দাদু ও সুধাংশুরা। সেজদি ঠাকুরমাকে আগলে আছেন, মাঝে মাঝে শঙ্করী তাকে সাহায্য করছে। মাসিমা আসেন নি, তিনি মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে স্নান সেরে এসেছেন। পিসী বয়সের তুলনায় অনেক বেশি কর্মক্ষম, কাজেই ঠাকুরমা ছাড়া আর কারও কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হচ্ছে না। সবাই সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছে। অক্লেশে নয়, কিছু কষ্ট সবারই হচ্ছে, কিন্তু তাতে কারও মুখের হাসি মিলিয়ে যায় নি।

পথের বাঁদিক দিয়ে আমরা যেমন সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছি, তেমনি পথের ডানদিক দিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ সঙ্গম থেকে ফিরে আসছেন। ওঁরা কুম্ভস্নান করে এসেছেন। ওঁরা আমাদের চেয়ে বেশি উচ্ছল আর আনন্দময়। ওঁরা যে অমৃতলাভ করেছেন।

একটি দেহাতি পরিবারের দিকে নজর পড়ে আমার। স্বামী, স্ত্রী ও দুটি ছেলে-মেয়ে। ছেলেটির বয়স বছর তিনেক, মেয়েটির পাঁচ। স্ত্রীর মাথায় মস্ত এক পুঁটলি এবং সেটি ভিজে ঢোল। সে একহাতে পুঁটলি ধরেছে আরেক হাত স্বামীর কাঁধে রেখে এগিয়ে চলেছে। স্বামী একহাতে মেয়ের হাত ধরে আরেক হাত দিয়ে কাঁধের ছেলেকে ধরে রেখেছে। তাদের জামা-কাপড় ভিজে কিন্তু তারা মহানন্দে পথ চলেছে। এমনকি কাঁধের শিশুটি পর্যন্ত শীত ও জলে নির্বিকার রয়েছে। বাপের কাঁধে বসে সে দিব্যি চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখে নিচ্ছে। আচ্ছা এই অবোধ শিশুটি কি বুঝতে পেরেছে, সে অমৃতলাভ করেছে? নইলে সে অমন নির্বিকার থাকছে কেমন করে?

পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে পথের পাশে পাশে বসে আছেন অনেকে। তাঁরা বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছেন আর হি হি করে কাঁপছেন।

"কিন্তু কেন…" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

প্রশ্নটা আমার মনেও এসেছে। কিন্তু নিজেদের নিয়ে এত বেশি ব্যতিব্যস্ত রয়েছি যে ওঁদের কষ্ট কোনো দাগ কাটে নি আমার মনে। এবারে শঙ্করীর প্রশ্ন আমাকেও সচকিত করে তোলে। সত্যিই তো, এঁরা বোধকরি কাল রাত থেকেই এইভাবে বসে আছেন, দুঃসহ শীতে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছেন। কিন্তু কেন?

দাদু উত্তর দেন, "মনে হয় এঁদের সঙ্গীরা সঙ্গমে স্নান সারতে গিয়েছেন। মালপত্র মাথায় নিয়ে সেখানে যাওয়া শক্ত বলে, এঁরা এখানে রয়েছেন। তাঁরা ফিরে এলে এঁরা পুণ্যস্নানে যাবেন।"

"ধন্যি এঁদের পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা!" পদ্মা মন্তব্য করে।

দাদু পেছন থেকে অন্য কথা বলেন, "আমরা যেন কেমন একটু ঝিমিয়ে পড়েছি!"

"ঠিক ঝিমিয়ে পড়ি নি", কাকু উত্তর দেয়, "শীতে আর বৃষ্টিতে চুপসে গিয়েছি।"

"তাহলে একটু গরম হয়ে নেওয়া যাক।" একটু থেমে দাদু আবার শুরু করেন, "বলো, গঙ্গা মাঈ কী…"

—জয়!

—যমুনা মাঈ কী…জয়!

—কুম্ভমেলা কী…জয়!

এবারেও শুধু আমরা নই, চারিপাশের সবাই গলা মেলালেন আমাদের সঙ্গে।

মেলার মাইক আর পুলিশের বাঁশি, এ দুটি জিনিস কিন্তু কখনই নীরব হচ্ছে না। মাইকে কখনও নিরুদ্দেশ ঘোষণা, কখনও বা কোনো নির্দেশ। এখন বলছে—আপনারা অযথা সময় নষ্ট করে পথ ও ঘাটের ভিড় বাড়াবেন না। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে মেলা থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।

আবার কখনও বলছে—জলে-কাদায় স্নানের ঘাটগুলো দুর্গম হয়ে উঠেছে। কাজেই ঘাটে গিয়ে তাড়াহুড়া করবেন না।

আমরা ধীরে ধীরে সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু আমি যে আর রুমালের পতাকা উঁচু করে রাখতে পারছি না। যেমন বৃষ্টি, তেমনি বাতাস। শীতে হাতখানি অবশ হয়ে গেছে। তবু মরীয়া হয়ে হাত উঁচু করে রেখেছি। কিন্তু আর কতক্ষণ? কতক্ষণ পারব এভাবে হাত তুলে রাখতে? কেবল হাতের কথাই বা বলচি কেন, পা-দুখানিও যে আর সচল থাকতে চাইছে না।

মাইকে আবার ঘোষণা—কিছুক্ষণ আগে সঙ্গমে দুখানি নৌকো ডুবে গিয়েছে। তবে ত্রিশজন যাত্রীকেই উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপনারা যাঁরা নৌকোয় করে সঙ্গমে যেতে চান, তাঁরা একটু দেখে-শুনে নৌকোতে উঠবেন। বোঝাই নৌকোয় উঠে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না।

আমরা পায়ে হেঁটে সঙ্গমে চলেছি, আমাদের জন্য এ ঘোষণা নয়। আমরা এগিয়ে চলি।

আবার ঘোষণা। এটিও আমাদের কোনো কাজে আসবে না। তবু শুনি। মাইকে বলছে—যাঁদের স্নান হয়ে গিয়েছে, তাঁরা তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে যান। এলাহাবাদের বিভিন্ন বড়-বড় স্কুল-কলেজে নিরাশ্রয় যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা

হয়েছে। সমস্ত আশ্রয় শিবিরে আগুন জ্বালানো হয়েছে, তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে হাত-পা গরম করে নিন, আরাম করুন।…

হঠাৎ মাইক থেমে গেল। বোধহয় আবার কেউ হারিয়ে গেল, এবারে নিরুদ্দেশ ঘোষণা হবে।

না, অন্যকথা। অত্যন্ত ব্যস্ত স্বরে নূতন নির্দেশ—রুক্ যাইয়ে, আপলোগ সব পাশমে খাড়া হো যাইয়ে! মহাত্মালোগ অরহেঁ হ্যায়, আপলোগ রুক্ যাইয়ে। জল্‌দি রুক্ যাইয়ে!…

থেমে যাওয়া সহজ নয়। আমি থামতে চাইলেই পেছনের লোক আমাকে থামতে দেবে কেন? - তার ওপরে পাশে দাঁড়ানো আরও কঠিন কাজ। অনেকেই টাল সামলাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এতো পথ নয়, মানুষের প্রবাহ। বেগে ধাবমান গাড়িকে হঠাৎ ব্রেক্ কষলে যে অবস্থা হয়, আমাদের এখন সেই অবস্থা।

তাহলেও অল্প অল্প করে ধাক্কা হজম করতে করতে একসময় আমরা চলা বন্ধ করতে সমর্থ হলাম।

কোথা থেকে যেন কয়েকজন মাউণ্টেড্ পুলিশ এসে হাজির হলো। তারা পথের মাঝখান থেকে মানুষ সরিয়ে দিচ্ছে। আবার ধাক্কা-ধাক্কি। কোনরকমে খানিকটা পাশে চলে এলাম। মেয়েদের মাঝখানে রেখে আমরা তাদের যথাসম্ভব চাপমুক্ত রাখার চেষ্টা করতে থাকি।

বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হয় না। একটু বাদেই একটা অস্পষ্ট ধ্বনি কানে আসে। মনে হচ্ছে সমবেত জয়ধ্বনি। যাত্রীদের কলকোলাহল কমে যাচ্ছে আর সেই শব্দটা বাড়ছে। মেলার মাইক নীরব হয়েছে।

একটা স্তব্ধ বিস্ময় মূর্ত হয়ে উঠছে আমার চারিপাশে। সেই অস্পষ্ট ধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এবারে বোঝা যাচ্ছে—হর হর মহাদেও। হর হর…

ঠেলাঠেলি ও ধাক্কা-ধাক্কি থেমে গিয়েছে। কোলের শিশু পর্যন্ত কান্না থামিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ মুহূর্তে অচল অনড় ও নীরব হয়ে গিয়েছে। কেবল বৃষ্টির বিরতি নেই। অগণিত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের সঙ্গে অকাল বর্ষণের শব্দটা মিলে-মিশে কেমন এক বিচিত্র মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

অবশেষে তাঁরা এলেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই ওঁরা পুণ্যস্নান করতে সঙ্গমে গিয়েছিলেন। অমৃতলাভের পরে সেই অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই শিবিরে ফিরে চলেছেন।

হর হর মহাদেও ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হচ্ছে। একসঙ্গে এত নাগাসন্ন্যাসীর দর্শন পাওয়া পরম সৌভাগ্যের। আমরা সৌভাগ্যবান, সেই সুদুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

শুনেছি দশনামীদের আটটি আখড়ার প্রায় পনেরোটি পৃথক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবার কুম্ভমেলায় অংশ নিয়েছেন। এটি তাঁদেরই শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রয়েছে দশনামী সম্প্রদায়ের পতাকা। শুনেছি এই পতাকাটি প্রায় হাজার বছরের পুরনো। পতাকার পেছনে সুসজ্জিত দোলায় নাগাসন্ন্যাসীদের ইষ্টদেবতা। দেবতার পরে প্রথম সারিতে বর্শা হাতে তিনজন নাগাসন্ন্যাসী। বর্শাগুলি চিক্‌চিক্ করছে। স্নান শুরু করার আগে সন্ন্যাসীরা এই বর্শা তিনটিকে স্নান করিয়েছেন। কারণ কুম্ভস্নানের নিয়ম হলো স্নানের আগে নাগাসন্ন্যাসীরা বলিদান করে নেন। সেকালে নাকি নরবলি পর্যন্ত দেওয়া হতো কিন্তু একালে ছাগবলি দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। তাই তাঁরা স্নানের আগে ফল বলি দিয়ে নেন। ঐ বর্শা দিয়ে প্রথমে তিনটি লেবু কেটে ফেলেন। তারপরে বর্শাগুলো ধুয়ে নেন। বর্শার স্নান শেষ হলে শুরু হয় কুম্ভস্নান।

তিন বর্শাবাহকের পরে রয়েছেন নির্বাণী আখড়ার সন্ন্যাসীগণ। এঁরা প্রথম স্নান করেছেন। নির্বাণীদের পেছনে নিরঞ্জনীরা। তাঁদের পরে উটের পিঠে চাক রেখে বাজাতে বাজাতে পথ চলেছেন জুনা আখড়ার সন্ন্যাসীগণ। তারপর যথাক্রমে চলেছেন বৈরাগী উদাসী ও নির্মলা প্রভৃতি আখড়ার সন্ন্যাসীরা। যাঁরা যাঁদের পরে স্নান করেছেন, তাঁরা তাঁদের পেছনে আখড়ায় ফিরে যাচ্ছেন। সবার শেষে চলেছেন পঞ্চায়তী আখড়ার সন্ন্যাসীগণ। তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন নবনির্বাচিত মহামণ্ডলেশ্বর।

আজ বুধবার। গত বৃহস্পতিবার মানে মাত্র ছ'দিন আগে পরমার্থ সাধক সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী বিষ্ণুপুরী পরমহংসদেব নামে জনৈক বাঙালী সন্ন্যাসী শ্রীপঞ্চায়তী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর রূপে অভিষিক্ত হয়েছেন। এই মহামেলাতেই তাঁর পুণ্য অভিষেক সুসম্পন্ন হয়েছে। সেই শুভ-অনুষ্ঠানে মা-আনন্দময়ী এবং অন্যান্য মহামণ্ডলেশ্বরগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা স্বামী বিষ্ণুপুরীকে চাদর ও অন্যান্য জিনিস উপহার দিয়েছেন। বঙ্গ-গৌরব সেই বিংশ শতাব্দীর পরমহংস-দেবকে দর্শন করার সৌভাগ্য হলো আমাদের। আমরা যে কুম্ভমেলায় এসেছি।

অচঞ্চল জনতা সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল, নীরবতার ঘটল অবসান। সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে শুরু হলো জয়ধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টি। মালা ফুল বেলপাতা, যাঁর কাছে যা ছিল, তাই তিনি ছুঁড়ে দিচ্ছেন সন্ন্যাসীদের পায়ে।

শোভাযাত্রা চলে যাবার পরে শুরু হলো ঠেলাঠেলি। এতক্ষণ ছিল দেবার পালা, এবারে নেবার। মহাত্মারা যেপথ দিয়ে হেঁটে যান, সেপথ পুণ্যপথ। পুণ্যপথের ধূলি সংগ্রহের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন সবাই। পথে ধুলো নেই, কাদা। সেই কাদার জন্যই কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এক প্রাণান্তকর পরিস্থিতি।

অথচ এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। একটু বাদে পথ খুলে দেওয়া হবে। সন্ন্যাসীরা যে পথে সঙ্গম থেকে ফিরে এলেন আমরা সেই পথেই এগিয়ে যাবো সঙ্গমের দিকে। তখন যত খুশি কর্দম সংগ্রহ করা যেতে পারে।

কিন্তু সে কাদায় চলবে না। সাধুরা চলে যাবার পরে আমাদের পদভারে পুণ্যপথ অপবিত্র হবার আগেই পথের মাটি সংগ্রহ করতে হবে। তাই এমন কাড়াকাড়ি। ফলে পুলিশ ও ভারত সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

তাহলেও মাউন্টেড্ পুলিশদের সহায়তায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত অব্যবস্থার অবসান ঘটাতে সমর্থ হলেন। কোনো দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই পথ খুলে দেওয়া হলো। মাইকে আবার ঘোষণা ভেসে এলো—মহাত্মারা চলে গিয়েছেন। আপনারা এবার যে যাঁর পথে এগিয়ে চলুন। অযথা কোথাও দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়াবেন না।

বৃষ্টি বন্ধ হয় নি। তাহলেও নিশ্চিন্তে এগিয়ে চলেছিলাম। বৃষ্টিকে ভয় করবার আর প্রশ্ন ওঠে না। বৃষ্টি শুরু হয়েছে গতকাল। রাতে তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে ভিজেছি। সকালে পথে পথে ভিজছি। শীতে কাঁপতে কাঁপতে পেছল পথে এতক্ষণ এগিয়ে চলেছিলাম নিশ্চিন্তে।

কিন্তু এবারে যে বিপদ আরও বাড়ল। সামনে জল। সামনের পথটা ঢালু, চারিদিকের সব জল এসে জড়ো হয়েছে ওখানে। এক হাঁটু জল জমে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। সেই জল পার হয়ে গিয়ে উঠতে হবে পুলে। মেয়েরা বিশেষ করে ঠাকুরমা রয়েছেন, তিনি পারবেন কি?

"কেন পারব না?" ঠাকুরমা পাল্টা প্রশ্ন করেন।

শঙ্করী লজ্জা পায়। সে ও সেজদি তাঁকে ধরে ধরে পথ চলছে। তাই জল দেখে ভয় পেয়ে কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল। ঠাকুরমার পাল্টা প্রশ্নে শঙ্করী লজ্জা পেয়ে যায়। কোনমতে বলে, "না, মানে সামনে জল কিনা, তাই জিজ্ঞেস করলাম কথাটা।"

"তা বৃষ্টি হলে তো কলকাতার পথেও এমন জল জমে। জল পার হতে

পারব না কেন?"

"এ-জল সে-জল নয় ঠাকুরমা!" হাসতে হাসতে বলি, "পা দিলেই বুঝতে পারবেন। এ-জল ভীষণ ঠাণ্ডা।"

"তা হোক গে, আমার কোনো অসুবিধে হবে না।" একটু থামেন ঠাকুরমা। তারপরে আবার বলেন, "জন্ম-জন্মান্তরের ইচ্ছায় মানুষ পূর্ণকুম্ভে আসতে পারে। আমি সেই কুম্ভমেলায় এসেছি, মৌনী অমাবস্যায় প্রয়াগে পুণ্যস্নান করে অমৃতলাভ করতে চলেছি আর এই জলটুকু পার হতে পারব না! তোরা আমার জন্ত কোনো চিন্তা করিস না। আমি পারব, পারতেই হবে আমাকে।"

আমি জলে নামি। সত্যি ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার পেছনে একে একে সবাই সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা ঘোলাজলে নেমে আসে। শঙ্করী ও সেজদি ঠাকুরমার দু-হাত ধরে ধরে জল ভাঙছে। পদ্মা আর কাকীও হাত ধরাধরি করে নিয়েছে। ভালই করেছে। একের পা ফসকালে, অপরে তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে। কেবল পিসী কারও সাহায্য না নিয়ে পথ চলেছে। এক হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে সে সমান তালে ছেলেদের সঙ্গে জল ভাঙছে। তবে কোনো কথা বলছে না। আপন মনে বিড় বিড় করে মন্ত্রপাঠ করছে, আর মাঝে মাঝে তীর্থদেবতাকে প্রণাম জানাচ্ছে।

আমার পিসিমার ক্ষীণ স্বাস্থ্য। ছোট-খাটো মানুষ, বয়স প্রায় ষাট। কিন্তু দেখে মনে হয় না, তার কোনো কষ্ট হচ্ছে। পিসী যে ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচর্য মানুষকে নির্ভীক ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলে।

বৃষ্টি মাথায় করে তুষারশীতল জল পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। শুধু আমরা নই, আমাদের সামনে ও পেছনে অগণিত পুণ্যার্থী পথ চলেছেন। ভিন্ন তাঁদের পোশাক আর ভাষা, ভিন্ন তাঁদের বয়স আর বৃত্তি কিন্তু অভিন্ন তাঁদের উদ্দেশ্য। সবাই এই পরমলগ্নে পবিত্র সঙ্গমে পুণ্যস্নান করে অমৃতলাভ করতে চলেছেন। ধর্ম বর্ণ অবস্থা ও শিক্ষা নির্বিশেষে এঁরা প্রত্যেকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন—একটি ডুব…এই শুভমুহূর্তে সঙ্গমে একটি মাত্র ডুব দিতে পারলেই অক্ষয়-অমৃত লাভ।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরমার কথাই সত্য হলো। আমরা নির্বিঘ্নে জল পেরিয়ে ডাঙায় এলাম। সত্যি বলতে কি, কোনো কষ্টই হলো না। কেনই বা হবে? পা-দুখানিকে চালায় যে-মন, সেই-মন সতেজ থাকলে পথ চলায় কষ্ট হবে কেন?

এটি চার নম্বর পুল। গতকাল আমরা এ পুল পার হয়ে সঙ্গমে যাই নি। তবে একই আকারের একই রকম পুল।

কুম্ভমেলা মানেই মানুষের মহামেলা। এখানে সব পথে সর্বদা ভিড় লেগে থাকে। তার ওপরে স্নান শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং শিবির থেকে বের হবার পর থেকেই ভিড় ঠেলছি। কিন্তু পুলের ওপরে যে ভিড় দেখছি, তার সঙ্গে পথের ভিড়ের কোন তুলনা হয় না।

তিনদিক থেকে তিনটি পথ এসে পুলের তলায় মিলিত হয়েছে। তিনটি পথ দিয়েই মানুষের প্রবাহ এসে পুলের ওপর আছড়ে পড়ছে। পায়ের কাদা ও বৃষ্টির জলে পুলের ওপরকার লোহার পাত পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। তার ওপর অধিকাংশ যাত্রীর মাথায় বোঝা। তাদের অনেকেই ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে পড়ে যাচ্ছে নিচে। কখনও তাদের গায়ের ওপর দিয়ে কখনও তাদের বোঝার ওপর দিয়ে মানুষ চলে যাচ্ছে, আবার কখনও বা তাদের গায়ে কিংবা বোঝায় বেঁধে আবার কেউ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। এক কথায় একটা প্রাণান্তকর পরিস্থিতি।

তাহলেও একসময় সহসা দেখতে পেলাম আমরা সবাই অক্ষত দেহে পুল পেরিয়ে এসেছি, গঙ্গাদ্বীপের মাটি স্পর্শ করেছি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

পিসী বলে, "প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, আর কি!"

একটা নূতন খবর পাওয়া গেল। একাধিক কুম্ভ-ফেরৎ আমার সন্ন্যাসিনী পিসিমারও তাহলে কিছু কষ্ট হয়েছে।

যাকৃগে, কষ্টের অবসান হলো। আমরা পুল পেরিয়ে পথে নেমেছি। এখানে চাপাচাপির কষ্ট নেই।

পথে চাপ নেই কিন্তু ভিড় আছে। ধস্তাধস্তি না থাকলেও ঠেলা-ঠেলি আছে। সেই ভিড় ঠেলে আমরা সারি বেঁধে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। আমাদের শিবির থেকে সঙ্গম দেড় কিলোমিটার। গতকাল বিকেলেও ভিড় ছিল। তাই এ পথটুকু পেরোতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছিল। আর আজ দু-ঘণ্টায় দুই-তৃতীয়াংশ পথ মাত্র অতিক্রম করেছি। আরও অন্তত ঘণ্টাখানেক লাগবে সঙ্গমে পৌঁছতে। তারপরে স্নান এবং শিবিরে ফিরে যাওয়া। এই ঠাণ্ডায় ছ-সাত ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজে শরীরের কি হাল হবে, মা-গঙ্গাই বলতে পারেন।

এখান থেকে সঙ্গমে যাবার এই একটিই পথ। আমরা যে পুল পেরিয়ে গঙ্গাদ্বীপে পৌঁছলাম, তার উত্তরে আরও দুটি পুল রয়েছে। সে-দুটি পুল পেরিয়ে যাঁরা গঙ্গাদ্বীপে আসছেন, তাঁরাও এই পথ দিয়ে সঙ্গমে যাচ্ছেন। সুতরাং পথে খুবই ভিড়।

এখানে পথের বাঁদিকে অর্থাৎ পুবে কোনো তাঁবু নেই। ফাঁকা মাঠ, গঙ্গা

পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে মাঝে কিছু লোক কেবল জটলা পাকিয়ে বসে আছে। কাল বহুলোক এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা প্রায় সকলেই স্নান সেরে চলে গিয়েছেন। কোনো কারণে কিছু লোক এখনও আছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা সামান্য। এক কথায় বেলাভূমি প্রায় ফাঁকা।

কানাই প্রথম প্রস্তাব করে, "ঐ মাঠে নেমে দক্ষিণ-পুবে এগিয়ে গেলে কেমন হয়? বেলে মাটি, তেমন কাদা নেই, বেশ তাড়াতাড়ি পথচলা যেতো!"

সুধাংশুও পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে, "বাঁদিকে বালির ময়দানে নেমে যান শঙ্কুদা, ওখানে ভিড় নেই।"

আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি পছন্দ হবার মতো। তবু দ্বিধা করি। এমন কাদা ভেঙে আর ঠেলা-ঠেলি করে এত মানুষ পথ দিয়ে চলেছে, তবু ওখানে কেউ নামছে না কেন? কেউ কি দেখতে পাচ্ছে না, ওখানে কাদা কম, মানুষ নেই। শীতকষ্ট আর স্নানের উত্তেজনায় এঁরা কি সবাই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন?

না, দৃষ্টিশক্তি হারাবেন কেন? তবে অনেক সময় এমন হয়। মানুষ কাছের জিনিস দেখতে পায় না, দূরের আলেয়ার দিকে ধাওয়া করে।

পেছন ফিরে ইসারা করি একবার। তারপরে পথ থেকে নেমে আসি বেলাভূমিতে। এতক্ষণ যেমন জোরে হাঁটতে পারি নি, তেমনি আবার থামতেও পারি নি। এককথায় পা-দু'খানি আমার হলেও সে দু'খানি নিজের ইচ্ছায় চালনা করতে পারি নি এতক্ষণ। ভিড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা চালাতে হয়েছে। এবারে সে পরাধীনতার অবসান ঘটেছে। সুতরাং একটু দাঁড়ানো যাক, ওরা সবাই আসুক।

আরও একটা সুবিধে হয়েছে। এতক্ষণ রুমালের পতাকা উঁচু করে রাখতে হয়েছে। অবশ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হাত নামাতে পারি নি। এবারে সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সহযাত্রীরা একে একে নেমে আসে নিচে। শঙ্করী হাত ধরে ঠাকুরমাকে নামাচ্ছে। না, এ মেয়েটার দেখছি মাউণ্টেনিয়ার হওয়া উচিত ছিল।

কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়ে আবার চলা শুরু করা গেল। এখানে ভিড় নেই, কাদা কম। সুতরাং স্বচ্ছন্দে চলা যাচ্ছে।

কিন্তু মাত্র কয়েক পা। তারপরেই থামতে হলো। এখানে কাদা নেই কিন্তু তার বদলে যা আছে, তা পেরিয়ে পথ চলা আরও কষ্টকর। কাদা ভাঙা ও ভিড় ঠেলা এর চেয়ে অনেক সহজ। এখন বুঝতে পারছি, আমাদেরই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল। দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হয়েই আমরা পথ ছেড়ে মাঠে নেমে এসেছি।

এটি ফাঁকা মাঠ। সুতরাং অগণিত নিরাশ্রয়ে মানুষ এই মাঠে আশ্রয় নিয়েছিল। গতকাল রাতে স্নান শুরু হবার পর থেকেই তারা দলে দলে পাততাড়ি গুটিয়েছে। যাবার বেলায় এখানেই প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে গিয়েছেন। ফলে বোতল কৌটো এবং উনুনের ছাইয়ের সঙ্গে সর্বত্র মল-মূত্র ছড়িয়ে আছে। এই নরক দিয়ে পথচলা সত্যই দুঃসাধ্য।

কিন্তু এখন আর ফেলে আসা পথে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। যা ভিড় তাতে পথে ওঠা যাবে না। নিশ্ছিদ্র মানুষের মিছিলে এতগুলো মানুষের জায়গা করে নেওয়া অসম্ভব।

অতএব এই বিষ্ঠাময় ভূখণ্ডের ভেতর দিয়েই এগিয়ে চলতে হয়। না, মোটেই জোরে হাঁটতে পারছি না। দেখে দেখে এক-পা দু-পা করে পথ চলতে হচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই সমূহ বিপদ। তবে ভরসা এই যে আমরা গঙ্গাস্নানে চলেছি।

আরও একটা অসুবিধে রয়েছে। কেবল নাক টিপলেই চলছে না, মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করার প্রয়োজন পড়ছে। যাঁরা কোন কারণে ইতিপূর্বে প্রাতঃকৃত্য সারতে পারে নি, তারা এখন সেই শুভকর্মটি সুসম্পন্ন করে নিচ্ছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এখানে-ওখানে উপবিষ্ট।

তবু আমরা চোখ বন্ধ করতে পারছি না। কারণ তাতে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। তাই ভাবতে হয়, চোখ বন্ধ করায় কি আছে? ওরা যখন আমাদের দেখে লজ্জা পাচ্ছে না, তখন আমরা ওদের দেখে লজ্জা পাবো কেন?

মাঝে মাঝে ঢালু জায়গা, অনেকটা গর্তের মতো। সেখানে জল জমে আছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা জল। আমরা জল ভেঙে এগিয়ে চলি।

অসুবিধে যতই হোক, মেয়েরা বিশেষ করে ঠাকুরমা যতই নোংরা-নোংরা বলে চেঁচামেচি করুন, আমরা কিন্তু আধঘণ্টায় দু'ঘণ্টার পথ পেরিয়ে এলাম। সঙ্গম আর দূরে নয়, সামনেই ঘাট। ঘাট তো নয় জনসমুদ্র।

সবাই নিজ নিজ পা দেখে নিই। না, কাদা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। থাকলেও গঙ্গা-যমুনার পুণ্যবারিতে ধুয়ে যাবে সব। আড়াই ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের পরে সঙ্গমে এসেছি। আমরা কুম্ভস্নান করব, অমৃতলাভ করব। আমরা সৌভাগ্যবান। মা-গঙ্গা, মা-যমুনা! তোমাদের শতকোটি প্রণাম।

প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ জলে নামছেন, হাজার হাজার মানুষ জল থেকে উঠে আসছেন। কারও মুখে মন্ত্র, কারও বা হর-পার্বতী ও গঙ্গা-যমুনার

জয়ধ্বনি। মনে তাঁদের নানা আশা আর আকাঙ্ক্ষা, প্রাণে পরম পরিতৃপ্তি। তাঁরা যে অমৃত লাভ করেছেন, কিংবা করতে যাচ্ছেন।

চারিদিকে পূজা-পার্বণ শ্রাদ্ধ-শান্তি ও যাগ-যজ্ঞ সমানে চলেছে। বৃষ্টি খানিকটা কমেছে, এখন টিপ-টিপ করে পড়ছে। তাহলেও যজ্ঞের আগুন দেখতে পাচ্ছি না, কেবলই ধোঁয়া উঠছে যজ্ঞকুণ্ড থেকে।

সঙ্গমে পৌঁছে রুমালের পতাকা আবার ওপরে ওঠাতে হয়েছিল। এবারে নামানো যেতে পারে। পতাকাটি মাটিতে পুতে দিই। এখানে একটু ফাঁকা জায়গা রয়েছে। আমরা দাঁড়াতে পারব কোনমতে।

গায়ের গরম চাদর ভিজে ঢোল হয়েছে। চাদরটা গা থেকে খুলে একটা দিক বিদিশার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি, "একটু ধরো দেখি, নিংড়ে নেওয়া যাক।"

ভাল করে নিঙড়ানো গেল না, তবে অনেকটা জল ঝরে গিয়েছে। বিদিশাকে আবার বলি, "এবারে চাদরটা মেলে ধরো।" আর সবাইকে বলি, "তোমরা এর ওপরে জামা-কাপড় রেখে, জলে নেমে যাও। বেশি দূরে যেও না, অযথা দেরি ক'রো না।"

পদ্মা আমাকে জিজ্ঞেস করে, "তোমরা দুজন স্নান করবে না, ভাইপো!"

"করব বৈকি!" উত্তর দিই, "তোমরা এসে চাদরটা ধরবে, আমরা জলে নামব।"

ওরা একে একে জলে নেমে যায়। সেজদি ঠাকুরমার হাত ধরে আগে আগে জলে নামছেন। মিসেস মণ্ডলের কথামত আমি ও বিদিশা সবার দিকে নজর রাখি।

"আমি আর স্নান করব না ঘোষদা!" সহসা বিদিশা বলে ওঠে।

বিস্মিত হই। কি বলছে সে? একটিমাত্র ডুব দেবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ বিপন্ন করে যেখানে ছুটে এসেছেন, যে মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করেছেন, সেই পরমলগ্নে সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে স্নান করবে না!

আমি ওর দিকে তাকাই। সে ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করে আমাকে, "কি হবে স্নান করে, আপনিতো সবই জানেন। কোন পুণ্যই যে আমার এ হতভাগ্য জীবনকে স্পর্শ করতে পারবে না।"

ওর জীবনের কিছু কথা আমি জানি। বড়লোক বাপের অতি আদরের ছোট মেয়ে বিদিশা। সংসারের স্বার্থপরতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছে। পুণ্যার্জনের বাসনা হয়েছে শেষ।

তবু বলি, "কুম্ভস্নান করলে সব পাপ ধুয়ে যায়, জীবনে পুণ্যের স্পর্শ লাগে, এমন কথা আমিও বিশ্বাস করি না বিদিশা! কিন্তু ভেবে দেখো, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেও এই পুণ্যতিথিতে এই সঙ্গমে স্নান করে মানুষ শান্তি লাভ করেছেন, আজও করছেন। পৃথিবীর এত পরিবর্তন সত্ত্বেও সেই মানসিকতার মৃত্যু হয় নি। তখন জীবন কত সরল ছিল, তবু তাঁরা ছুটে আসতেন এখানে। আজ জীবন এত জটিল হয়েছে, তবু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে প্রায় দেড়কোটি মানুষ ছুটে এসেছেন এখানে। তুমি কি এখানে এসেও তাঁদের সামিল হবে না?"

আমি ওর দিকে তাকাই। সে মাথা নিচু করে, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় না। আমি আবার শুরু করি, "সমুদ্রমন্থনের পরে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি যে অমৃত নিয়ে এসেছিলেন, কুম্ভস্নান করলে সেই অমৃত লাভ হয় কিনা, জানা নেই আমার। অমৃত লাভ করলে অ-মৃত হওয়া যায় কিনা, তা-ও জানি না আমি। আমি শুধু জানি এই সংখ্যাতীত মানুষের পুণ্যস্নানের আকাঙ্ক্ষাই অমৃত-সমান। সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাই এঁদের সবাইকে অ-মৃত করে তুলবে।

"এই অমৃতময় পরিবেশ থেকে নিজেকে পৃথক করে রাখা চরম-স্বার্থপরতা। তার চেয়ে বরং তুমিও সবার সঙ্গে স্নান ক'রো, যাঁদের স্বার্থপরতায় তুমি জীবনের মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছো, তাদেরই জন্য তীর্থদেবতার কাছে একটু করুণা প্রার্থনা করো। তাঁকে ব'লো—ঠাকুর, ওদের যেন শুভবুদ্ধি হয়। আমার এই পুণ্যস্নানে যেন তাদের পাপের বোঝা হাল্কা হয়।"

পুণ্যস্নান শেষ করে সহযাত্রীরা উঠে আসে একে একে। কারও কোনো কষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। বরং প্রত্যেকের চোখে-মুখে পরমপ্রাপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। সবার আগে আগে সুধাংশু ও মনোরঞ্জন। তারা গা মুছে জামা-প্যান্ট পালটায়। যা পরল তা-ও ভিজে। এখনও বৃষ্টি পড়ছে। তবু পালটে নিল। কারণ যে পায়জামা পরে ওরা স্নান করেছে, তা পরে শিবিরে ফেরা সম্ভব নয়।

না, কথাটা ঠিক বলা হলো-না। বহু মানুষ সেই জামা-কাপড় পরেই মেলা থেকে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে অতখানি কষ্টসহিষ্ণু হওয়া সম্ভব নয়। তাই জামাকাপড় পাল্টাতে হচ্ছে আমাদের।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম, সুধাংশু ও মনোরঞ্জন আমার চাদর ধরে। বিদিশাকে বলি, "চলো, স্নান করে আসি।"

না, সে আর আপত্তি করে না। নীরবে আমাকে অনুসরণ করে।

অসংখ্য মানুষের পদভারে বেলাভূমি পিচ্ছিল হয়ে আছে। তার ওপরে লোকে লোকারণ্য। জলের ধারে পৌঁছবার পথ খুঁজে পেতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আছাড় খেতে খেতে সামলে নিই একবার। বিদিশাও বার দুয়েক পড়তে পড়তে বেঁচে যায়।

অবশেষে আমরা জলের ধারে আসি। জল তো নয়, কাদার গোলা। কেনই বা হবে না। একে অগভীর, তার ওপরে এত মানুষ একসঙ্গে জলে নেমেছেন।

ঘোলা হলেও, এই মুহূর্তে সারা ভারতের এর একফোঁটা জলের চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তু নেই। লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ও কোটি পুণ্যার্থীর অবগাহনে এই ঘোলাজল এখন দেবাসুরের পরমাকাঙ্ক্ষিত অমৃতে পরিণত। এই পুণ্যবারিতে একটি মাত্র ডুব দিলেই অক্ষয় অমৃত লাভ।

জল তো নয়, বরফ। সত্যি বড্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু নামতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না, বরং ভাল লাগছে।

শুধু ডাঙায় নয়, জলেও সর্বত্র মানুষ। কোনমতে তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা বুক জলে নেমে আসি। অনেকটা দূরে এসেছি। এখানে ভিড় কিছু কম। ভালই হলো। বিদিশা সাঁতার জানে না। তার দিকে নজর রাখা যাচ্ছে।

বিদিশাকে বলি, "তুমি ডুব দিয়ে ওপরে চলে যাও, তারপরে আমি স্নান করব।"

আপত্তি করে না সে। এগিয়ে আসে আমার কাছে। আমার একখানি হাত ধরে সে জলে ডুব দেয়।

তীর্থের দেবতার কাছে বিদিশা কি চাইছে কিছু? চাইলেও কি চাইছে জানা নেই আমার। আমি কেবল ওর হয়ে সেই অবিনশ্বরকে বলি—ঠাকুর, মানুষের বঞ্চনা যেন ওর বাকি জীবনটাকে আর অশান্ত করে না তুলতে পারে। তুমি ওকে শান্তি দাও!

পর পর তিনটি ডুব দেয় বিদিশা, তারপরে উঠে দাঁড়ায়। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দু-হাত জড়ো করে অদৃশ্য দিবাকরের উদ্দেশে প্রণাম জানায়। অবশেষে সে ধীরে ধীরে ফিরে চলে তীরে। যাবার সময় বলে, "বেশিক্ষণ জলে থাকবেন না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

সহাস্যে বলি, "তুমি নিশ্চিন্তে ওপরে যাও। আজ এখানে সারাদিন জলে থাকলেও ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে না। হৃদয়ের উত্তাপে স্নানার্থীদের সবার

শরীর উত্তপ্ত হয়ে আছে। এখানে স্নান করে যে মর্তের মানুষ স্বর্গের অমৃত লাভ করছেন, তাঁরা অমৃতময় হয়ে উঠছেন।"

বিদিশা ওপরে উঠছে। পিসিমা এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করছিল, এবারে সে-ও জল থেকে উঠছে।

দলের সবার স্নান শেস হয়ে গিয়েছে। এবার আমার পালা। আমি কুম্ভস্নান করছি। গঙ্গা ও যমুনার ঘাটে ঘাটে বহুতীর্থে পুণ্যস্নানের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আমি স্নান করেছি গোমুখী ও যমুনোত্রীতে। স্নান করেছি হৃষিকেশ-হরিদ্বার ও মথুরা-বৃন্দাবনে। স্নান করেছি কাশী, নবদ্বীপ ও গঙ্গাসাগরে এবং আরও অনেক তীর্থে। স্নান করেছি এখানেও।

কিন্তু সেসব স্নানের সঙ্গে আজকের এই অবগাহনের কিছু পার্থক্য আছে। আজ এখানে স্নান করার জন্য প্রায় যে দেড়কোটি মানুষ পাগলের মতো ছুটে এসেছে, তাদেরই কয়েক লক্ষ মানুষের মাঝে আমি এখন দাঁড়িয়ে। পূর্ণকুম্ভের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগের পূত সলিলে দাঁড়িয়ে আমি তাই তীর্থের দেবতাকে বলি,— ঠাকুর, এতো শুধু প্রয়াগতীর্থ নয়, এ যে ভারততীর্থ—মহামানবের সাগরতীর, মহাভারতের সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির পবিত্রসঙ্গম।

আজ এই গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বৈচিত্র্যের মাঝে মিলনের মহত্তম রূপ আমি প্রত্যক্ষ করলাম। কে বলে ভারতের মানুষ বিচ্ছিন্নতাবাদী, কে বলে ভারতের জাতীয় সংহতি বিপন্ন? আধুনিকতার সকল প্রকার প্রলোভন সত্ত্বেও আমরা সুপ্রাচীন ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। কোনো 'ইজম্' কোনদিন এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে না। বিশালতম বনস্পতির মতো সনাতন ধর্ম আজও আমাদের সংস্কৃতিকে তার ছায়া-সুনিবিড় কোলে সযত্নে লালন-পালন করে চলেছে। সে বনস্পতির মূল পাতাল পর্যন্ত প্রসারিত। বিজ্ঞানের ঝড় কিংবা রাজনীতির বন্যায় মাঝে মাঝে তার দু-একখানি শাখা-প্রশাখা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু সে বিনষ্ট হবার নয়। সে অক্ষয়, সে অমর, সে অমৃত। এই অমৃত বোধই অমৃত লাভ। আমি কুম্ভস্নান করে সত্যই অমৃত লাভ করলাম। হে তীর্থের দেবতা, তুমি অশেষ করুণাময়। তুমি আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো।

## আট

পুণ্যপ্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে পুণ্যস্নান পরিসমাপ্ত হলো। অমৃত লাভ করে পরিতৃপ্ত অন্তরে উঠে আসি তীরে। বৃষ্টি পড়ছে তবু গা মুছি। জামা-কাপড় প্রায় ভিজে গিয়েছে, তবু তা-ই পরে নিই। তারপরে রুমালের পতাকা হাতে ফিরে চলি শিবিরে। সহযাত্রীরা সারি বেঁধে অনুসরণ করে আমাকে অথবা আমার রুমালের পতাকাকে।

পুণ্যস্নান শেষে আর ঐ বিষ্ঠাময় জনবিরল পথ নয়। জনবহুল পথ দিয়েই এগিয়ে চলি।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। আর ভিড়! ভিড়ের কথা না বলাই ভাল। সকালে দুএকজনকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুনেছি, এই আবহাওয়ায় অনেকেই স্নান না করে পালিয়ে যাবে। বৃষ্টির জন্য নাকি কুম্ভস্নানে লোক কম হবে।

তাদের বোধকরি খেয়াল ছিল না—প্রকৃতির ভয়ে মানুষ কখনও ঘরে বসে থাকে নি। প্রকৃতিকে জয় করতে চেয়েছে বলেই মানুষ আজ মানুষ হয়েছে।

সুতরাং ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানুষ আসছে। পুণ্যলোভাতুর মানুষ আসছে আর আসছে। অমৃতের পুত্র অমৃতের সন্ধানে আসছে আর আসছে। অতএব ভিড় বাড়ছে।

কর্দমাক্ত পথে মানুষের অন্তহীন প্রবাহের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে আমরা ফিরে চলেছি শিবিরে। মনে মনে তীর্থের দেবতাকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলেছি পুলের দিকে।

আগেই বলেছি মূল-ভূখণ্ড থেকে গঙ্গাদ্বীপে আসার জন্য চার পাঁচ ও ছ' নম্বর পুল আর ফেরার জন্য এক দুই ও তিন নম্বর পুল। এক ও দু' নম্বরে প্রচণ্ড ভিড় দেখে আমরা এগিয়ে এসেছি তিন নম্বরের সামনে। কিন্তু এখানেও দেখছি ভিড় কিছু কম নয়, বরং বেশি। সারা পথ জুড়ে মানুষ, আর সে জনসমুদ্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমরা তাদের পেছনে লাইন লাগাই।

লাইন লাগাতে আপত্তি নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাথার ওপরে জল, পায়ের নিচে কাদা আর চারিদিকে ঠেলাঠেলি। তাহলেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

পুলের মুখে ধস্তাধস্তি সমানে চলেছে। কারণ ওখানে ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি বড়ই হাস্যকর। দু'জন পুলিশ পুলের গোড়ায় দু'পাশে দাঁড়িয়ে দু'খানি লাঠির

সাহায্যে জনতার জোয়ার রুখতে চাইছে। কেউ তাদের কথা শুনছে না, শোনা সম্ভবও নয়। যেখানে পেছনে প্রবল চাপ, সেখানে লাঠির ভয়ে লোক থমকে দাঁড়াবে কেমন করে? ফলে পুলিশরা মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে এলোপাথারি লাঠি চালাচ্ছে। কিছু লোক আহত হচ্ছে, অনেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভিড়ের চাপ কমছে না।

মনে পড়ছে গঙ্গাসাগর মেলার কথা। মকরসংক্রান্তির পুণ্যপ্রভাতে সেখানেও সংখ্যাতীত মানুষ কপিলমুনির মন্দিরে যায়। কিন্তু এখানে যে ভিড় দেখছি তার তুলনায় সে ভিড় কিছুই নয়। এই ভিড় ঠেলে ওপারে যেতে হবে, ভাবতেও শিউরে উঠছি।

কিন্তু যেতে তো হবেই এবং সে যাওয়া নিজের ইচ্ছেয় নয়। পেছনের চাপে একটু একটু করে এগোতেই হচ্ছে সামনে। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ লাগবে ঐ পুলে পৌঁছতে আর পুল পেরোতে। এদিকে যে সমানে বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসের বেগ বাড়ছে। শীতে সর্বশরীর হিম হয়ে আসছে।

আমারই এই অবস্থা, শিশু ও বৃদ্ধদের কষ্ট কল্পনাতীত। ঠাকুরমারও খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলছেন না। আমাদের সঙ্গে সমানে কষ্ট সয়ে চলেছেন।

শেষ পর্যন্ত আমরা অক্ষত শরীরেই পুল পেরিয়ে এলাম। পুলের ওপরে যে কষ্ট পেয়েছি, তা বর্ণনাতীত। কেবল ভিড় নয়, মানুষের পায়ে পায়ে প্রচুর কাদা জমেছে ওপরকার লোহার পাতের ওপরে, ফলে প্রচণ্ড পিচ্ছিল। আর সাড়ে চার শ' ফুট দীর্ঘ সেই পিচ্ছিল পুলটি পার হতে প্রায় একঘণ্টা সময় লেগেছে। আমরা দশটায় কুম্ভস্নান করেছি, এখন বেলা সাড়ে এগারোটা।

এপারে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। পুলের পরেই তিনটি পথ তিনদিকে প্রসারিত। আমরা ডাইনের পথটি ধরলাম। এপথে ভিড়ের তেমন চাপ নেই। এখন আশা হচ্ছে অমৃতলাভ করে পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে ঘরে ফিরতে পারব।

শিবিরে ফিরে আসতে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা শিবিরে পৌঁছলাম। প্রায় ছ'ঘণ্টা প্রাণপাত পরিশ্রম ও প্রচণ্ড দৈহিক কষ্ট সহ্য করে মাত্র তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কুম্ভস্নান শেষ করেছি। তবে যত কষ্টই হয়ে থাক, আমরা সবাই সুস্থ শরীরে শিবিরে ফিরতে পেরেছি। তাই তীর্থের দেবতাকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই।

তাঁবুতে ফিরে আবার জামা-কাপড় পালটাতে হলো। আমার অবশ্য জামা

কিংবা কাপড় বলতে কিছুই আর শুকনো নেই। আছে একখানা লুঙ্গি, একটি গেঞ্জি ও একটি গাড়োয়ালী কম্বলের গলাবন্ধ কোট। তাই পরে নিয়ে খাটিয়ার ওপরে জাঁকিয়ে বসলাম। আর তখুনি গরম চায়ের কাপ হাতে পেলাম।

দাদু চিৎকার করে উঠলেন—কুণ্ডু ট্রাভেল্‌স কী···

—জয়! সবাই সোচ্চার স্বরে সাড়া দিই।

কিন্তু তখনও জানা ছিল না যে আমাদের জন্য আরও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে। চায়ের খালি কাপ ফিরিয়ে দেবার অনতিকাল পরেই বেগুনী ও আচার সহযোগে থালায় থালায় ধূমায়মান খিচুরি এসে হাজির হলো, একেবারে খাটিয়ার ওপরে। সকাল থেকে পেটে দানা-পানি পড়ে নি। অভুক্ত থেকেই পুণ্যস্নান বিধেয়।

যেমন শীত করছে, তেমনি খিদে পেয়েছে। এখন গরম খিচুরির চেয়ে প্রিয়তম বস্তু আর কি হতে পারে এ সংসারে?

"কুম্ভস্নান কেমন হলো?" ছাতা বুজিয়ে তাঁবুতে ঢুকলেন মিসেস মণ্ডল। তাঁর সঙ্গে গোরাদা।

"আসুন, আসুন।" আমরা সমস্বরে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

ওঁরা আমার খাটিয়ায় বসেন। পা ঝুলিয়ে বসতে হয়। কারণ দুজনেরই পায়ে কাদা।

মিসেস মণ্ডল আবার জিজ্ঞেস করেন, "স্নান কেমন হলো?"

"ভালই।" উত্তর দিই।

"খুব কষ্ট পেলেন তো! যা বৃষ্টি!"

"বৃষ্টি ও শীতের তুলনায় কিন্তু তেমন কষ্ট পাই নি।" দাদু উত্তর দেন।

গোরাদা হাসতে হাসতে বলেন, "এটা মনের ব্যাপার। কষ্ট খুবই পেয়েছেন, তবে কুম্ভস্নানের আনন্দে সে কষ্টকে এখন আর কষ্ট বলে মনে হচ্ছে না।"

কথাটা বোধকরি মিথ্যে নয়, তাই প্রতিবাদ করতে পারি না। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি, "ফকিরবাবু কোথায়?"

"ন'দা শহরে গিয়েছেন। কারণ বৃষ্টিতে একটা বাড়তি বিপদ হয়েছে।" মিসেস মণ্ডল যেন চিন্তিত।

জিজ্ঞেস করি, "কি?"

"সেদিন রাতেই তো দেখেছেন বিভিন্ন স্কুল কলেজের খেলার মাঠে বাস-ডিপো করা হয়েছে। বৃষ্টির জন্য বাসগুলো সব মাটিতে বসে গিয়েছে। কাল যাতে বাসগুলো উদ্ধার করতে সময় নষ্ট না হয়, ন'দা তারই চেষ্টায় গেছেন।

আমিও যেতাম তাঁর সঙ্গে। কিন্তু একটু আগে খবর পেলাম পাঁচ নম্বর বাসটা শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। আমি এখন সেই বাস এর যাত্রীদের জন্ত অপেক্ষা করছি।"

"পাঁচ নম্বর বাস আজ এলো!" আমরা বিস্মিত। "এত দেরি হলো কেন?"

"যে বাসকে এ্যাড্‌ভান্স দিয়ে ঠিক করে আসা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সে বাস আসে নি। বাস আসবে না শুনে কিছু যাত্রী টাকা ফেরৎ নিয়ে বাড়ি চলে যান, কিছু যাত্রী আমাদের স্টাফ্‌দের জন্য রিজার্ভ করে রাখা গাড়ে রেলে এসেছেন। কিন্তু বারোজন যাত্রী বলে বসেন, আমরা বাস চাই। তখন বাধ্য হয়ে ম্যানেজার মলয়বাবুকে সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা বাস ভাড়া করতে হয়। বাসটা লাইনের সাধারণ বাস। পরশুদিন সকালে রওনা দিয়ে একটানা চলে আজ কিছুক্ষণ আগে এলাহাবাদ পৌঁচেছে।"

"বারোজন যাত্রীর কাছ থেকে আপনারা মোটে হাজার চারেক টাকা পেয়েছেন, অথচ তাঁদের জন্য সাত হাজার টাকা কেবল গাড়ি ভাড়া দিলেন!" দাদু রীতিমত বিস্মিত।

কিন্তু মিসেস মণ্ডল কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সুধাংশু বলে, "উপায় কি, ব্যবসার 'গুড্-উইল' বজায় রাখতে হলে, এমন লোকসান দিতেই হয়।"

মিসেস মাথা নাড়েন। তারপরে বলেন, "পাঁচ নম্বরের যাত্রীরা যে কোন সময় শিবিরে পৌঁছতে পারেন। তাঁরা সবাই শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত। তাঁদের স্নান করিয়ে এনে খাইয়ে দাইয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

কানাই জিজ্ঞেস করে, "পাঁচ নম্বরের যাত্রী নিয়ে আমরা আজ তাহলে কতজন এ শিবিরে থাকব?"

"তা প্রায় সোয়া দু'শ যাত্রী এবং তিরিশ জন স্টাফ্।" গোরাদা উত্তর দেন।

কাকু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "আচ্ছা, আপনারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয়েও এই ধর্মমেলায় জায়গা পেলেন কেমন করে?"

"কোনো এক আশ্রম তাঁদের মোহান্তের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য এই জমিটা ছেড়ে দেন। প্রচুর তদ্বির করে আমরা এটি পেয়েছি। এজন্য আমি তো প্রায় মাসখানেক এলাহাবাদে পড়ে আছি। ন'দাকেও বার বার আসতে হয়েছে এখানে।"

"জমির জন্ত আপনাদের কিছু ভাড়া দিতে হয়েছে?" নিরঞ্জনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

মিসেস মণ্ডল উত্তর দেন, "হ্যাঁ। তবে তা খুবই কম। আসল খরচ তাঁবুর

ভাড়া।" একবার থামেন মিসেস। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠেন, "আপনারা এখন বিশ্রাম করুন, আমরা আসি।" তিনি উঠে দাঁড়ান। গোরাদাও তাঁকে অনুসরণ করেন।

"না, না, আমাদের বিশ্রামের দরকার নেই। আপনি বসুন না।" আমি অনুরোধ করি।

কিন্তু মিসেস মণ্ডল সে অনুরোধ উপেক্ষা করেন, "না, আর বসব না। সব তাঁবুতে একবার করে যেতে হবে। তারপরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভারত সেবাশ্রমের সামনে, পাঁচ-নম্বরের যাত্রীদের জন্য। তাঁদের তদারকি শেষ করে ছুটতে হবে শহরে। হাজার হাজার বাস-এর মধ্য থেকে আমাদের বাস খুঁজে বের করা ন'দার একার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন আসি। নমস্কার।"

গোরাদাকে সঙ্গে নিয়ে মিসেস মণ্ডল বেরিয়ে যান তাঁবু থেকে। আমি মনে মনে তাঁরই কথা ভাবতে থাকি। কত বড় ঘরের শিক্ষিতা মহিলা। পয়সা রোজগারের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কাজ করতে ভালবাসেন বলে, কি অমানুষিক পরিশ্রম করছেন। এমন কর্মপ্রিয় কষ্টসহিষ্ণু মহিলা যে কোনো জাতির গৌরব।

আমাদের দলের মহিলারা রয়েছেন পাশের তাঁবুতে। মিসেস মণ্ডলকে দেখে সেজদি, শঙ্করী ও পদ্মা আমাদের তাঁবুতে এসেছিল। এবারে তারাও উঠে দাঁড়ায় নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যাবার জন্য। আমি বাধা দিই। সেজদিকে বলি, "বসুন। আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, আপনাদের কাছে।"

"কি প্রশ্ন ?" সেজদি আবার খাটিয়ায় বসে পড়েন।

উত্তর দিই, "আপনি কেন কুম্ভমেলায় এসেছেন, তীর্থ কিংবা মেলার আকর্ষণে ?"

"তীর্থের···।" সঙ্গে সঙ্গে সেজদি উত্তর দেন। বলেন, "বিশেষ করে যোগের জন্য। এমন সুযোগ যে আর আসবে না আমার জীবনে।'

সেজদি থামতেই শঙ্করীকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি কেন এসেছো এই মেলায় ?"

"আমিও তীর্থের আকর্ষণে এসেছি।" শঙ্করী উত্তর দেয়।

"আচ্ছা, এই মেলার কী বিশেষ বৈশিষ্ট্য তোমার চোখে পড়ল ?"

"প্রথমত মেলার বিশালত্ব, দ্বিতীয়ত সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাগম আর তৃতীয়ত ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ ও ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবারই সমান অধিকার এই মানুষের মহামেলায়।"

"আজ স্নানের জন্য খুবই কষ্ট করতে হয়েছে কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে না,

তোমার সব কষ্ট সার্থক হয়েছে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি কি অমৃত লাভ করেছো ?"

"খুব কঠিন প্রশ্ন করলেন ঘোষদা! তবে অমৃত যদি মনের আনন্দ আর হৃদয়ের অনুভূতি হয়, তাহলে বলব—লাভ করেছি। আজ স্নানের পরে আমার মনে যে আনন্দের শিহরণ জেগেছে, তা বহুকাল স্থায়ী হবে। সেই থেকে আমি হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব পরিতৃপ্তি অনুভব করছি।"

সেজদি ও শঙ্করী নিজেদের তাঁবুতে চলে যায়। ইতিমধ্যে সহযাত্রীরা সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। কিই বা করবে ? সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। পথে যেমন জল-কাদা, তেমনি মানুষের ভিড়।

কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম মেলায় এসে শুয়ে-বসে সময় কাটাবো ? আমি তো পুণ্যসঞ্চয় করতে আসি নি, আমি যে পুণ্যার্থীদের দেখতে এসেছি। অমৃতলাভ আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি অমৃতময় মানুষকে জানতে এসেছি। সে দেখা আর জানা যে শেষ হয় নি আমার! আর কতক্ষণই বা থাকতে পারব এই মহা-মেলায় ? পথে বের হলে কিছু কষ্ট হয়তো হবে, কিন্তু তার চেয়ে যে অনেক বেশি আনন্দ লাভ করতে পারব।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি। সহযাত্রীদের সবাইকে কথাটা বলি। কিন্তু ওদের শরীর নাকি শীতে হিম হয়ে গেছে, এখন কম্বল ছাড়লে জমে যাবে। অতএব আমি একা।

কিন্তু আমার যে শুকনো জামা-কাপড় নেই! এই লাল লুঙ্গি আর কালো কোট পরে পথে বের হওয়া যায় কি ?

দোষ কি ? চেনা কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই বা লজ্জা পাবার কি আছে ? কে আর কুম্ভমেলায় বেশি জামা-কাপড় নিয়ে এসেছে ? অকাল বর্ষণে সবারই আমার অবস্থা।

তবে একজোড়া রবারের জুতো এবং একটা ছাতা দরকার। পথে যা কাদা তাতে যেমন চামড়ার জুতো অচল, তেমনি খালি মাথায় পদচারণা সম্ভব নয়। সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

কথাটা বলতেই দাদু তাড়াতাড়ি মাথার ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে বলেন, "আমি তো বাটার স্যাণ্ডাক্ পরে এসেছি।" হাত বাড়িয়ে জুতো-জোড়া খাটিয়ার তলা থেকে বের করে আবার বলেন, "দেখুন তো আপনার পায়ে লাগে কিনা ?"

দাদু হাত সরালে আমি জুতো-জোড়া কাছে টেনে এনে পা ঢোকাই।

বলি, "একটু বড়।"

দাছ্ উঠে বসেন। দেখে বলেন, "সামান্ত বড়, সামনের দিকে খানিকটা নেকড়া দিয়ে নিলেই পায়ে লেগে যাবে। আপনি তো আর জুতো পড়ে দৌড়াদৌড়ি করবেন না, হেঁটে বেড়াবেন। বেরিয়ে পড়ুন।"

"কিন্তু আপনি তো এই একজোড়া জুতো নিয়ে এসেছেন। আপনি যে আর বেরুতে পারবেন না!"

"বেরুবো না। বের হবার আমার দরকারও নেই দাদা। আর আমি তো বই লিখব না। তার চেয়ে আপনি মেলা দেখলে আমাদের সবার দেখা হবে। 'Thy necessity is greater than mine."

হাসতে হাসতে বলি, "পায়ের সমস্যা মিটল, এখন মাথা বাঁচাই কেমন করে?"

সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশু বলে, "কেন শঙ্করী তো ছাতা এনেছে!"

"সেটা যে রঙিন লেডিজ ছাতা!" আমি আপত্তি করতে যাই।

কাকু ধমক লাগায়, "তাতে কি হয়েছে! আজকাল ছেলেরা হামেশা মেয়েদের ছাতা মাথায় দিয়ে অফিস করছে। তাছাড়া তোকে কে চিনতে পারবে এখানে? পারলেও কেউ কিছু মনে করবে না। এটা মানুষের মেলা, পোশাক নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না এখানে।"

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই মনোরঞ্জন বলে, "আপনি জুতো পরুন, আমি ছাতা নিয়ে আসছি।" সে বেরিয়ে যায় তাঁবু থেকে।

দাছ্ তাঁর থলে থেকে খানিকটা নেকড়া বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেন, "জুতো পরে ফেলুন।"

একটু বাদে মনোরঞ্জন ছাতা নিয়ে আসে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি পথের দিকে। শিবিরের কেউ দেখতে পাবার আগেই জনারণ্যে মিশে যেতে হবে। কারণ আয়নায় না দেখেও বেশ বুঝতে পারছি, আমার পোশাক দেখে তাঁরা পুলকিত হয়ে উঠবেন। পায়ে রবারের সাদা জুতো, পরণে লাল লুঙ্গি—দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো হাটু পর্যন্ত ভাঁজ করে কোমরে বাঁধা। গায়ে কালো রঙের গাড়োয়ালী গলাবন্ধ লংকোট আর মাথায় সবুজ লেডিজ ছাতা।

এগিয়ে চলি পথে। পথ তো নয়, মানুষের মিছিল। অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে আর মানুষ আসছে। পথের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

কোথাও কোথাও জল জমেছে, কোথাও বা হাঁটু পর্যন্ত কাদা। একমাসের শিশু থেকে একশ' বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সবাই এ শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছে। কারও পায়ে জুতো আছে কারও নেই। কারও গায়ে কম্বল, কারও চাদর। কারও কাঁধে শিশু, কারও মাথায় বোঝা। কিন্তু কারও কাছে বর্ষাতি কিংবা ছাতা নেই।

পথের বাঁদিক জুড়ে সঙ্গমে যাবার শোভাযাত্রা আর ডানদিক জুড়ে সঙ্গম থেকে ফিরে আসার। জলে কাদায় ও শীতে সবার শরীর কাহিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু কেউ বোধকরি মনোবল হারিয়ে ফেলেন নি। অন্তত মুখের দিকে তাকিয়ে আমার তা-ই মনে হচ্ছে। যাঁরা সঙ্গমে চলেছেন, তাঁদের চোখে-মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। যে করেই হোক, যেমন করেই হোক, তাঁদের অমৃত লাভ করতে হবে।

আর যাঁরা ফিরে যাচ্ছেন, তাঁদের সবার মুখখানি আনন্দদীপ্ত। দেখে মনে হচ্ছে, ওঁদের কোনো দুঃখ নেই, কোনো কষ্ট নেই, কোনো ক্ষোভ নেই। ওঁরা যে পরমধন পেয়ে গিয়েছেন, অমৃত লাভ করেছেন!

তীর্থের দেবতা কিন্তু তাঁর এই স্বর্গীয় সম্পদ সহজে হাতছাড়া করতে চান নি। প্রকৃতির সহায়তায় তিনি মানুষকে কঠিনতম পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। মানুষ সগৌরবে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ অমৃত লাভ করে অ-মৃত হয়েছেন।

আমি তাঁদের দেখি। দু'চোখ ভরে শুধু দেখি আর দেখি। মানুষের এমন শাশ্বত ও সুন্দর রূপ আমি আর কখনও দেখতে পাই নি। কুম্ভমেলায় আসা সার্থক হলো আমার। লক্ষ-লক্ষ পুণ্যার্থীর প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি ভারতের শাশ্বত সনাতন আত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে পারলাম।

কেউ আমার একখানি হাত ধরেছে। তাড়াতাড়ি পেছনে তাকাই। আরে এযে নেহু! আমার বাবার খুড়তুতো ভাই অমলকৃষ্ণ ঘোষ দস্তিদার। বয়সে আমার থেকে একবছরের ছোট, তাই নাম ধরে ডাকি। সঙ্গে তার এক সহকর্মী বন্ধু নীরেন রায়।

ওদেরও আমাদের সঙ্গে আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওরা আমাকে এত দেরিতে জানিয়েছে যে ফকিরবাবুকে বলেও আমি ওদের জায়গা করতে পারি নি। তাই ওরা অন্য একটি পর্যটনসংস্থার সঙ্গে মেলায় এসেছে। তাঁরা শহরে বাড়ি নিয়েছেন। সেখান থেকে স্নান করতে এসেছে। এখন স্নান করে ফিরে চলেছে।

মনে মনে ভাবি ওর সঙ্গে দেখা হওয়া সত্যই একটা অদ্ভুত ঘটনা। কারণ কলকাতায় বসে যখন শুনলাম, ওর কুম্ভমেলায় আসা ঠিক হয়েছে, তখন কথায় কথায় বলেছিলাম—একসঙ্গে যেতে না পারার জন্য দুঃখ ক'রো না, ভাগ্যে থাকলে দেখা হয়ে যাবে।

কথাটা সত্যি হয়ে গেল, কোটি মানুষের মেলায় দেখা হলো নেহুর সঙ্গে। ওদের সঙ্গে হাঁটতে থাকি। হাঁটতে ভাল লাগছে, কিন্তু লজ্জা পাচ্ছি। ওদের জামা-কাপড় ভিজে আর আমার মাথায় ছাতা। ওরা বৃষ্টিতে ভিজছে। অথচ শঙ্করীর ছাতায় তিনজনের মাথা বাঁচানো সম্ভব নয়।

অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে গল্প করতে করতে ওদের সঙ্গে এগিয়ে চলি। কথায় কথায় নেহুকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি কেন কুম্ভমেলায় এলে? মেলার আকর্ষণে অথবা তীর্থের আকর্ষণে?"

নেহু উত্তর দেয়, "মহাপুরুষরা বলেন—ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। কিন্তু ঈশ্বরলাভের উপায় সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমার। শুনেছি কুম্ভস্নান এই জানাকে সাহায্য করে। তাছাড়া পূর্বজন্মের সুকৃতি ছাড়া নাকি ঈশ্বরলাভের প্রাথমিক সোপান অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ভাবলাম—একবার যাচাই করে দেখি যে পূর্বজন্মের কোন সুকৃতি আছে কিনা?"

"তা যাচাই হলো?" জিজ্ঞেস করি।

নেহু উত্তর দেয়, "হ্যাঁ। এখন মনে হচ্ছে কিছু সুকৃতি আমার হয়েছে। নইলে যে পরিস্থিতির মধ্যে আমার পক্ষে কুম্ভস্নান সম্ভব হলো, তা নিতান্তই বিস্ময়কর।"

"বিস্ময়কর বলছ কেন?"

"তুমি তো জানো, আমার আসারই ঠিক ছিল না। যাওবা এলাম, মেলায় জায়গা পেলাম না, তার ওপরে এই প্রবল শীত, আমি হাঁপানীর রোগী। কিন্তু বিশ্বাস করো এতটা পথ কাদা ভেঙে বৃষ্টিতে ভিজে স্নান করতে আমার কোনো কষ্ট হয় নি, এখনও হচ্ছে না, বরং বেশ আরাম লাগছে। একে বিস্ময়কর ছাড়া আর কি বলব?"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি, "প্রয়াগের এই কুম্ভমেলার কী বিশেষ বৈশিষ্ট্য তোমার চোখে পড়ল?"

"বৈশিষ্ট্য কিনা বলতে পারব না, তবে এই মেলায় এসে দুটি জিনিস আমার খুব ভাল লেগেছে।"

"কি কি"

"এক গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, যেখানে একটি নীলরেখা দুটি স্রোতধারাকে সর্বদা পৃথক করে রেখেছে। আর দুই এ-মেলার সাধু সমাবেশ।"

"ভারতের অন্য কোনো মেলার সঙ্গে এ-মেলার তুলনা করা যায় কি?"

"না।" নেহু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। বলে, "কারণ প্রথমত একটি ধর্মসভা আর দ্বিতীয়ত সাধুদের সম্মেলন। তার চেয়েও বড় কথা, এটি মিলনমেলা। সাধু-সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে, ধনী-দরিদ্র, অন্ধ-আতুর ব্রাহ্মণ-শুদ্রের এমন মিলন-মেলা ভারতের কেন পৃথিবীতেই আর বোধকরি কোথাও বসে না।"

"তোমার কি এখন মনে হচ্ছে, তুমি অমৃতলাভ করেছ?"

"অমৃতলাভ কাকে বলে জানা নেই আমার। তবে আমি হাঁপানীর রোগী, শীতকালে ঠাণ্ডাজল স্পর্শ করি না। অথচ আজ সেই সকাল থেকে এই ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে ভিজছি। কোনো কষ্ট হচ্ছে না। বরং দেহে একটা আশ্চর্য সুন্দর তৃপ্তি ও মনে এক অভূতপূর্ব প্রশান্তি অনুভব করছি। এই আন্তরিক আনন্দ যদি অমৃতলাভ হয়, তাহলে আমি অবশ্যই অমৃতলাভ করেছি।"

"আচ্ছা, এই কুম্ভস্নানে এসে এমন কিছু দেখেছ, যা তোমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে?"

একটু ভেবে নেহু বলে, "আজ নয়, গতকাল মেলায় একটি দৃশ্য দেখেছি, যার কথা বহুদিন মনে থাকবে।" একবার থামে সে, তারপরে বলতে থাকে, "গতকাল সকালে আমরা রেলে করে এলাহাবাদ এসেছি। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে ব্রেক ফাস্ট্ করেই চলে এসেছি মেলায়। সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছি। দুপুরের খাওয়াও মেলাতেই সেরেছি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যের একটু আগে পৌছলাম গঙ্গার তীরে এক আখড়ার সামনে। দেখি দশ থেকে বিশ বছরের কয়েক শ' ছেলে হাতে দণ্ডা নিয়ে কৌপীন পরে খালি গায়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে তারা সমস্বরে মন্ত্র আওড়াচ্ছে।

'খোঁজ-খবর করে জানতে পারলাম, ওরা দীক্ষা নিচ্ছে। মন্ত্রপাঠের পরে সঙ্গমে গিয়ে একশ' একটি ডুব দেবে। তারপরে কৌপীনটা খুলে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নাঙ্গা হয়ে যাবে। ফিরে আসবে আশ্রমে। এক একটি ছেলে এক একজন সাধুবাবার চেলা হয়ে যাবে। তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম ও সর্বপ্রকার সেবা করবে। বিনিময়ে গুরু তাকে দু-বেলা খেতে দেবেন, আর দেবেন আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও উপদেশ। কালক্রমে তারাও সাধু হয়ে যাবে।"

কথা বলতে বলতে কখন যে বাঁধে উঠেছি, বাঁধ থেকে নিচে নেমে ত্রিবেণী রোড ধরে কোর্ট রোডের সঙ্গমে এসেছি, খেয়াল করি নি। খেয়াল হয়

নীরেনবাবুর কথায়। তিনি আমাকে বলেন, "আপনি কিন্তু বহুদূর চলে এসেছেন। এবার ক্যাম্পে ফিরে যান।"

শিবিরে ফিরব সেই সন্ধ্যের সময়, তবু আর এগুবো না এখন। একে একা-একা ফিরতে হবে, তার ওপরে আমাকে একবার ভারত সেবাশ্রম সংঘে যেতেই হবে আজ।

বিদায় নিই নেহ্রু ও নীরেনবাবুর কাছ থেকে। ওরা এগিয়ে যায় কুম্ভদ্বারের দিকে, আমি ফিরে চলি বাঁধের দিকে।

যাবার সময় কথায় ব্যস্ত ছিলাম, চারিদিকে চেয়ে দেখি নি ঠিকমত। এখন বুঝতে পারছি, অকাল বর্ষণে এদিকটার মানে এই প্যারেড গ্রাউণ্ডের অবস্থা আরও বেশি শোচনীয়। হবেই। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বাঁধের জন্য জল নামতে পারছে না গঙ্গা কিংবা যমুনায়। ফলে প্রায় প্রত্যেক তাঁবুতে হাঁটু সমান জল কোনটিতে বা আরও বেশি। এমনকি ত্রিবেণী রোডের ওপরে পর্যন্ত জল কোথাও কোথাও।

জল ভেঙে বাঁধের ওপরে উঠি, ফিরে আসি সঙ্গম রোডে। তারপরে এগিয়ে চলি ভারত সেবাশ্রম সংঘের দিকে।

সংঘের ভেতরে এসে একটু খোঁজ করতেই পেয়ে যাই বৃদ্ধসন্ন্যাসী মহেশা-নন্দজী ও যুবকসন্ন্যাসী বিবিদিশানন্দজীকে। মহেশানন্দজী গত বিশ বছর এলাহাবাদ সেবাশ্রমে সেবাকার্য করছেন। পূর্ণ ও অর্ধ মিলিয়ে তিনি এলাহাবাদে চারটি ও হরিদ্বারে তিনটি কুম্ভমেলায় সেবাকার্য করেছেন।

সুপুরুষ যুবক সন্ন্যাসী বিবিদিশানন্দ আমার সুপরিচিত। তিনি এখন মেদিনীপুরের মহিষাদল আশ্রমের অধ্যক্ষ। সেবাকার্য করতে এখানে এসেছেন।

মহেশানন্দজী আমাকে তাঁর তাঁবুতে এনে বসালেন। আলাপ করিয়ে দিলেন স্বামী সত্যেশ্বরানন্দ ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের সঙ্গে। সত্যেশ্বরানন্দ আমার জন্মভূমি বরিশালের মানুষ আর সম্বুদ্ধানন্দ মেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকর্তা।

আমার প্রশ্নের উত্তরে সম্বুদ্ধানন্দজী জানালেন, "এবার মেলায় ও এলাহাবাদে আমাদের দু'হাজার স্বেচ্ছাসেবক সর্বদা সেবাকর্মে রত রয়েছে। আর আমরা পঞ্চাশজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী রয়েছি। স্বেচ্ছাসেবকদের আত্মীয়-স্বজন ও আমাদের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী মিলে দৈনিক হাজার দশেক মানুষ প্রসাদ নিচ্ছেন এখানে আর এলাহাবাদ আশ্রমে।"

"আচ্ছা, স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ কি?"

"মেলায় সেবাকার্য বলতে যা কিছু বোঝায়, সব।'

"যেমন ?"

"যেমন হারিয়ে যাওয়া মানুষদের যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া, আহত ও অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, চোর-জুয়াচোরদের কবল থেকে যাত্রীদের রক্ষা করা।" একবার থামেন সম্বুদ্ধানন্দজী, তারপরে আবার বলতে থাকেন, "স্নানের ঘাটে গুণ্ডা-বদমাইশরা সব সময় ঘোরা-ঘুরি করে। তারা সুযোগ পেলেই সরল যাত্রীদের সর্বস্ব হরণ করে, মেয়েদের সম্ভ্রম নষ্ট করে—অনেক সময় তাদের চুরি করে নিয়ে যায়। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সর্বদা ঘাটে ঘাটে পাহারা দেয়। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে।"

সম্বুদ্ধানন্দজী থামতেই সত্যেশ্বরানন্দজী বলেন, "ধরুন আপনি ও আপনার একজন বন্ধু স্নান করতে ঘাটে গিয়েছেন। আপনার কাছে টাকা-পয়সা ঘড়ি আংটি খুলে দিয়ে বন্ধু স্নান করতে নেমেছেন। তিনি স্নান করে উঠে এলে আপনি স্নান করবেন। বন্ধুর জিনিসপত্র সামনে রেখে আপনি বসে আছেন। হঠাৎ কানের কাছে একটা চিৎকার গির্ গিয়া, গির্ গিয়া…। আপনি চমকে উঠে সেদিকে তাকাতেই, অপর পাশ থেকে আর একটা লোক ছোঁ মেরে বন্ধুর জিনিসপত্র নিয়ে মেলায় মানুষের মাঝে মিশে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে যায়, আপনি কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই, যা হবার হয়ে গেল। এইসব জোচ্চোরদের হাত থেকে যাত্রীদের রক্ষা করা আমাদের স্বেচ্ছা-সেবকদের একটি প্রধান কাজ।"

"আরও অনেক কাজ করে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা।" সত্যেশ্বরানন্দজী থামতেই বিবিদিশানন্দ যোগ করেন, "তাঁরা সাধুদের স্নান করায় এবং সঙ্গম-ঘাটের শান্তিরক্ষা করে। এ ছাড়া আগুন নেবানো ।"

"কিন্তু মেলায় তো ফায়ার ব্রিগেড রয়েছে।" আমি বলি।

মহেশানন্দজী সহাস্যে বলেন, "কাছাকাছি আগুন লাগলে, ফায়ার ব্রিগেড আসার আগেই আমাদের ছেলেরা আগুন নিভিয়ে ফেলে। এজন্য আমরা তাদের একটা স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে নিই। লাঠির মাথায় ছুরি বেঁধে নিয়ে তারই সাহায্যে তারা আগুন থেকে তাঁবু কিংবা ঘরের অন্য অংশ আলাদা করে ফেলে। আমাদের আশ্রমেই আগুন নেভাবার জল মজুত করে রাখা হয়। আমাদের ছেলেরা আগুন নেভালে, জিনিসপত্র খুব একটা নষ্ট হয় না।"

"স্বেচ্ছাসেবকরা তো সব এই শিবিরেই থাকে ?"

"হ্যাঁ। ওদিকের ঐ বড় বড় তাঁবুগুলো দেখছেন। ওর এক-একটি তাঁবুতে

দু'শ জন করে স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। মাটিতে পুরু করে খড় বিছিয়ে তার ওপরে শতরঞ্চি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে একখানি করে কম্বল মাদুর ও জলের কুজো দেওয়া হয়। তারা তিনবেলা খাবার ও বিকেলে চা পায়।"

"মেলায় আশ্রম ও শিবিরে কত লোকের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে?"

"তা প্রায় হাজার দশেক।"

মৃদু হেসে বিবিদিশানন্দ বলেন, "শিষ্য ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী, কাউকেই তো আমরা বিমুখ করতে পারি না। তবু তো প্রয়োজনের তুলনায় এ ব্যবস্থা কিছুই নয়।"

"তা এই সব খরচপত্র কে দেয়?"

"আপনারাই দেন। সরকারও কিছু সাহায্য করেন।"

এবারে মহেশানন্দকে বলি, "আপনারা বললেন, মেলায় প্রচুর চোর ও বদমাইসের আগমন ঘটে।"...

ওরা মাথা নাড়েন। আমি বলতে থাকি, "এত বড় আশ্রম, চারিদিকে নানা জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকরাই বোধ হয় এসব পাহারা দেয়?"

"না, না, স্বেচ্ছাসেবকরা পাহারা দেবে কেন? আমাদের দারোয়ান রয়েছে, প্রায় একশ' জনের মতো।"

"একশ' জন দ্বারোয়ান!"

"হ্যাঁ। আমরা তাদের দৈনিক পনেরো টাকা করে মাইনে দিই। তার ওপরে তাদের দুবেলা খেতে দিতে হয়, ভাঙ দিয়ে পেস্তা-বাদামের সরবৎ সরবরাহ করতে হয়।"

"স্বেচ্ছাসেবকদের তো আপনারা কোনো টাকা-পয়সা দেন না?"

"না। তবে এখানে যাতায়াতের রেলভাড়াটা দিই। ভাড়া অবশ্য অর্ধেক লাগে, কারণ আমরা 'সিঙ্গল ফেয়ার-ডাবল জার্নি কনসেশন' পেয়ে থাকি।"

আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ছিল, কিন্তু ওঁরা কাজের মানুষ, ওঁদের আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। তাই উঠে দাঁড়াই। বলি, 'আজ তাহলে আসি মহারাজ।" হাতজোর করে সবাইকে নমস্কার করি।

মহেশানন্দজীও উঠে দাঁড়ান। জিজ্ঞেস করেন, "বড় মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছেন?"

বড় মহারাজ মানে সংঘের এলাহাবাদ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ত্রিলোচনানন্দজী

মহারাজ। উত্তর দিই, "না। আশ্রমে যাওয়াই হয় নি এখনও। যেতে পারব কিনা, তাও জানি না। যদি সময় না করে উঠতে পারি, আপনি তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন।"

ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে বেরিয়ে ফিরে চলি শিবিরের দিকে। মানুষ ও প্রকৃতির সংগ্রাম অপরিবর্তিত। ভগবান প্রকৃতির সহায়তায় মানুষকে পরীক্ষা করছে। মানুষ সগৌরবে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আর ভগবান পরাজিত।

"এই যে মহারাজ! বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?"

পরিচিত নারীকণ্ঠের বাংলা কথা কানে আসে। তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাই। পাশে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম। তোরণের তলায় কালকের সেই ব্রহ্মচারিণী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওখানে জল পড়ছে না। তিনিই প্রশ্ন করেছেন।

পথচারীদের পাশ কাটিয়ে তাঁর সামনে আসি। ছাতা বন্ধ করি। বলা বাহুল্য লেডিজ ছাতা ও বিচিত্র পোশাকের জন্য ভারী লজ্জা লাগছে। কোনো পাঠিকা কোনোকালে এমন পোশাকে তাঁর প্রিয়লেখককে দেখেছেন বলে জানা নেই আমার।

ব্রহ্মচারিণীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমাকে তাই পোশাকের প্রসঙ্গ তুলতে হয়। বলি, "জামা-কাপড় এমনিতেই কম এনেছি। যা এনেছি, তাও সব ভিজে গেছে। কিন্তু মানুষ দেখার এমন সুযোগ যে জীবনে আর কখনও পাবো না। তাই পথে বেরিয়ে পড়েছি।"

"বেশ করেছেন।" ব্রহ্মচারিণী বলেন, "কুম্ভমেলায় কেউ কারও পোশাক নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর এই মেলায় মানুষ দেখা সত্যই বড় আনন্দের। আমিও তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছি। বড় ভাল লাগছে।"

একবার থামেন ব্রহ্মচারিণী। তারপরে আবার বলেন, "কখন স্নান করলেন? শেষরাতে?"

"না।" উত্তর দিই, "আজ সকালে।" সাড়ে ছ'টায় বেরিয়ে সাড়ে বারোটায় ফিরেছি।"

"সেকি! আপনারা সাধুদের স্নান দেখেন নি! মায়ের স্নানযাত্রা দেখেন নি?"

"না।" আবার লজ্জা পেতে হয়। বলি, "সঙ্গে ঠাকুরমা ও পিসীমা সহ ছ'জন মহিলা। তাদের নিয়ে এই ঝড়-জলে অত সকালে সঙ্গম মার্গে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পাই নি। ঘাটে যাবার সময় সাধুদের একটি শোভাযাত্রা

দেখেছি। কিন্তু মা তো তাঁদের মধ্যে ছিলেন না।"

"আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনারা কি হারিয়েছেন?"

"আপনি নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে একটু বলুন না সেই স্নানযাত্রার কথা। শুনে ধন্য হই।"

"বেশ বলছি।" ব্রহ্মচারিণী আরম্ভ করেন, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন ১৯৭৪ সালে হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে নিরঞ্জনী আখড়ার তরফ থেকে মাকে হাতীর পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবারে নিরঞ্জনী আখড়া প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁরা মাকে তিনটি স্নানেই শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবেন।"

ব্রহ্মচারিণী সহসা থেমে যান। তিনি আমার দিকে তাকান।

আমি বলি, "বুঝতে পেরেছি। তিনটি স্নান মানে মকর সংক্রান্তি, মৌনী অমাবস্যা ও শ্রীপঞ্চমীর স্নান। আপনি বলুন।"

ব্রহ্মচারিণী শুরু করেন, "আপনি জানেন, আমাদের দিদিমা অর্থাৎ মায়ের গর্ভধারিণী মা শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজী কিছুদিন হল অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন?"

"হ্যাঁ।" আমি মাথা নেড়ে বলি, "বন পরিক্রমার সময় বৃন্দাবনে দিদিমাকে দর্শন করার সুযোগ হয়েছে আমার! তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি।"

"দিদিমার সন্ন্যাসগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ মঙ্গলগিরিজী নিরঞ্জনী আখড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাই নিরঞ্জনী আখড়ার সন্ন্যাসীরা মাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। এদিকে নিরঞ্জনী আখড়ার মোহন্তজী শ্রীশ্রীগিরিনারায়ণজীও মাকে খুব ভক্তি করেন। তিনি বললেন—মায়ের কুম্ভমেলায় প্রবেশের শোভাযাত্রার ব্যবস্থা তাঁর আখড়া থেকে করা হবে এবং স্নানযাত্রার আয়োজন করবেন নিরঞ্জনী আখড়া।"

একবার থামলেন ব্রহ্মচারিণী। তারপরে আবার বলতে থাকেন, "গতকাল ঐ ঝড়-বৃষ্টি ও ঠাণ্ডার মধ্যেও আমরা রাত আড়াইটের ঘুম থেকে উঠে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ করেছি। ভোর সাড়ে পাঁচটায় মার তাঁবুতে ঢুকে দেখি, তিনিও প্রস্তুত। মা নিজ হাতে আমাদের সবাইকে একখানি করে হলুদ রুমাল দিয়ে মাথায় বেঁধে নিতে বললেন।" আমরা যাতে ভিড়ের মাঝে দলছাড়া না হয়ে যাই, তাই তাঁর এই ব্যবস্থা।

"এই সময় কন্যাপীঠের একটি বাচ্চা মেয়ে ছুটে এসে মাকে বলল—মা বাইরে বড্ড বৃষ্টি। একটু না কমলে বেরুবো কেমন করে? বৃষ্টিটা কমাও!

"মা মৃদু হেসে বললেন—দেখ, তোদের বাক্য যদি সিদ্ধ হয়?

"সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সত্যি সত্যি সহসা বৃষ্টিটা বেশ কমে গেল। মা আশ্রম থেকে বের হয়ে মোটরে উঠলেন। তিনি ভোর ছ'টায় নিরঞ্জনী আখড়ায় পৌঁছলেন। সেখানে ফুল ও মালা দিয়ে একটি পাল্কী সাজানো হয়েছিল। পাল্কীর ওপরে প্রায় একতলার সমান উঁচু একটা রুপোর সিংহাসন। মা নিজেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই সিংহাসনে গিয়ে বসলেন।

"মায়ের পরনে সরু হলুদপাড় সাদা গরদ, গলায় রজনীগন্ধা ও শোলার মালা। স্মিত হাসিতে তাঁর শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। বেদধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত।

"মায়ের একনিষ্ঠ সেবিকা কাশ্মীর দুহিতা উদাসজী তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। প্রবীণ বাঙালী সাধু স্বামী পরমানন্দজী বসলেন মায়ের পেছনে। আর রুপোর ঝালর দেওয়া বিরাট সাদা স্যাটিনের ছত্র নিয়ে পরমানন্দজীর পাশে দাঁড়ালেন ভজন-সন্ন্যাসী শ্রীভাস্করানন্দজী। ১৯৭৪ সালের পূর্ণকুম্ভে ত্রিবান্দ্রামের মহারাজা মাকে এই ছত্রটি দিয়েছেন।

"আমরা ব্রহ্মচারিণীগণ ছিলাম মায়ের ডানপাশে। কীর্তনীয়া কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন আমাদের মধ্যে। আশ্রমের সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ ছিলেন মায়ের বাঁদিকে। আর তাঁর সামনে রুপোর সিংহাসনে নারায়ণ বিগ্রহ। আমাদের সংঘের সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দজী সুষ্ঠুভাবে শোভাযাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করছিলেন।

"শোভাযাত্রার সামনে ছিল কীর্তনপার্টির ছেলেরা। খোল-করতাল বাজিয়ে তারা গান ধরল—'হর হর মহাদেব, ব্রহ্মময় কুম্ভজল...।' আমরা মায়ের মেয়েরাও গেয়ে উঠলাম—'আনন্দময় কুম্ভজল।' মা তাঁর ডানহাতখানি তুলে তাল দিতে থাকলেন। শুরু হল স্নানযাত্রা।

"মায়ের পেছনে নিরঞ্জনী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বরী যোগশক্তি মায়ের পাল্কী, তাঁর পেছনে আরও কয়েকজন মহামণ্ডলেশ্বরের পাল্কী। আর সবার আগে আমাদের ধ্বজা ও ত্রিশূল—কমণ্ডলুসহ ব্রহ্মচারী দাশু এবং সারা ভারতের নাগা সন্ন্যাসিগণ। সব মিলিয়ে সে এক অপরূপ স্বর্গীয় পরিবেশ।

"কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ। মাঝে মাঝেই পা ডুবে যাচ্ছে। মাঘের শীত, যেমন বৃষ্টি তেমনি বাতাস। কিন্তু আমাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছি—

'ভজ মা-আনন্দময়ী,<br>
প্রভাতে মায়ের নাম ভজিলে আনন্দধাম,<br>
আনন্দে মার নাম গাওরে।'

"কীর্তনের শব্দে বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দ হারিয়ে গেছে। মায়ের নামগানে সারা কৃষ্ণনগর মুখরিত! মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ লক্ষ নরনারী শেষরাত থেকে পথের দু-পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মায়ের পাল্কী দেখামাত্র সেই জনসমুদ্রে ঢেউ ওঠে। সবাই একসঙ্গে শ্রীমায়ের শ্রীমুখখানি দর্শন করতে চান। সেকি আকুলতা, কী ব্যাকুলতা! শীত বৃষ্টি ও বাতাস উপেক্ষা করে তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করছেন। সেই প্রতীক্ষা সার্থক হল!

"তাঁরা যেমন মাকে দর্শন করেন, মাও তাঁদের দেখেন। আমাদের বলেন—জনজনার্দনের এই বিরাট রূপ তোরাও বহুপুণ্যে দর্শন করলি!

"কেবল ভারতীয় ভক্তরাই নন, বহু বিদেশী পর্যটক মায়ের সেই ভুবন-ভোলানো জগন্মোহিনী রূপ দর্শন করে মোহিত হচ্ছিলেন। বার বার তাঁদের ফ্ল্যাশ ক্যামেরা থেকে আলোর ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মাকে দর্শন করা ও মায়ের ছবি নেবার জন্য তাঁরাও সমানে জল-কাদা ভেঙে ছুটোছুটি করছিলেন।

"অবশেষে সঙ্গম ঘাটের কাছে পৌঁছে মায়ের পাল্কী দাঁড় করানো হল। পাল্কী থেকে নেমে মা হেঁটে ঘাট অবধি গেলেন। তিনি গঙ্গায় অবতরণ করলেন। স্বহস্তে গঙ্গাবারি নিয়ে মাথায় দিলেন।

"মায়ের পরে নাগাসন্ন্যাসী ও অন্যান্য সব সাধু-মহাত্মারা পুণ্যস্নানে নামলেন। সবশেষে আমরা মেয়েরা অমৃত লাভ করলাম। আমি মায়ের চরণামৃতময় কুম্ভবারি শিশিতে সঞ্চয় করে উঠে এলাম তীরে। মায়ের পাল্কীর পাশে এসে দাঁড়ালাম।

"ফেরার পথে আমরা আবার নিরঞ্জনী আখড়ায় এলাম। মা এবং মহামণ্ডলেশ্বরগণ গিয়ে মঞ্চের ওপরে উপবেশন করলেন। আরতি হল। মা তারপরে আখড়ার মহাদেব মন্দির দর্শন করলেন। অবশেষে মায়ের সঙ্গে আমরা সকাল আটটা নাগাদ আশ্রমে ফিরে এলাম।"

থামলেন ব্রহ্মচারিণী। তারপরেই বলে উঠলেন, "এইরে, আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম।"

"তাতে তো আমার ভালই হল। দেখতে না পারলেও স্বর্গীয় স্নানযাত্রার কথা শোনা হল। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আসি।"

"আসুন।" ব্রহ্মচারিণী দুহাত তুলে নমস্কার করেন।

আমিও প্রতিনমস্কার করি। শঙ্করীর ছাতা খুলে তোরণের বাইরে আসি। এখনও সমানে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। তারই মধ্যে ব্রহ্মচারিণী বেরিয়ে আসেন পথে। আমার সঙ্গে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করেন, "কথাটা মনে আছে তো?"

"কোন্ কথা?" থমকে দাঁড়াই। তাঁর দিকে তাকাই। স্মিত হেসে তিনি বলেন, "কুম্ভনগরের জনসমুদ্রে যদি মানসীর সঙ্গে সহসা সখার সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তাহলে পাঠিকা জানতে পারবে তো?"

"নিশ্চয়ই।" আমি তাঁকে কথা দিই। তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি এগিয়ে চলি—মানুষের মহামেলায় মিশে যাই।

না। আমার চারিদিকের এই সংখ্যাতীত পুণ্যার্থীদের ভাবনায় আমি আর আগের মতো ডুবে যেতে পারছি না। আমি ব্রহ্মচারিণীর কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি। সেই একই প্রশ্ন আমার মনকে অস্থির করে তোলে—কে এই ব্রহ্মচারিণী? ইনিই কি সেই ১৯৪৭ সালের ঈশান স্কলার শ্রীমতী চিত্রা ঘোষ?

জানি কোনদিন কেউ আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। কারণ এই আত্মপ্রচারবিমুখ সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারিণীদের এখন একমাত্র পরিচয়—মায়ের মেয়ে। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি—মায়ের আশীর্বাদে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আমি স্বর্গীয় স্নানযাত্রার কথা শ্রবণ করতে পারলাম। আমার অমৃতলাভ পূর্ণ হল। হে কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য বিজয়ী ব্রহ্মচারিণী ভগ্নী আমার, তোমাকে নমস্কার!

কালী সড়ক আর সঙ্গম মার্গের সঙ্গমে এসে দাঁড়াই। একটি তরুণ পিঠে বিরাট বাঁশির বোঝা নিয়ে বাঁশি বিক্রি করছে। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করি। তার ভাঙা হিন্দী শুনে আবিষ্কার করে ফেলি সে বাঙালী। অতএব বাংলাতেই কথাবার্তা শুরু হয়।

ছেলেটি জানায়, "আমি শিলিগুড়ি থেকে এসেছি। হাজার তিনেক টাকার বাঁশি এনেছি। এই তিন-চার রকমের বাঁশের বাঁশি। সব বিক্রি করতে পারলে হাজারখানেক টাকা লাভ হবে। বিক্রিও হয়ে যাবে। তবে কি জানেন, অসম্ভব খরচ এখানে। মেলায় ঘর নেওয়া তো আমাদের সাধ্যের বাইরে। তাই শহরে একটা ছোট ঘর নিয়েছি পনেরো দিনের জন্য, একশ' টাকা ভাড়া। দৈনিক খাওয়া-খরচ লেগে যায় প্রায় পনেরো টাকা। আর মেলায় বাঁশি বিক্রি করার জন্য প্রতিদিন দশ টাকা ট্যাক্স্ দিতে হয়। তার ওপরে আসা-যাওয়ার রেলভাড়া তো আছেই। শেষ পর্যন্ত কি আর থাকবে বলুন!"

"মেলায় বাঁশি বিক্রি করার জন্য প্রতিদিন দশ টাকা ট্যাক্স্ দিতে হয়!" আমি বিস্মিত।

কিন্তু ছেলেটি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তার আগেই কানে আসে "খরচা নিকালো!"

তাকিয়ে দেখি আমার পাশে একজন কনস্টেবল। সে গম্ভীর স্বরে বাঁশি-ওয়ালাকে প্রশ্ন করে একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বাঁশিওয়ালা তার বুক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে পুলিশের হাতে দেয়। সে প্রায় মিনিট দুয়েক ধরে উল্টেপাল্টে পরচা তথা ট্যাক্স-টোকেনটি পরীক্ষা করে সেটি ফিরিয়ে দেয় বাঁশিওয়ালার হাতে। তারপরে চলে যায়।

আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছি। তাই অন্য কথা জিজ্ঞেস করি, "কিন্তু পনেরো দিনে তিন হাজার টাকার বাঁশি বিক্রি হবে কি?"

"আজ্ঞে তা হবে। এতদিন গড়ে দৈনিক আড়াইশ' তিন-শ' টাকা করে বিক্রি হয়েছে, আজ পাঁচশ' টাকা বিক্রি হয়ে গেছে, আরও শ' দু'য়েক টাকা বিক্রি হবে মনে হচ্ছে।"

শুনে খুশি হই। আর ভাবি, তাহলে তো দশটাকা ট্যাক্স বেশি নয়। সত্যিই নয়। পরে শুনেছি এই মেলা থেকে ১৬, ৮৯, ৫৮৫·১৯ টাকা ট্যাক্স আদায় হয়েছে। খরচের তুলনায় সংখ্যাটা খুবই কম। বাঁশিওয়ালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি শিবিরের দিকে।

বৃষ্টি কিছু কমেছে, কিন্তু বাতাস বন্ধ হয় নি। বড্ড শীত করছে। সামনে একটা চায়ের দোকান দেখতে পাচ্ছি। এক কাপ চা খেয়ে নিলে হত।

কাজটা সহজ নয়। দোকানের সামনে এসেই বুঝতে পারি। লোকে লোকারণ্য। দোকানটি বেশ বড়। কেবল চা নয়, সেই সঙ্গে লাড্ডু ও পুরি পাওয়া যাচ্ছে। অনেকখানি জায়গা ত্রিপল দিয়ে ছাওয়া। সুতরাং চা-মিষ্টি খাবার সঙ্গে মাথা বাঁচাবার সুবর্ণ সুযোগ। ফলে প্রচণ্ড ভিড় ভেতরে। আমি এসে চা-বিভাগের সামনে দাঁড়াই।

দড়ি দিয়ে ঘেরা খানিকটা জায়গা। সেখানে প্রকাণ্ড একটা ড্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে চা ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। আর সেই ড্রাম থেকে জন চারেক লোক পঞ্চাশ পয়সার বিনিময়ে এক-এক কাপ করে চা পরিবেশন করছে। যারা চা নিচ্ছে, তারাই কাপ নিয়ে আসছে। ওরা কোনো কাপ দিচ্ছে না। আমি এখন কাপ পাই কোথায়?

কিন্তু কাপগুলো সব একরকম কেন? চা-পায়ীদের নিজ-নিজ কাপ হলে তো এমন একরকম কাপ হতে পারে না। একটু লক্ষ্য করা যাক।

না, কাপগুলো সবই এই দোকানের। ঐ তো একজন ভদ্রলোক চা শেষ করে ওপাশের টেবিলে কাপটি রেখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন ছোঁ মেরে

কাপটি নিয়ে নিলেন। তারপরে তিনি কাপটি কলতলা থেকে ধুয়ে এনে চায়ের বড় লাইন দিলেন।

আমাকেও তাই করতে হবে। একজন লোক চা খাচ্ছে। আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াই। বলি, "আপনার খাওয়া হলে দয়া করে কাপটি আমাকে দেবেন।"

ভদ্রলোক মাথা নাড়েন। পকেট থেকে পঞ্চাশটি পয়সা বের করে আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু বাদেই এক কাপ গরম-চা পাওয়া যাবে। ভাবতেও ভাল লাগছে।

## নয়

চা খেয়ে বেরিয়ে আসি দোকান থেকে। সবাই বলছেন বলে আমিও বলছি 'চা', নইলে এইমাত্র যে উষ্ণ-রঙীন বিচিত্র-বিস্বাদ পানীয় গলাধঃকরণ করে এলাম, তাকে কোনমতেই চা বলা যায় না। তবু কোনো অভিযোগ করছি না। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পুরো এক কাপ গরম পানীয় সত্যি মৃতসঞ্জীবনী।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি আবার বেড়েছে। অতএব সবাই ভিজছে। এবং তাঁদের অনেকেই আড়চোখে আমার ছাতা দেখছেন। শঙ্করীর জয় হোক্।

কেউ কেউ অবশ্য আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছেন। বোধকরি আমার পোশাক ও ছাতা দেখে। তা হাসুন গে! আমি ছাতা বন্ধ করছি না। অতএব অবিচলিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলি।

সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই। ইতিমধ্যে মেলার আলো জলে উঠেছে। এখনও আঁধার নেমে আসে নি। আসবেও না। দিনের আলো মিলিয়ে যাবার আগেই রাতের আলো উঠেছে জলে।

পথের ভিড় কমে নি। তবে শুনেছি বিকেল সাড়ে চারটার পরে আর কাউকে মেলায় আসতে দেওয়া হয় নি। যাঁরা তার আগে এসেছেন, তাঁরা স্নান করতে চলেছেন অথবা স্নান করে ফিরছেন। এখন অবশ্য আর কেউ সঙ্গমে যেতে পারছেন না। গঙ্গাদ্বীপে যাতায়াতের তিনটি পুল ভেঙে গিয়েছে। ভাঙা খুবই স্বাভাবিক। যা ভিড় হয়েছিল পুলগুলোর ওপরে! এখন তাই সবাইকে গঙ্গা কিংবা যমুনার তীরে গিয়ে স্নান সারতে হচ্ছে। পুল ভেঙে যাওয়ায় কিন্তু কেউ হতাহত হন নি। শুধু তাই নয়, এত ভিড় তবু আজ এ পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। সত্যি খুব আনন্দের কথা।

যাক্ গে। যেকথা বলছিলাম। বিকেল সাড়ে চারটায় কুম্ভদ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্নান বন্ধ হতে এখনও অনেক বাকী। রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত স্নান চলবে।

তা চলুক গে, আমরা তো আর স্নান করতে যাচ্ছি না। আমাদের স্নান শেষ হয়েছে। আমরা অমৃত লাভ করেছি। আমার জীবন ধন্য হয়েছে। আমি ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলি শিবিরের দিকে।

শাস্ত্রী পুলের নিচে আসি। সকালে এখানে যে অব্যবস্থা দেখেছি, এখনকার

অবস্থা মোটেই তেমন নয়। সবাই বেশ গুছিয়ে বসেছেন। কেউ রান্না-বান্না করছেন, কেউ খাওয়া-দাওয়া করছেন, আবার কেউবা পাঠ-কীর্তনের আসর বসিয়েছেন। মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেলেই মানুষ সংসার-ধর্ম শুরু করে দেয়।

"পোশাকটি তো বেশ বানিয়েছেন!"

কথাটা কানে আসতেই চমকে পেছনে তাকাই। গোরাদা মুচকি হাসছেন।

আমিও হেসে বলি, "কি করব, এই লুঙ্গি আর কোট-টা ছাড়া আর সবই যে ভিজে গিয়েছে।"

"একাই বেরিয়েছিলেন?" গোরাদা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।

আমি মাথা নাড়ি।

গোরাদা আবার বলেন, "পাঁচ নম্বর বাস এসে গেছে।"

"মিসেস মণ্ডল খবরটা দিয়ে গিয়েছেন। ওঁদের বোধহয় স্নান হয়ে গেছে এতক্ষণে?"

"হ্যাঁ। ওঁরা স্নান করে এসে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ছেন। ওঁরা সবাই একটু 'নার্ভাস' হয়ে · "

"কেন?"

"দুদিন এক নাগাড়ে বাসে বসে থাকতে হয়েছে। দেরি হয়ে যাবার জন্য কোথাও বাস থামায় নি। এই দু'দিন ওঁরা খুবই টেন্‌শন্‌-এর মধ্যে ছিলেন। তার ওপরে এখানে পৌঁছে এই 'ক্লাইমেট' দেখে একেবারেই ঘাবড়ে গিয়েছেন।"

থামেন গোরাদা। আমি মাথা নাড়ি। গোরাদা আবার বলেন, "কথায় কথায় আপনার কথা বলেছি। ওঁরা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আপনি যদি একবার ওঁদের তাঁবুতে আসেন, একটু বল-ভরসা দেন, তাহলে বড়ই ভাল হয়।"

"যেতে আমার আপত্তি নেই। ওঁরা এত কষ্ট করে কুম্ভমেলায় এসেছেন, ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল শিবিরে নেই, একবার যাওয়াও উচিত। কিন্তু এই পোশাকে বোধহয় কোনো লেখকের পাঠক-পাঠিকার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন হবে না।" আমি বলি, "তাঁবু থেকে জামা-কাপড় পালটে আসছি।"

"কিন্তু আপনার নাকি সবই ভিজে?"

"তা হোক্ গে, ভদ্রতার খাতিরে ভিজে কাপড় পরেই ফিরে আসছি।"

গোরাদা আর আপত্তি করেন না। আমি ফিরে চলি তাঁবুতে।

এসে দেখি জোর আড্ডা চলেছে। শঙ্করী অভিযোগ করে, "আপনি বড্ড স্বার্থপর বোবদা!"

"কেন ?"

"একা-একা দিব্যি ঘুরে এলেন।"

"সে তো তোমাদের সমবেত সাহায্যে। তোমার ছাতা আর দাদুর জুতো না পেলেই যে বেরুতেই পারতাম না।"

"বইতে এসব কথা লেখা হবে তো ?" দাদু জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর দিই, "নিশ্চয়ই।"

আর তখুনি চা ও চপ নিয়ে দু-জন লোক তাঁবুতে ঢোকে।

মনোরঞ্জন চিৎকার করে ওঠে, "থ্রি-চিয়ার্স ফর ফকির কুণ্ডু…"

"হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্…"

জয়ধ্বনির পরে গরম চা ও চপের সদ্ব্যবহার শুরু করি। আর ঠিক তখনি তাঁবুর বাইরে থেকে কেউ জিজ্ঞেস করেন, "শঙ্কুবাবু এই তাঁবুতে থাকেন ?"

সুধাংশু গলা বাড়িয়ে বলে, "হ্যাঁ। ভেতরে আসুন।"

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁবুতে প্রবেশ করেন। পরনে সার্ট প্যান্ট কোট আর ওয়াটার প্রুফ। পায়ে রাবারের জুতো, মাথায় টুপি। বর্ষাতি ও টুপিটা খুলে দোরগোড়ায় রেখে তিনি ভেতরে আসেন। খাটো কিন্তু সুশ্রী চেহারা ভদ্রলোকের। স্বাস্থ্যটিও ভাল।

কাকু তাঁকে বসতে বলেন। ভদ্রলোক দাদুর পাশে বসে পড়েন, সবার দিকে তাকান। কানাই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়। আমি নমস্কার করে তাঁর কাছে সবার পরিচয় দিই। তিনিও প্রতিনমস্কার করেন। তারপরে বলেন, "আমার নাম সুবোধচন্দ্র বসু। এখানকার একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলাম। বছর দশেক হলো রিটায়ার করেছি। এখন আমার বয়স বাহাত্তর বছর। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। তারা কেউ এখানে থাকে না। নবাব ইউসুফ রোডে একটু বাড়ি করেছি। আমরা স্বামী-স্ত্রী সেখানেই থাকি। আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘের একজন ভক্ত। কুম্ভস্নানের জন্য আজ তিন দিন হলো তাঁদের শিবিরে রয়েছি। একটু আগে মহেশানন্দজী আপনার কথা বললেন। আমি আপনার বই পড়েছি। তাই দেখা করতে এলাম।"

"ভারী খুশি হলাম।" আমি বলি। একটু থেমে জিজ্ঞেস করি, "আপনি বোধকরি এলাহাবাদেই জীবন কাটালেন ?"

"তা বলতে পারেন।" সুবোধবাবু বলেন, "১৯২৮ সাল থেকে এখানে আছি।"

"প্রয়াগের পূর্ণ-কুম্ভমেলা সম্পর্কে কিছু বলুন না।"

"কি আর বলব? এলাহাবাদে থাকি, এখানে কুম্ভমেলা হয়, দেখি। প্রথম পূর্ণকুম্ভ দেখেছি ১৯৩০ সালে, তারপরে বিয়াল্লিশ সালে। সেবার মেলা ও স্নান কোনোটাই তেমন জমে নি। একে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তার ওপরে যুদ্ধ। সেবারে বাইরের লোক প্রায় আসে নি বললেই চলে। তারপরে এখানে পূর্ণকুম্ভমেলা হয়েছে ১৯৫৪ সালে। সেবারে মেলা ভালই হলো। তবে শেষের সেই দুর্ঘটনা উৎসবের সব আনন্দ মাটি করে দিলো। তারপরে পূর্ণকুম্ভ হয়েছে ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে।..."

"সে কি! পর পর দু'বছর পূর্ণকুম্ভ হলো?"

"হ্যাঁ, হয়েছে," বোসবাবু মাথা নেড়ে মৃদু হাসলেন। "একদল পণ্ডিত বললেন পঁয়ষট্টি সালে শুভযোগ, আরেক দল বললেন ছেষট্টি সালে। দু'দলই তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। ফলে পঁয়ষট্টিতে পূর্ণ-কুম্ভমেলা হলো। সাধু-সন্ন্যাসীরা সামান্য সংখ্যায় এলেন। বিরোধীরা উৎসাহিত হয়ে পরের বছর আবার কুম্ভ-মেলার আয়োজন করলেন। এবারে লোকজন ও সাধু-সন্ন্যাসী কিছু বেশি এলেন। তবে মেলা ঠিক জমল না। এক কথায় দুটি মেলাই ব্যর্থ হয়েছে।"

"তারপর তো এবারের মেলা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এবং কুম্ভমেলার ইতিহাসে এতবড় মেলা আর হয় নি। হয়তো হবেও না।" একবার থামেন বোসবাবু। তারপরে আবার বলেন, "আমার এখন বাহাত্তর বছর চলছে। এর পরের মেলা দেখার আর সৌভাগ্য হবে না। ঠাকুরের অশেষ দয়া এই মেলা দেখে যেতে পারলাম। তাই বাড়ি ঘর ফেলে মেলায় চলে এসেছি।"

"আপনার স্ত্রী?"

"তিনিও আমার সঙ্গে ভারত সেবাশ্রমে রয়েছেন। দু'জনে দিবারাত্র দু'চোখ ভরে মেলা দেখছি আর দেখছি।"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে বোসবাবু বিদায় নিলেন। আমিও ভিজে জামা-কাপড় পরতে লেগে যাই।

শঙ্করী জিজ্ঞেস করে, "আবার কোথায় চললেন?"

"পাঁচ নম্বর বাস-এ যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে।"

"আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।"

"বেশ তো চলো।"

শঙ্করী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "সেজদি যাবে না কি?"

"চল, ঘুরে আসি একবার। বসে থাকতে থাকতে হাঁটুতে খিল ধরে গিয়েছে।"

সেজদি ও শঙ্করীর সঙ্গে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। বৃষ্টি বন্ধ হয় নি, তবে তার বেগ কমে গেছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য এখন বন্ধ হওয়া আর না হওয়া প্রায় একই কথা। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। আর বড় জোর ঘণ্টাদু'য়েক স্নান চলবে। প্রায় দেড়কোটি মানুষকে যখন দুঃসহ কষ্ট সইতে হলো, তখন সামান্য সংখ্যক পুণ্যার্থীদের জন্য নিষ্ঠুর তীর্থদেবতার করুণা কামনা করে কি হবে? তার চেয়ে চলুক, যেমন চলছে চলুক। দেখি পরাজিতা প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে কত শত্রুতা করতে পারে?

আমরা কাদা ভেঙে এগিয়ে চলি। শাস্ত্রী পুলের কাছে তাঁদের তাঁবু। গোরাদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের সামনে। তাঁর সঙ্গে ভেতরে ঢুকি। দু'পাশে ছ'খানি খাটিয়ায় ছ'জন নারী পুরুষ শুয়েছিলেন। গোরাদার ডাক শুনে সবাই উঠে বসেন। গোরাদা একে একে পরিচয় করিয়ে দেন। বলেন, "বাকি ছ'জন রয়েছেন পাশের তাঁবুতে, আমরা সেখানেও যাবো।"

"কিন্তু এঁরা সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত, আমরা বোধহয় এখন এঁদের 'ডিস্টার্ব' না করলেই পারতাম?" শঙ্করী মাঝখান থেকে গোরাদাকে জিজ্ঞেস করে।

গোরাদা কিছু বলতে যাবার আগেই চামেলীদেবী মানে মিসেস চামেলী রায় বলে ওঠেন, "একথা কেন বলছেন, ভাই। আপনারা এসেছেন, বিশেষ করে শঙ্কুবাবু এসেছেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের উচিত ছিল ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করা। কিন্তু আমরা সত্যি 'টায়ার্ড', তাই গোরাদা যখন বললেন ওঁর কথা, আমরাই বললাম নিয়ে আসতে।"

ভদ্রমহিলার মধ্যবয়সী স্বামীও মাথা নেড়ে স্ত্রীকে সমর্থন করেন। সমর্থন করেন তাঁর অন্যান্য নারী-পুরুষ সহযাত্রীরা।

চামেলীদেবী আবার বলেন, "আমরা সত্যি খুবই টায়ার্ড। পরশু সকালে বাস ছাড়ার পরে আর কোথাও থেমে বিশ্রাম করি নি। একটানা প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা চলে আজ এখানে পৌচেছি। সবচেয়ে বড় বিপদ হয়েছে বাস-এর ছাদে রাখা বিছানাপত্র জামা-কাপড় সব ভিজে গিয়েছে। গোরাদা ও ফকিরবাবু নিজেদের কম্বল আমাদের দিয়েছেন। আমিও একখানি পেয়েছি, কিন্তু শীত মানছে না।"

সহসা সেজদি উঠে দাঁড়ান। আমাকে বলেন, "আপনারা কথা বলুন, আমি একবার তাঁবু থেকে ঘুরে আসি।"

আমি ও শঙ্করী তাঁর মুখের দিকে তাকাই। সেজদি আবার বলেন, "আমি দু'খানি কম্বল এনেছি, তার একখানা নিয়ে আসি চামেলীদের জন্য।"

"কিন্তু আপনার অসুবিধে হবে না?" মিস্টার ও মিসেস রায় একসঙ্গে বলে ওঠেন।

"তা একটু তো হবেই।" সেজদি হাসতে হাসতে বলেন, "যা শীত, তাতে দু'খানি কম্বল কোনোমতেই বেশি নয়। তবে আমরা এখানে দু'রাত কাটিয়েছি, শীত অনেকটা সহ্য হয়ে গিয়েছে। আমার একখানা গরম চাদর আছে, সেটাকে কম্বলের তলায় দিয়ে কোনো রকমে কাটিয়ে দেব একটা রাত।"

সেজদি বেরিয়ে গেলেন তাঁবু থেকে। মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। চামেলীদেবী তাঁর নিতান্তই অপরিচিতা, অথচ তাঁকেই তিনি এই বর্ষামুখর শীতের রাতে দু'খানি কম্বলের একখানি দিয়ে দিচ্ছেন। এ আত্মত্যাগের তুলনা নেই।

তুলনা নেই মিসেস চামেলী রায়ের কৃতজ্ঞতাবোধের। কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি সেজদিকে সেই কম্বলখানি ফেরত দেন নি। কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স্‌-এর অনেক কর্মচারী কম্বলখানি উদ্ধারের জন্য তাঁর উত্তরপাড়ার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন, কিন্তু সে অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। তবে সেটি কলকাতায় ফিরে আসার পরের ঘটনা। সুতরাং সে কাহিনী আমার বিষয়বস্তু নয়।

# দশ

তীর্থে তিনরাত বাস করতে হয়। আমরা ও তাই করলাম। রাত ফুরিয়েছে। মৌনী অমাবস্যার রাত। সুতরাং কালরাত্রি বলব না। বরং বলব প্রায় দেড় শ' বছর ধরে ভারতের মানুষ যে পুণ্যতিথির প্রতীক্ষা করছিলেন, তার অবসান হয়েছে। সেদিনটি যতই দুর্যোগপূর্ণ হোক, আমরা তাকে স্বাগত জানিয়েছি। অভিমান বশে হয়তো তীর্থের দেবতা কিংবা প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে থাকব, তাহলেও সেই পরমপুণ্য তিথিকে আমরা বরণ করেছি সমস্ত অন্তর দিয়ে, গ্রহণ করেছি সর্বশক্তি দিয়ে আর আমরা তাকে স্মরণ করব সারা জীবন। এই দিনটিতে আমরা যে অমৃত লাভ করেছি।

যাক গে, যেকথা বলছিলাম। পুণ্যতীর্থ প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভ মেলায় তিনরাত বাস করেছি। একটু আগে ঘুম ভেঙেছে। টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখি। এখন সকাল সাড়ে পাঁচটা।

তাই তো! বৃষ্টির শব্দ যে কানে আসছে না! তাহলে কি বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছে! নেমে পড়ি খাটিয়া থেকে। পর্দা ঠেলে বাইরে আসি।

আমার অনুমান মিথ্যে নয়। সত্যি বৃষ্টি পড়ছে না। কখন থেমেছে জানতে পারি নি। জানার দরকারও নেই। বৃষ্টি থেমে গেছে। এর চেয়ে বড় সংবাদ আর কি হতে পারে?

ফিরে আসি তাঁবুতে। সহযাত্রীদের ডেকে ডেকে কথাটা বলি। আশাতীত শুভসংবাদে সবাই পুলকিত হয়ে ওঠে।

দাদু বলেন, "তাহলে চলুন, প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙার আগেই আমরা বাথরুম সেরে আসি, ছ'টায় বে-ডটি আসবে।"

বাথরুম সেরে ফিরে আসি তাড়াতাড়ি। না, এখনও বেড-টি আসে নি। এবারে আসবে।

বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে কিন্তু তার আক্রমণের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তাঁবুর বাইরে কাদা, ভেতরে সবকিছু ভিজে। এ কাদা শুকোতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে, এই ভিজে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়েই আজ বাস-এ উঠতে হবে। তবু রক্ষে তাঁবুর ভেতরে জল জমে নি। কারণ আগেই বলেছি, আমাদের শিবির একটা চালের ওপরে—উঁচু জায়গায় অবস্থিত। জল গড়িয়ে নেমে গিয়েছে

উত্তরে। ওদিকের তাঁবুগুলোর অবস্থা শোচনীয়।

কিন্তু এখনও বেড টি আসছে না কেন? আমরা সবাই যে 'বেড' ছেড়ে 'বেড-টি'য়ের অপেক্ষায় রয়েছি।

দাদু বলেন, "আপনারা বসুন, আমি ও নিরঞ্জন একটু ঘুরে আসি।"

"বন্ধুকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন দাদু! চা খেতে?"

"না। তোমাদের চা খাওয়াবার চেষ্টায় যাচ্ছি।" দাদু উত্তর দেন, "একবার কিচেন থেকে ঘুরে আসি, দেখে আসি চায়ের কতদূর?'

কালীঘাট শান্তি আশ্রমের মাইক কিন্তু সমানে বেজে চলেছে। এবং আজও সেই একই কথা একই ভাবে বার বার বলা হচ্ছে। সেই নির্দেশ আর নিবেদন —আপনারা পথে দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়াবেন না, ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করবেন না, টাকা-পয়সা যেখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলবেন না।...

তার মানে পথের ভিড় কমে নি এবং এখনও মানুষ আসছে, স্নান চলেছে।

স্নান তো চলবেই। সারাদিন সারারাত ধরে মানুষ আসছেন। তারা স্নান করছেন। যাঁরা পরশু আসতে পারেন নি, তাঁরা কাল এসেছেন। যাঁরা কাল দিনে আসতে পারেন নি, তাঁরা রাতে এসেছেন। যাঁরা রাতে আসতে পারেন নি, তাঁরা আজ সকালে আসছেন। আসছেন আর আসছেন। এবং তাঁরা স্নান করছেন। সময়ে এসে পৌঁছতে পারেন নি বলে কি কুম্ভস্নান বাদ দেবেন?

তাঁরা স্নান করছেন। প্রতি মুহূর্তে মানুষ আসছেন। প্রতি মুহূর্তে স্নান চলেছে। আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ স্নান করছেন। প্রবল বৃষ্টি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর কর্দমাক্ত পথ তাঁদের মুহূর্তের তরে থামিয়ে দিতে পারে নি। তাঁরা দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা যে অমৃতের সন্তান, তাঁরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ।

যাতায়াতের পথে তাঁরা আশ্রম ও আখড়া দর্শন করছেন। সাধ্যমত দর্শনী দিচ্ছেন। তাঁদের উদ্দেশেই মাইকের নির্দেশ—টাকা-পয়সা যেখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলবেন না।

না, চা আসছে না। দাদুরাও ফিরে আসছেন না। ব্যাপার কি? বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। এগিয়ে চলি কিচেনের দিকে।

সত্যি যাত্রী যাতায়াতের বিরাম নেই। পথের অবস্থা কাল যা দেখেছি, আজও তাই। মানুষ আর মানুষ। মানুষ আসছে, মানুষ যাচ্ছে।

বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু চারিদিকে জলকাদা। তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায় অনেকেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কেনই বা থাকবেন না।

ওঁরা তো কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর সঙ্গে প্রমোদ ভ্রমণে আসেন নি যে বেড-টির আশায় জেগে বসে থাকবেন।

দাদুরা ফিরে আসছেন। তাঁরা ভরসা দেন, "তাঁবুতে চলুন, চা আর সিঙ্গাড়া আসছে।"

সিঙ্গাড়া! ভাবতেই জিভে জল এসে যাচ্ছে।

চলতে চলতে জিজ্ঞেস করি, "তা আজ এত দেরি হলো, কেন!"

"কী করবে বলুন? কিচেনের যা দুরবস্থা, চোখে না দেখলে বিশ্বেস করা কঠিন। চারিদিক থেকে জল পড়েছে। এই শীতে খালি পায়ে কাদায় দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর রান্না করতে হচ্ছে। তার ওপরে ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল নেই। কর্মচারীরা কি দিয়ে কি করবে, বুঝতে পারছে না।"

"কেন ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল কোথায় গেলেন?" জিজ্ঞেস করি।

নিরঞ্জনবাবু উত্তর দেন, "ফকিরবাবু কাল সকালে সেই যে বাস উদ্ধার করতে গিয়েছেন, এখনও ফিরে আসেন নি।"

"আর মিসেস মণ্ডল?"

"তিনিও ফকিরবাবুকে সাহায্য করবার জন্য কাল বিকেলে যে শহরে গিয়েছেন, এখনও ফিরতে পারেন নি।"

তাহলে যে সমূহ বিপদ! বাস না পেলে তো বাড়ি ফিরতে পারব না। আমাদের সবারই এখন 'দেবতার গ্রাস' কবিতার রাখালের অবস্থা—'কৌতূহল অবসান, কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ...'। হয়তো 'মাসির কোলের লাগি' নয়, তবে স্ত্রী পুত্র-কন্যার শ্রীমুখ দর্শনের জন্য তো বটেই।

চা ও সিঙ্গাড়া এসে গিয়েছে, সঙ্গে গোরাদা এসেছেন। পরিবেশন শুরু হয়ে যায়। আমাদের তাঁবুতেও আসে—জনপ্রতি চারটি করে সিঙ্গাড়া আর গরম চা।

এই আবহাওয়ায় এমন অবস্থায় সিঙ্গাড়া! সত্যি এঁদের ব্যবস্থাপনার তুলনা হয় না।

"এই যে গোরাবাবু! একবার এদিকে আসুন তো!"

এ কণ্ঠস্বর ভুলে যাবার নয়। সেদিন রাসভারী চেহারার যে বিগতযৌবনা আধুনিকা গোরাদাকে খাবার পরিবেশনের পদ্ধতি প্রসঙ্গে এন. সি. সি. ক্যাম্পিং সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন।

কিন্তু গোরাদা তো তাঁর নির্দেশ পালন করে চলেছেন। শিবিরের মাঝখান থেকে পরিবেশন শুরু করেছেন। তাঁর তাঁবুতেই প্রথম খাবার দেওয়া হয়েছে।

তাহলে তিনি আবার এমন কর্কশ কণ্ঠে গোরাদাকে কাছে ডাকছেন কেন?

আমাদের তাঁবুর পর্দা তোলা। এখানে বসেই ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। তিনি প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, প্লেটে সিঙ্গাড়া।

না, ভদ্রমহিলার সংযম সত্যই প্রশংসনীয়। এই আবহাওয়ায় এমন সিঙ্গাড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এখনও মুখে দেন নি। এদিকে আমরা প্রায় সাবাড় করে দিলাম। না, ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই যোগসিদ্ধা। তাঁর কোনো আখড়ায় গিয়ে ঠাঁই নেওয়া উচিত ছিল।

গোরাদা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ঠিক কাঁপছেন না, তবে তাঁর অবস্থা নিঃসন্দেহে বলির জন্য নির্দিষ্ট ছাগশিশুর মতো।

সবিনয়ে গোরাদা জিজ্ঞেস করেন, "আজ্ঞে কি বলছেন?"

"এ গুলো কি?" ভদ্রমহিলা হাতের প্লেটখানি দেখিয়ে গোরাদাকে জিজ্ঞেস করেন।

গোরাদা উত্তর দেন, "আজ্ঞে সিঙ্গাড়া।"

"আপনার মাথা!"

গোরাদা কোনো কথা বলেন না।

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর আরও চড়ে যায়, "এগুলো সিঙ্গাড়া? এগুলো কি মানুষের খাদ্য?"

"আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। কেন কি হয়েছে?"

আমরাও বুঝতে পারছি না। কিন্তু এই প্রহসনে আমাদের অংশ নেওয়া চলবে না। অতএব চুপ-চাপ দেখে যেতে থাকি।

"কি হয়েছে, বুঝতে পারছেন না! সিঙ্গাড়া খেতে দিয়েছেন! একবার হাত দিয়ে দেখেছেন—কি রকম ঠাণ্ডা!"

হায় হরি! এই জন্য এত কথা! ভদ্রমহিলার বক্তব্য এই প্রচণ্ড শীতে সিঙ্গাড়া কেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে? সত্যই তো তাঁর সিঙ্গাড়া ঠাণ্ডা হবে কেন?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বোধ করি গোরাদার গা থেকে জ্বর ছেড়ে যায়। তিনি মৃদু হেসে বলেন, "আজ্ঞে একে তো এই আবহাওয়া, তার ওপরে প্রায় হাজারখানেক সিঙ্গাড়া ভাজাতে হয়েছে। রাত চারটে থেকে ভাজা শুরু করে এই একটু আগে শেষ হলো। প্রথম দিকের ভাজা সিঙ্গাড়া বোধহয় আপনার ভাগে পড়েছে। আমি এখুনি পালটে দিচ্ছি।"

না, গোরাদার কৈফিয়ৎ তাকে খুশি করতে পারে না। গলার স্বর আরও চড়িয়ে তিনি বলে ওঠেন, "তার মানে আবার এই ঠাণ্ডা সিঙ্গাড়া আপনি আর

কাউকে খাওয়াবেন, এই তো! কেন আমরা কি ভিক্ষুক, এটা কি লঙ্গরখানা? আমরা তো টাকা দিয়ে আপনাদের সঙ্গে এসেছি!"

"আজ্ঞে এসব কথা বলছেন কেন?" গোরাদা বোধকরি আর মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারলেন না। বলছেন, "আর কাকে কী খাওয়াই, তা আপনার দেখার দরকার নেই। আপনি সিঙ্গাড়া ফেরত দিয়ে তাঁবুতে গিয়ে বসুন, আমি আপনাকে গরম সিঙ্গাড়া পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"এই নিন আপনাদের সিঙ্গাড়া…"বলতে বলতে তিনি সিঙ্গাড়া সহ প্লেটখানা ছুঁড়ে ফেললেন গোরাদার সামনে। আর কিছুই বলতে পারলেন না গোরাদা। তিনি বোধহয় তাঁর সাধের সিঙ্গাড়ার দুরবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে যায়। তারপর দাদু বলে ওঠেন, "ভদ্রমহিলা রেগে গেলেও নিশানা ভুল করেন নি। ঠিক কাদার মধ্যে ছুঁড়ে মেরেছেন, আর তাই প্লেটখানা অক্ষত রয়ে গেল।"

"আরেকটা কথা…" কাকু যোগ করে, "ভদ্রমহিলা গোরাদার সঙ্গে ঝগড়া করলেও তাঁর অবাধ্য হন নি।"

"কি রকম?" সুধাংশু জিজ্ঞেস করে।

কাকু উত্তর দেয়, "তিনি সিঙ্গাড়া ফেরত দিয়ে গোরাদার কথামত গরম সিঙ্গাড়ার জন্য তাঁবুতে গিয়ে বসেছেন।"

প্রবল হাস্যরোল।

আমাদের হাসি শুনে গোরাদা এগিয়ে আসেন সামনে। জিজ্ঞেস করি, "এবার তাহলে কিচেনে গিয়ে আবার সিঙ্গাড়া ভাজাবার ব্যবস্থা করছেন?"

"আর কি করব বলুন? এদের নিয়েই তো ফকিরের কারবার। সব যাত্রাতেই এমন দু একজন থাকেন। তবে একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না শঙ্কুবাবু!"

"কি বলুন দেখি?"

"এঁরা কেন তীর্থে আসেন? পুণ্য সঞ্চয় করতে, না পাপের বোঝা বাড়িয়ে বাড়ি ফিরতে?"

গোরাদার এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব? চুপ করে থাকি।

খাবার পরেই শঙ্করীর সঙ্গে পথে বের হতে হয়। গতকাল তাকে কথা দিয়েছিলাম, বৃষ্টি থামলে একবার নিয়ে যাবো, বেলুড়ের লালাবাবা আশ্রমে। সেখানে ওর একটি পরিচিতা মেয়ে এসেছে। কেবল বৃষ্টি থামেনি, রীতিমত

রোদ উঠেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে এখন কার সাধ্যি বলে যে কাল সারাদিন অমন ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির কি বিচিত্র বিধান!

আমাদের শিবির থেকে খানিকটা উত্তরে নেমে গিয়ে বড় রাস্তার মুখে ডানদিকে লালবাবার আশ্রম। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বেশ বড় আশ্রম। গেট দিয়ে ঢুকেই সামনে সুবিরাট সামিয়ানা। সামিয়ানার শেষপ্রান্তে সুদৃশ্য সিংহাসন। সিংহাসনে লালবাবার বিরাটকায় রঙীন চিত্র। আমরা প্রণাম করি।

সামিয়ানার এখানে ওখানে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও শিষ্য-শিষ্যারা নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। সন্ন্যাসীদের সবার পরনে লাল কাপড়। তাঁদেরই একজনের সঙ্গে কথা বলে শঙ্করী। তারপরে একটা তাঁবুতে চলে যায়। সামিয়ানার চারিপাশে অনেক ছোট-বড় তাঁবু। তারই একটি তাঁবুতে ঢুকেছে শঙ্করী। আমি সামিয়ানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি।

বান্ধবীর সঙ্গে বেরিয়ে আসে শঙ্করী। কিছুক্ষণ কথা বলে। তারপরে বিদায় নেয়।

আমরা ফিরে আসি শিবিরে। শুনি দু' নম্বর অর্থাৎ কাকীদের বাস এসে গিয়েছে। যাত্রীরা খেয়ে-নিয়ে বাসে চলে গিয়েছেন। এরপরে আমাদের বাস আসবে। এবারে আমাদের খেতে যেতে হবে।

এক ও চার নম্বর বাস-এর যাত্রীরা বিশেষ বিচলিত। কারণ ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল এখনও বাস দু-খানি উদ্ধার করে উঠতে পারেন নি। খবরটা নিয়ে এসেছে হৃষীকেশ, আমাদের ম্যানেজার। সে হাসতে হাসতে বলে, "সেদিন যাঁরা 'সুপার ডিলাক্স' করে ফিরতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বলব নাকি অপেক্ষা করতে ?"

"কেন সুপার ডিলাক্স বুঝি এখনও কাদায় বসে আছেন ?" দাদু জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ। এক ও চার নম্বর বাস কখন উদ্ধার হয় বলা যায় না। ন'দা ও হেনাদি মানে মিসেস মণ্ডল অবশ্য রয়েছেন ওখানে। মিলিটারী 'ক্রেন্‌-ম্যান'দের বাসপ্রতি পঞ্চাশ টাকা করে মিষ্টি খেতে দিয়েছেন। এখন মা-গঙ্গা ভরসা।"

খেয়ে ফিরে আসতেই দীপ্তি জানায়—"বাস এসে গিয়েছে, মালপত্র সব পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারা কালী সড়কে চলে যান, সেখানেই বাস দাঁড়িয়ে আছে।"

"কিন্তু তোমার পায়ে কি হলো ? খুঁড়িয়ে হাঁটছ কেন ?" মাসিমা দীপ্তিকে জিজ্ঞাসা করেন।

“আর বলেন কেন ?” দীপ্তি বলে, “কাল কিচেনের সামনে আছাড় খেয়েছি। চুণ-হলুদ গরম করে লাগিয়েছি, কিন্তু ব্যথা কমে নি। মনে হচ্ছে মচ্‌কে গেছে। কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হবে। যাক্‌গে, আমি আস্তে আস্তে এগোচ্ছি, আপনারা আসুন।”

মনটা খারাপ হয়ে যায়। না দীপ্তির পা মচকে যাবার জন্ত। মা-গঙ্গার কৃপায় কলকাতায় গিয়ে তার পা সেরে যাবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল কুম্ভমেলা থেকে চলে যেতে হচ্ছে বলে। অথচ কি আশ্চর্য, সকাল থেকে কেবলই ভাবছিলাম—কখন বাস আসবে ?

এই হয়, থাকতে চাই না অথচ চলে যেতেও মন চায় না। না পারলাম পুরোপুরি সংসারী হতে, না পারলাম সাধু হতে। ঘরে মন টেকে না, অথচ পথেও বাসা বাঁধতে পারি না। ঘর আর বাইরের টানা-পোড়েনের মাঝে দুলছি অবিরত। জানি না কবে এই দোলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবো ?

এখন অবশ্য ঘরের চেয়ে বাইরের আকর্ষণই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। গত তিনদিন ধরে যে মেলার মাঝে মিশে গিয়েছিলাম, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সমাগত। অমৃত লাভ করেছি কিনা জানি না। তবে অমৃতময় কুম্ভমেলা ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে।

বাস-এ উঠি। সেই একই বাস। সেদিন এই বাস নিয়ে কত অভিযোগ উঠেছিল, আজ কিন্তু কেউ কিছু বলছেন না। মনে হচ্ছে বিদায় ব্যথায় সবারই মন ভারী হয়ে আছে।

বাস গর্জে উঠল। সেদিন কলকাতায় এই গর্জনকে বড় মধুর মনে হয়েছিল। আর আজ ? আজ অতিশয় কর্কশ মনে হচ্ছে। সেদিনও সবাই এই গর্জন শুনে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন, আজও তাঁরা নীরব হয়েই আছেন। তবে সেদিন ছিল আগমনী সুর আর আজ বিদায়ের বেণু।

অস্বস্তিকর নীরবতাকে সঙ্গী করে বাস এগিয়ে চলেছে। কৃষ্ণনগরের জনাকীর্ণ পথ পেরিয়ে আমরা ধীরে ধীরে পথ চলেছি। বিশ্বের বৃহত্তম ও সর্বকালের মহত্তম মহামেলার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি কিন্তু আমরা শব্দহীন।

শেষ পর্যন্ত দাদু শেষরক্ষা করলেন। সবাইকে সচকিত করে তিনি চিৎকার করে উঠলেন—গঙ্গা যমুনা মাঈকি !

—জয় !

—ত্রিবেণীতীর্থ কী…জয়।

—কুম্ভমেলা কী…জয়।

আমরা সাড়া দিই। তবে এই জয়ধ্বনিতে নেই কোনো আনন্দের উচ্ছ্বাস। আমরা যেন কোনো অপ্রিয় কর্তব্য সম্পাদন করছি, নিয়মরক্ষা করছি।

সঙ্গম মার্গ ও কালী সড়কের সঙ্গমে আসা গেল। সামনে বাঁধ দেখা যাচ্ছে। ওখানেই মূল-মেলা শেষ।

সহসা পুলিশের বাঁশি বেজে ওঠে। পায়লট গাড়ি থামায়। বংশীধারী কাছে আসে। ইসারা করে বলে—বাঁদিকে বাস ঘোরাও। ত্রিবেণী রোড দিয়ে বাঁধে উঠবে।

ভালই হলো। কুম্ভনগরে কয়েক মিনিট বেশি থাকা যাবে। আরও কিছুক্ষণ কুম্ভমেলা দেখতে পাবো।

মেলার রূপ কিন্তু প্রায় অপরিবর্তিত। পথের ভিড় গতকালের চেয়ে অনেক কম সন্দেহ নেই এবং যাবার ভিড় আসার ভিড়ের চেয়ে বেশি। তাহলেও মানুষ আসছে। আজও অগণিত মানুষ আসছে।

কেন আসছে? মোক্ষলাভ করতে? কিন্তু মোক্ষলাভ কি এতই সহজ? না, পূর্ণকুম্ভ জ্ঞানময় পরমব্রহ্মের প্রতীক। এই জ্ঞানই ত্রিভুবনের অমৃত। আমরা সেই শাশ্বত জ্ঞানলাভ করে ফিরে চলেছি। এই জ্ঞান আমাদের অহং বোধকে হনন করবে, আমরা মানুষ এবং মানুষের ভগবানকে সমান ভালবাসতে পারব। কুম্ভমেলা আমাদের অন্তরে ভালোবাসার অমৃত সিঞ্চন করল। আমি যে অমৃত-লাভ করলাম, ওরা সেই অমৃতলাভ করতে আসছে।

ত্রিবেণী রোড ও সঙ্গম মার্গের সঙ্গমে এলাম। বাস ডাইনে মোড় ফিরল। এখন আমরা ত্রিবেণী রোড ধরে বাঁধের দিকে এগিয়ে চলেছি।

একে চড়াই পথ, তার ওপরে মানুষের ভিড়। বাস ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। আজ ত্রিবেণী রোড, শুধু ফিরে যাবার পথ। সবাই বাঁধের দিকে চলেছেন।

সেদিনও তাঁরা এই ভাবে এগিয়ে চলেছিলেন—চুয়ান্ন সালের সেই অভিশপ্ত দিনটিতে। এই ত্রিবেণী রোড ধরেই সেদিন তাঁরা সাধু-দর্শনের জন্য, তাঁদের পদধূলি নেবার জন্য, বাঁধের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পারেন নি, তাঁরা বাঁধে উঠতে পারেন নি। এমনকি তাঁদের অনেকেই ঘরে ফিরে যেতে পারেন নি। এই পথের বুকে মোক্ষলাভ করেছেন। তাঁরা চিরকালের মতো রয়ে গিয়েছেন এই মানুষের মহামেলায়, এই ত্রিবেণীতীর্থের ধূলিকণায়।

বাস বাঁধে ওপরে উঠে আসে। সহসা শঙ্করী বলে, "ম্যানেজারবাবু, দু'মিনিটের জন্য বাস থামাতে বলুন না! শেষবারের মতো কুম্ভমেলাকে একটু

ভাল করে দেখে নিই। আর হয়তো কোনোদিন দেখা হবে না এ জীবনে!"

ম্যানেজার তার অনুরোধ উপেক্ষা করে না। বাস থামে বাঁধের ওপরে। আমরা দেখি, চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি···। ভাবি সেদিনের কথা। সেদিন রাতে আমি এই বাঁধের ওপর থেকে কুম্ভমেলার পূর্ণরূপ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মেলাকে মনে হয়েছিল—আলোর স্বর্গ।

আর আজ? আজ বিদায় বেলায় এই দিনের আলোয় মেলাকে আমার মনে হচ্ছে—মানুষের মর্ত্য। শুধুই মানুষ, আমার সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে, যেদিকে তাকাচ্ছি, কেবল মানুষ দেখতে পাচ্ছি—মর্ত্যের মানুষ। মানুষ ছাড়া আর সবকিছু যেন আমার দু'চোখের সামনে থেকে মুছে গিয়েছে।

কুম্ভমেলা মানুষের মেলা। যে মানুষ বিশ্বসংসারের সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাস্ত করে সর্বদা সামনে এগিয়ে চলেছে, কুম্ভমেলা শুধু সেই অমৃতময় মানুষের মহামেলা।

বাস আবার চলতে শুরু করেছে, আমবা বাঁধ থেকে নেমে যাচ্ছি প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে। আস্তে আস্তে সঙ্গম চোখের আড়ালে চলে গেল।

আর কিছুক্ষণ। তারপরে এমনি করে কুম্ভমেলাও অদৃশ্য হয়ে যাবে আমার চোখের সামনে। ঐ তো দূরে কুম্ভদ্বার দেখা যাচ্ছে। সেদিন ঐ দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে সর্বকালের বৃহত্তম মহামেলায় আমার প্রথম উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলাম। আর আজ ওখানে পৌঁছে কুম্ভমেলার কাছ থেকে বিদায় নেবার ব্যথা অনুভব করব।

সেই সঙ্গে কোটি কোটি ভক্তের পদরেণুরঞ্জিত প্রয়াগতীর্থের ধূলি মাথায় ঠেকিয়ে বলব—ধন্য আমি, ধন্য আমার জীবন। কুম্ভমেলায় এসে আমি ভালোবাসার অমৃত পান করেছি। মানুষের জয়গান গেয়ে আমি বিদায় নিলাম মহামানবের মিলনমেলা থেকে। আমার কুম্ভস্নান সার্থক হলো। হে মানুষের মুক্তিতীর্থ, তোমাকে প্রণাম!

—·—*—·—

# বিশেষ বিষয়সূচি

## সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

### যাঁদের বই কিংবা লেখা থেকে সাহায্য নিয়েছি :—

Dilip Kr. Roy & Indira Debi—Kumbh

Modern Review—Prayag

K. C. Sinha—A Brief History of Allahabad and its antiquities

A. A. E. I.—Motoring Guide of India

Darsh Lok Prakashan—Prayag Darshan

Swami Trilochananda—Prayag

—Gazetter of India, Uttar Pradesh, Allahabad—1968

E. I. R.—কুম্ভমেলা, হরিদ্বার

নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ

অনাথনাথ বসু—মীরাবাঈ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ—পুণ্যতীর্থ ভারত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্—ভারতকোষ

সমরেশ বসু—অমৃত কুম্ভের সন্ধানে

রাণী চন্দ—পূর্ণকুম্ভ